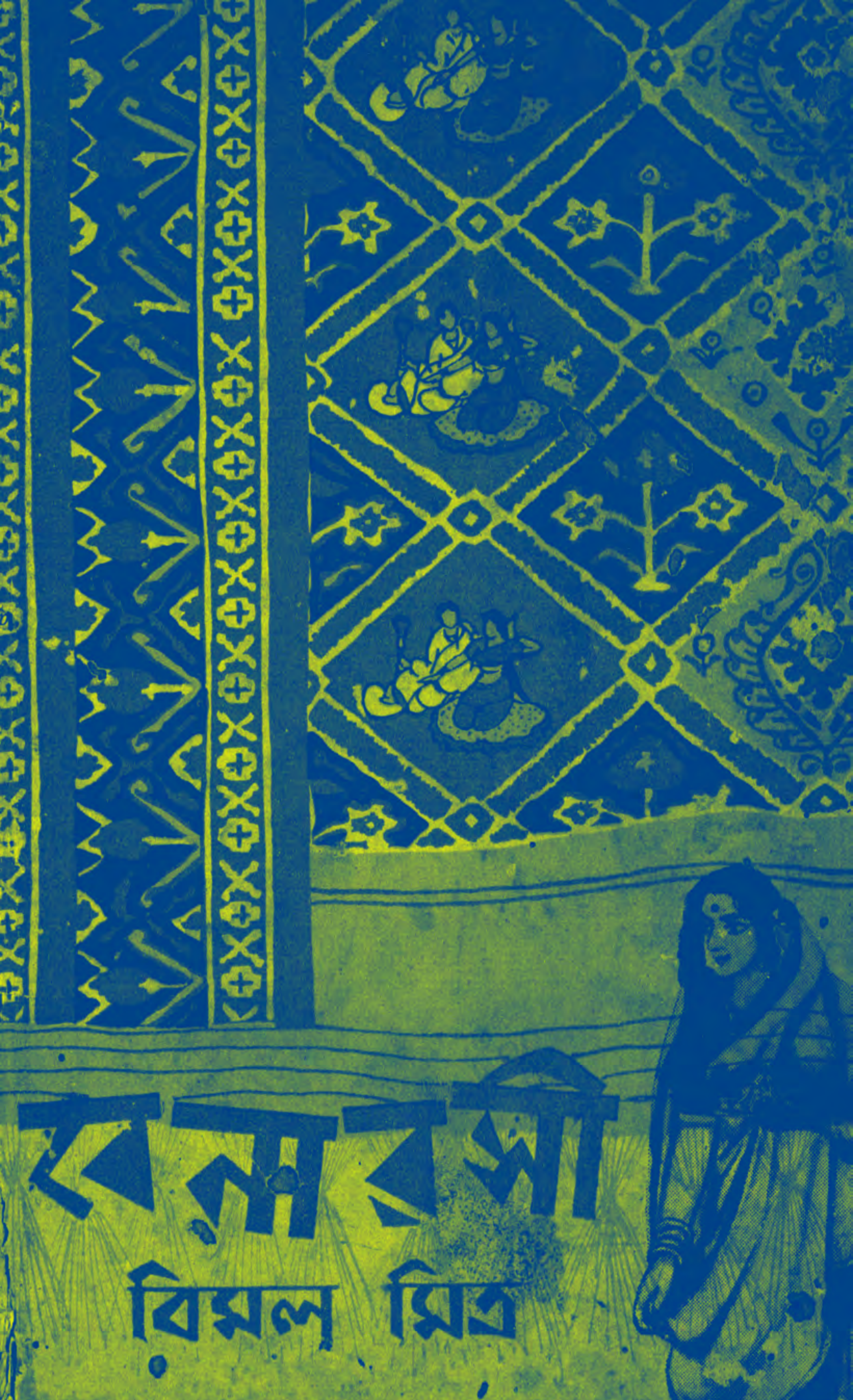
বেনারসী
বিমল মিত্র

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যোগ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাণ্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

বেনারসী

বিমল মিত্র

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত

মুদ্রণ—রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের ঃ

কড়ি দিয়ে কিনলাম
একক দশক শতক
নিবেদন ইতি
সাহেব বিবি গোলাম
সখী সমাচার
তিন ছয় নয়
কলকাতা থেকে বলছি
রং বদলায়
শ্রেষ্ঠ গল্প
বেগম মেরী বিশ্বাস
চলো কলকাতা
হাতে রইল তিন
চার চোখের খেলা
এর নাম সংসার
স্ত্রী
ইয়ারলিং
দিনের পর দিন
রাণী সাহেবা
পুতুল দিদি
মৃত্যুহীন প্রাণ
কন্যাপক্ষ
টক ঝাল মিষ্টি
মিথুন লগ্ন
অন্তরূপ
সুয়োরাণী
কাহিনী সপ্তক
এক রাজার ছয় রাণী
রাজপুতানী
প্রভৃতি

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্য জানাচ্ছি যে সম্প্রতি পঞ্চাশ-ষাটটি উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নাম-যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অপরের প্রশংসাও যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, তেমনি অপরের নিন্দাও আমার প্রাপ্য নয়। আসলে ওই নামে কোন লেখক আছে কিনা তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। অথচ প্রায় প্রত্যহই আমাকে সেই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া, আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

সূচী

বেনারসী ১ ॥ নায়ক-নায়িকা ৪৬ ॥ আর এক রকম ১১৮ ॥

বেনারসী

বেনারসী

বিডন্ স্কোয়ারের পাশ দিয়ে আসছিলাম। স্কোয়ারের ভিতরে তখন যেন সভা-টভা কিছু একটা হচ্ছিল। বিকেল বেলা। ভিতরে অনেক মহিলাদের ভিড়। সবাই ঘোমটা দিয়ে বসেছে। কে একজন বুঝি তখন বক্তৃতা দিচ্ছে জোরে জোরে। পার্কের বাইরেও বেশ ভিড়। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে, তারা বক্তৃতা শুনুক, আর না-শুনুক, বেশ হাসাহাসি করছে মনে হল। পার্কের ভিতরে যত ভিড়, পার্কের বাইরেও তার চেয়ে কম ভিড় নয়। বেশ কিছু পরিমাণে লোক দল বেঁধে বেঁধে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে· সেই দিকে আর নিজেদের মধ্যে বেশ হাসাহাসি করছে।

একটু কৌতূহল হল।

পাশে একলা একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ কাদের মীটিং মশাই ?

ছোকরা হেসে ফেললে। তবু তাৎপর্য বুঝলাম না।

বললাম মেয়েদের কিসের মীটিং ? এরা কারা ?

ছোকরা হেসে ফেললে। তারপর আমার আপাদ-মস্তক চেয়ে দেখে কী ভাবলে কে জানে। বললে, সতী-লক্ষ্মীদের মশাই—

বুঝতে পারলাম না ঠিক।

জিজ্ঞেস করলাম, সতী-লক্ষ্মীদের ?

—হ্যাঁ মশাই, সতী-লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী সব রামবাগানের সতী-লক্ষ্মীদের—

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না সেখানে। হন্ হন্ করে চলেই যাচ্ছিলাম। খানিকদূর গেছি। তখনও বিডন্-স্কোয়ারের রেলিংটা পার হই নি। ভিতরেও তখন বক্তৃতা হচ্ছে পুরো দমে। মাইক্রোফোন লাগিয়ে যেমন পুরো দস্তুর সভা হয় তেমনি হচ্ছে। কানে আসছে কিছু কিছু কথা।

হঠাৎ দেখলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। দাঁড়িয়েছেন ছাতির উপর ভর দিয়ে।

যেতে যেতে তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই কেমন থমকে দাঁড়ালাম। যেন চেনা-চেনা মনে হল।

মুখুজ্জে মশাই না ?

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনও ভদ্রলোকের খেয়াল নেই। মুখে দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে বেশ। অনেক দিন কামান নি। সেইরকম কোট। হাতে ছাতি।

বললাম, মুখুজ্জে মশাই না ?

মুখুজ্জে মশাই প্রথমটা যেন আমায় চিনতে পারলেন না ঠিক। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর যেন আমাকে দেখে চমকে উঠলেন।

আবার বললাম, মুখুজ্জে মশাই না ?

মুখুজ্জে মশাই হ্যাঁ না বলে চলে যাচ্ছিলেন। যেন পালিয়েই যাচ্ছিলেন। আমি কোটের হাতাটা ধরে ফেললাম।

মুখুজ্জে মশাই যেন তবু চিনতে পারলেন না আমাকে।

বললেন, আপনি কে ? আমি ঠিক · ··

বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি ডাক্তারবাবুর ভাই।

—কোন্ ডাক্তারবাবু ? আমি তো ডাক্তারবাবুকে······

আম্‌তা আম্‌তা করতে করতে মুখুজ্জে মশাই আমার হাত ছাড়িয়ে হয়ত সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম পথ আটকে। মুখুজ্জে মশাই তখন উল্টোদিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

বললাম, এত বছর পরে দেখা, আপনাকে কিন্তু আমি ঠিক চিনতে পেরেছি—

—কিন্তু আমি তো চিনতে পারছি না ভাই !

বললাম, কিন্তু আপনাকে আমি আজ আর ছাড়ছি না—। জেনকিন্‌স্ সাহেব তারপরে আপনাকে অনেক খুঁজলে, প্রেমলানী সাহেব আপনার জন্যে বিলাসপুরে লোক পাঠালে. কাট্‌নি-ট্রেনের ভেণ্ডারদের বলে দেওয়া হল। আপনার ঘরের দরজায় তালাচাবি বন্ধ করে দিয়েছিলেন আপনি—সব জিনিসপত্র জেনকিন্‌স্ সাহেব লিস্ট করে রেলের স্টোর্সে রেখে দিলে—

মুখুজ্জে মশাই আমার দিকে চেয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছু যেন মুখ দিয়ে বেরল না তাঁর।

বললাম, বেনারসীকে চেনেন আপনি ?

মুখুজ্জে মশাইয়ের মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেই মুখুজ্জে মশাই,

আমার সঙ্গে দেখা হলেই পকেট থেকে পান বার করতেন। বলতেন, পান খাবে নাকি ভায়া ?

পান খাওয়াটা একটা নেশা ছিল মুখুজ্জে মশাইয়ের। শুধু মুখুজ্জে মশাই নয়, মুখুজ্জেগিন্নীরও। মস্ত বড় একটা পান সাজবার ডাবর ছিল। তার মধ্যে ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ানো থাকত পানগুলো। আর একটা পানের মশলা রাখবার জায়গা। প্রায় ত্রিশটি বাটি একসঙ্গে আঁটা। কোনোটাতে লবঙ্গ, কোনোটাতে এলাচ, কোনোটাতে সুপুরি, এইরকম। মুখুজ্জেগিন্নীর মুখে সব সময় পান থাকত। সব সময় পানটা মুখের মধ্যে ফুলে থাকত। কাজ করতে করতেও পান, ঘুমোতে ঘুমোতেও পান চাই তাঁর। মুখুজ্জে মশাই রবিবার ছুটি হলেই কাট্নি চলে যেতেন। যার যা জিনিস দরকার মুখুজ্জে মশাইকে বললেই এনে দিতেন।

যাবার আগে মুখুজ্জে মশাই আসতেন আমাদের বাড়িতে।

বলতেন, ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারবাবু—

আমি বাইরে আসতেই মুখুজ্জে মশাই বলতেন, তোমাদের কী আনতে হবে বল ভায়া, আমি কাট্নি যাচ্ছি—গুড় আনতে হবে কিনা জিজ্ঞেস কর তো ? শুনলাম কাট্নিতে খেজুরের গুড় উঠেছে—

আর শুধু কি গুড় ? কারোর গুঁড়, কারোর শাড়ি, কারোর পটল, কারোর গম ভাঙাতে হবে। অনেক রকম কাজ কাট্নিতে। অনুপপুরে বলতে গেলে কিছুই পাওয়া যেত না। হপ্তায় একদিন হাট হত অনুপপুরে। স্টেশনের পিছন দিকে বস্তির ধারে ফাঁকা মাঠটাতে বাজার বসত। সেদিন অফিস ছুটি। সারা অনুপপুরের কলোনীটা সেদিন চুপচাপ। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেবের কারখানা বন্ধ। সাত দিনের মত আলু, পেঁয়াজ, শাক-সব্জি সেই হাট থেকে কিনে রাখতে হবে। বিলাসপুর থেকে সোজা একজোড়া রেল-লাইন চলে গেছে কাট্নির দিকে। জব্বলপুর যেতে চাও কি বোম্বাই যেতে চাও তো ওই কাট্নিতে গিয়ে ট্রেন বদলাতে হবে। আর ওই বিলাসপুর আর কাট্নির মধ্যখানে অনুপপুর। চারিদিকে ধূ ধূ করছে ব্ল্যাক কটন সয়েল। কালো রঙ, গ্রীষ্মকালে ফুটিফাটা থাকে। তারপর জুন মাসের মাঝামাঝি যখন প্রথম মনসুন শুরু হবে, বৃষ্টির জল পড়তে না পড়তে সেই ফাঁক থেকে সব সাপ বেরিয়ে আসবে। ক্রেট সাপ। কালো কালো সরু লম্বা চেহারার সাপগুলো। তখন সব সাপগুলো ঘরের মধ্যে এসে ঢুকবে। উঠোনে বারান্দায় রান্নাঘরে, বিছানার মধ্যে পর্যন্ত এসে ঢুকবে। অফিস থেকে কার্বলিক এসিড্ দিয়ে যায়

বাড়িতে বাড়িতে। বাড়ির চারিদিকে কার্বলিক এসিড ছড়িয়ে দিয়ে যায় অফিসের মেথররা। তবু সাপ আসে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, বেনারসীকে চেনেন না আপনি?

সে কী কাণ্ড! সি-পির গরম তখন, দুপুরবেলা লু ছোটে। রাত্রে ঘুম হয় না কারও। ইলেকট্রিক আলো নেই, ইলেকট্রিক পাখা নেই। সব খড়ের চালের ঘর নদীর ধার ঘেঁষে। শোন নদী দেখতে চওড়া এক ফুটের মতন। জল আছে কি না আছে। কনট্রাক্টার হুকুম সিং-এর লোক এপার থেকে ওপারে যায় হাঁটুর কাপড় তুলে। পাথুরে মাটি। নদীর তলাতেও পাথর। এলোমেলো এবড়ো-খেবড়ো জায়গা। সেই নিয়েই অনুপপুরের কলোনী। কিছু বাঙালী, কিছু হিন্দুস্থানী। সবাই কনস্ট্রাকশানের চাকরিতে এসে জুটেছে অনুপপুরে। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু জমি, তার উপর সব কয়েকটা সিমেন্টের দেওয়াল, পাকা উঠোন আর খড়ের চালের বাড়ি। আবার মাঝখানে কিছু কিছু খাদ। খাদের ভিতর জঙ্গল। সেখানে সাপখোপ বিছে। আবার তারপরই উঁচু জমি। জমির উপর কয়েকটা বাড়ি। যখন লু ছোটে দুপুরবেলা তখন কেউ বাড়ির বাইরে বেরতে পারে না। হু হু করে হাওয়া বয় পশ্চিম থেকে। চালের খড়গুড়ো উড়ে উড়ে উঠে পড়ে। রাস্তার উপর কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো থাকে, সে গুঁড়োগুলো উড়ে উড়ে ঘরের বন্ধ জানলা দরজায় এসে লাগে। উঠোন ঘর দোর বিছানা বালিশ সব ধুলোয় ধুলো। প্রেমলানী সাহেবের কারখানায় যারা কাজ করে তারা নাকে কাপড় বেঁধে রাখে। ফারনেস্ জ্বলে হু হু করে। কাঠ চেরাই হয় ইলেকট্রিক করাতে। লোহা গরম করে পেটাই হয়। সেই শব্দ সমস্ত কলোনীর লোকের কানে তালা লাগিয়ে দেয়।

সকাল আটটায় জেনকিন্‌স্ সাহেবের অফিস খোলে।

তখন বাবুরা ওই কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জেনকিন্‌স্ সাহেবের অফিসে গিয়ে ঢোকে। বারোটার সময় খেতে আসে সবাই। তারপর আবার দেড়টার সময় অফিস। খড়ের চালের ভিতর জেনকিন্‌স্ সাহেব ঘেরা-ঘরের মধ্যে কাজ করে। আর চারপাশের মস্ত ঘরটায় বাবুরা বসে। মুখুজ্জে মশাই লম্বা টেবিলের উপর কাগজ পেতে স্কেল পেন্সিল নিয়ে ড্রাফট্‌সম্যানের কাজ করেন—আর মাঝে মাঝে পকেট থেকে ডিবে বার করে পান খান।

কাজ করতে করতে নটু ঘোষ বলে, ও মুখুজ্জে মশাই, পান কই?

মুখুজ্জে মশাই বলেন, পকেট থেকে তুলে নিন দাদা, হাত জোড়া—

—মুখুজ্জেগিন্নীর হাতে মধু আছে দাদা, এমন পান—বলে নটু ঘোষ দুটো পান তুলে নিয়ে আবার ডিবেটা পকেটে পুরে দেয়।

খেতে বসে প্রেমলানী সাহেব বউকে জিজ্ঞেস করেন, এ বাঙালী ভাজি কে দিলে—

প্রেমলানী সাহেবের বউ বলে, ওই মুখার্জিবাবুর বহু—

আলু আসুক, পেঁয়াজ আসুক, কপি কড়াইশুঁটি, যা-ই আসুক কাটনি থেকে, মুখুজ্জেগিন্নী নানারকম তরকারি রান্না করে আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সামান্য নিরিমিষ তরকারি তাই-ই এমন চমৎকার রাঁধে, সবাই বাহবা দেয়। এমন রান্না কেউ কোনও বাড়ির বউ রাঁধতে পারে না। ছেলেপুলে হয় নি। বাঁজা মেয়েমানুষ। ওই স্বামীটি আর নিজে।

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, সারাদিন কি করি দিদি, কাজ তো আর নেই, তাই বসে বসে রাঁধি—

গিন্নীরা বলত, তোমার রান্না খেয়ে তো কর্তাদের জিভ বদলে গেছে ভাই। মুস্কিল হয়েছে, আর বাড়ির রান্না পছন্দ হয় না—

মুখুজ্জেগিন্নী হাসত। বলত, তা কর্তা বদলাবার উপায় তো আর নেই দিদি, থাকলে না-হয় চেষ্টা করে দেখতাম—

অম্বিকা মজুমদার অনুপপুরের স্টেশন মাস্টার। নিজে কলোনীর লোক না হলেও কলোনীর লোকের সঙ্গে খুব ভাব। হাসপাতালের লাগোয়া খেলার মাঠে টেনিস খেলতে আসেন। ডাক্তারবাবু, প্রেমলানী সাহেব, নটু ঘোষ, হুকুম সিং সবাই খেলে। কলোনীর তাসের আড্ডায় রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলে সেই এক মাইল রাস্তা হেঁটে আবার স্টেশনের কোয়ার্টারে ফিরে যান। তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে সকলের নিমন্ত্রণ হল। কাটনি থেকে ফুলকপি আর কড়াই-শুঁটি এনে দিয়েছিলেন মুখুজ্জে মশাই। বলতে গেলে বাজারটা তিনিই করে দিয়েছিলেন। অন্তত তিনশো টাকার বাজার দুশো টাকার মধ্যে করে দিয়েছিলেন। জেনকিন্‌স সাহেবও এসেছিলেন খেতে। চপ্‌, কাটলেট, পাঁটার মাংসের কালিয়া। তারপর দই রসগোল্লা—

জেনকিন্‌স্ সাহেব কাটলেট খেয়ে বললেন, বাঃ, ভেরি গুড কাটলেট, আট-বছর এরকম খাই নি, কে রেঁধেছে?

মজুমদারবাবু বললেন, মিসেস মুখার্জি।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, মিসেস মুখার্জি কে?

—আমাদের ড্রাফট্‌সম্যান মিস্টার মুখার্জির ওয়াইফ—

সাহেব বললেন, আই সী, মাই কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ টু হার—

মজুমদারবাবু ভিতরে গিয়ে বললেন। মুখুজ্জেগিন্নী সোজা বাইরে চলে এল। একেবারে সাহেবের সামনে এসে নমস্কার করলে। কোনও আড়ষ্টতা নেই। বেশ স্বচ্ছন্দ ভাব। একটা শান্তিপুরে ডুরে-শাড়ি দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে ঢেকে নিয়েছে। মুখে একটু সলাজ হাসি। কপালের সামনে একটা গোল টিপ্।

সাহেব হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন, আপ্ কী কাটলেট বহুত্ আচ্ছা হুয়া—

বলেই সাহেব হেসে ফেললেন। সবাই-ই হাসল। সাহেবের হিন্দী বলা কেউ শোনে নি।

মুখুজ্জেগিন্নী খাওয়ার পর একটা পান এনে দিলে।

বললে, এটা খান সাহেব, এটাও আমাদের হাতের তৈরি।

নটু ঘোষের স্ত্রী বললে, তোমার সাহস বলিহারি ভাই, ওই লাল-মুখো সাহেবের সামনে গেলে কী করে? আমাদের তো ভয় করে দেখলেই!

তারপর বাবুরা খেতে বসল। প্রেমলানী সাহেব মুখে দিয়েই বাহবা বাহবা করে উঠলেন। বললেন, মিসেস মুখার্জি খুব ভালো কুক আছেন—

নটু ঘোষকেও বলতে হল—না মুখুজ্জে মশাই, মুখুজ্জেগিন্নীর বাহাদুরি আছে—

মজুমদারবাবু বললেন, আমি তো চপ্ কাটলেট করতেই চাই নি প্রথমে, ও-সব আমাদের বাড়ির কেই বা করতে জানে, আর সে-সব করিগরই বা এখানে কোথায়—তা মুখুজ্জেগিন্নী নিজে থেকেই বললেন, উনি মাংস এনে দেবেন'খন, আমি চপ কাটলেট করে দেব—

বহুদিন বন-জঙ্গলের মধ্যে বাস করে করে শহরের কথা সবাই-ই ভুলে গেছে। জেনকিন্‌স্ সাহেব খাস বিলেত থেকে এই ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি নিয়ে এখানে এই বন-জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছে। রেফ্রিজারেটর, বরফ, ফ্যান্, লাইট, টেলিফোন, রেডিয়োর দেশ থেকে একেবারে সি-পির জঙ্গলে। না পাওয়া যায় মাটন্, না পাওয়া যায় আইসক্রীম। সন্ধ্যা হতে-না-হতে ভন্ ভন্ করে মশা। তারপর সাপ, কেঁচো, মাকড়সা, কেন্নো, পিঁপড়ে, উইপোকা, সবই আছে। সাহেব গরমের চোটে গায়ের জামা খুলে ফেলে এক-এক সময়ে। হাত দিয়ে চুলকোয় খ্যাশ্ খ্যাশ্ করে। রদ্দুরে মাথার টাক জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

প্রেমলানী সাহেবও শহরের লোক। সিন্ধের হায়দ্রাবাদে বাড়ি। করাচীতে কোন্ চাকরি করত একটা। সে অফিস বুঝি উঠে যায় হঠাৎ। তারপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এইখানে চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন।

নটু ঘোষ বাঙলা দেশে চাকরি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই চাকরি পান না। অনেকদিন বাড়ির অন্ন ধ্বংস করতে হয়েছিল বসে বসে। শেষে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই চাকরির জন্যে দরখাস্ত করে চাকরিটা পান।

এমনি সকলেই।

সাধ করে কেউ এখানে আসে নি। স্টোর্সের বড়বাবু কলকাতায় পঞ্চান্ন বছর চাকরি করে রিটায়ার করেছিলেন। বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে শেষ-জীবনটা কাটাতে পারতেন। সাত্ত্বিক মানুষ। স্বপাক আহার করেন। কারও হাতের ছোঁয়া খান না। বিয়ে-থা করেন নি। বেশ ছিলেন। সুদের সামান্য টাকা দিয়ে নিজের জীবনটা চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙ্কটা ফেল মারল।

বলেন, আমি জীবনে কাউকে ঠকাই নি নটুবাবু—সেই আমিই শেষকালে কিনা ঠকলুম—

নটু ঘোষ বললেন, ভগবানের মার আইনের বার—কথাতেই আছে যে ভূধরবাবু!

ভূধরবাবু পান খান না, নস্যি নেন না। সিনেমা দেখার বাতিক নেই। বিয়ে করেন নি সুতরাং সে বালাইও নেই। শুধু ধর্ম-কর্ম করার একটু অসুবিধে হয়।

বলেন, কী দেশে যে এলুম, না আছে একটা ঠাকুর দেবতা না আছে একটা মন্দির—

বরাবর তাঁর গঙ্গাস্নান করা অভ্যাস। বাড়ির কাছে গঙ্গা ছিল। সেখানে ঘাটে বসে আহ্নিক করতেন। নিজের কোষাকুষি আসন সব নিয়ে যেতেন। আর সমস্ত ঘাটটা ঝাঁটা দিয়ে ধুতেন নিজের হাতে। সাহেব কোম্পানির চাকরি। কাপড়ের নিচে সার্টটা ঢুকিয়ে দিয়ে উপরে কোট চড়াতেন। সাহেবদের মহলে সৎ বলে সুনাম ছিল।

ছোট অফিস। ভূধরবাবু ছিলেন সব। ভেবেছিলেন শেষ জীবনটা এক রকম কেটে যাবে তাঁর। তারপর হঠাৎ ব্যাঙ্কটি ফেল হয়ে গেল। ভেবেছিলেন টাকাগুলো কোনও আশ্রমে দিয়ে শেষ জীবনটা ধর্মে-কর্মে কাটাবেন। ধর্মই ছিল তার আসল নেশা।

বলতেন, চাকরি করি সাহেবের কাছে, তাই ওদের গুডমর্নিং বলতে হয়, কিন্তু ও-বেটারা কি মানুষ!

নটু ঘোষ বলতেন, তা মানুষ নয় তো কী! দেখছেন তো সাত সমুদ্র

তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে, আমাদের মাথার ওপর বসে রাজত্ব করছে কী করে শুনি ?

ভূধরবাবু বলতেন, ম্লেচ্ছ সব, জাত-ধর্ম যাদের নেই তারা আবার মানুষ ! আমি তো রোজ অফিস থেকে এসে চান করে ফেলতুম মশাই—

—বলেন কী ?

ভূধরবাবু বলতেন, এখনও চান করে ফেলি। এই যে অফিসে কাজ করছি, এখান থেকে গিয়েই এই জামা-কাপড় ছেড়ে গামছা পরব, পরে নিজের হাতে সব জলকাচা করে ফেলব—

অম্বিকাবাবুর বাড়িতে তাঁরও নিমন্ত্রণ ছিল।

ভূধরবাবু বললেন, আমাকে মাপ করবেন মশাই, আমি স্বপাক ছাড়া আহার করি না—

মজুমদারবাবু বললেন, আমার বাড়িতে রান্না-বান্না সবই মুখুজ্জেগিন্নী করবেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আমি অন্য কাউকে ছুঁতেই দেব না। পরিবেষণও করবেন তাঁরাই—

তবু ভূধরবাবু যান নি খেতে।

নটু ঘোষ বললেন, আপনি কাল গেলেন না, আঃ কী কাটলেটই করেছিলেন মুখুজ্জেগিন্নী কী বলব বড়বাবু, জেনকিন্‌স্ সাহেব খেয়ে একেবারে—

ভূধরবাবু বললেন, ও-সব তামসিক আহার, ওতে কেবল মনের জড়তা বাড়ে বই তো নয় !

নটু ঘোষ বললেন, জড়তা বাড়ুক আর যা-ই হোক মশাই, অনেকদিন পরে খেয়ে একটু বাঁচলুম, এমন কাটলেট কলকাতাতেও খাই নি—

সেই কবে ভূধরবাবু চাকরির একটা দরখাস্ত করেছিলেন। তখন ভাবেন নি যে এইরকম দেশ। এসে তাজ্জব হয়ে গেছেন। নদীতে যান বটে চান করতে, কিন্তু এতটুকু জল। তাতে না ভেজে কাপড়, না ভেজে মাথা। সেই এক-পা জলে দাঁড়িয়েই একটু নমঃ নমঃ করেই ইষ্টমন্ত্রটা জপ করে নেন। মন প্রসন্ন হয় না। অম্বুপপুরে কাটিয়ে দিলেন ক'টা বছর, তার মধ্যে একটা দিনও জপ আহ্নিক করে তৃপ্তি পান না। হাটবারে মুখুজ্জে মশাই এসে জিজ্ঞেস করেন—কিছু আনতে হবে বড়বাবু, কাটনি যাচ্ছি—

ভূধরবাবু বলেন, আলুটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, আনলে হত—

মুখুজ্জে মশাই বললেন, তা দিন না আমি তো যাচ্ছিই, একসঙ্গে এনে দেব—জেনকিন্‌স্ সাহেবের জন্যে মুরগীর ডিমও আনব দু-ডজন—

ভূধরবাবু আঁতকে উঠলেন।

—তবে থাক মুখুজ্জে মশাই, ওই মুরগীর ডিমের ছোঁয়া জিনিস আমার দরকার নেই—আমি না খেয়ে উপোস করব, মরব, তবু আপনার মত জাত দিতে পারব না। চাকরি করতে এসেছি বলে জাত খোয়াতে পারব না—

তা মুখুজ্জে মশাইয়ের তাতে বিশেষ রাগ-বিরাগ ছিল না। মুখুজ্জে মশাই হাসতেন। বাজারের থলিটা নিয়ে যেতেন প্রেমলানী সাহেবের বাড়ি।

—কিছু আনতে হবে নাকি সাহেব!

—তুমি যাচ্ছ মিস্টার মুখার্জি, আমার কিছু গম ভাঙিয়ে আনতে হবে, পারবে?

মুখুজ্জে মশাই বলতেন, পারব না কেন? আমি তো সকলের জিনিসই আনছি। জেনকিন্‌স্‌ সাহেব, এই ঘোষবাবু, সকলেই আনতে দিয়েছে—ডাক্তারবাবুর বিশ সের আলু আনব আর আপনার গমটা ভাঙিয়ে আনতে পারব না!

প্রথম-প্রথম অনুপপুরে কিছু ছিল না। ডাক্তারবাবুই ওখানকার প্রথম লোক। তখন এ-সব ঘর-বাড়ি কিছুই হয় নি। প্রথমে তাঁবুতে থাকতে হত। ইস্টিশানের ধারে ধারে তাঁবু সাজানো ছিল সার সার। তখন প্রেমলানী সাহেবও আসে নি, নটু ঘোষও না। দেড়শো কেরানীর কেউই আসে নি। অফিসের কেউই আসে নি এক ডাক্তারবাবু আর জেনকিন্‌স্‌ সাহেব ছাড়া। ওষুধ এল খড়গপুর থেকে দু বাক্স ভর্তি। সেই দু বাক্স ওষুধের উপর নির্ভর। অবশ্য হুকুম সিং আগেই এসেছে। নদীর ওপারে দোতলা বাড়িতে নিজের থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কাঠের দোতলা আর টিনের চাল। আর কুলী-মজুররা এসেছে। কুলী-মজুররা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করেছে। ঘর-বাড়ি করেছে। রাস্তা করেছে। হাসপাতাল করেছে। তারপর একে একে অফিস চালু হয়েছে। হুকুম সিং-এর তিনজন কুলীকে সাপে কামড়েছিল। ক্রেট সাপ।

হুকুম সিং বলত, কী জঙ্গল ছিল এখানে—বাঘ আসত রাত্তির বেলা—

হুকুম সিং বাঘও মেরেছিল দুটো। বাঘ নদীর বরাবর জল খেতে আসত রাত্তির বেলা। নিজের বাড়ির দোতলা থেকে রাইফেল দিয়ে দুটো বাঘ দুদিন মেরেছিল। তখন আমরা আসি নি। জেনকিন্‌স্‌ সাহেবও আসেন নি।

তা কনস্ট্রাকশনের চাকরিতে এ-সব ভয় করলে চলবে না।

নতুন লাইন পাতা হচ্ছে। অনুপপুর থেকে এক জোড়া রেল-লাইন সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। অনুপপুরের পর দুর্বাসীন। তারপর ইস্টিশানের

নাম হবে বিজুরি। তারপর মনেন্দ্রগড়। তারপর শেষ স্টেশনের নাম হবে চিরিমিরি। বড় বড় শাল গাছ। দু হাত বাড়িয়ে বেড় দিয়ে ধরা যায় না। শাল আর মহুয়া। গাছগুলো সব মাথা ছাড়িয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। ওপর দিকে চোখ তুললে আকাশই দেখা যায় না জায়গায় জায়গায়। কুলীরা কাজ শেষ করে রাত্রে ছাউনিতে এসে শোয়। মাঝরাত্রে বাঘ আর ভাল্লুক এসে ঘোরাঘুরি করে ছাউনির চারপাশে। থাবার দাগ দেখা যায় সকালবেলা।

বিজুরি থেকে 'তার' আসে 'ডাক' আসে। সেই 'ডাক' খোলে ডেস্‌প্যাচ্‌ বাবু।

ডেস্‌প্যাচ্‌ বাবু মধুসূদন হাজরা। 'ডাক' খুলেই বলে, ওহে, আজ তিনজনকেই বাঘে নিয়েছে, জানলে হে—

ভূধরবাবু বলেন, আমাদেরও কোন্‌দিন নেবে—

নটু ঘোষ বলেন, অনুপপুরে বাঘ আসতে পারবে না। এত বন্দুক, আলো —বাঘের বুঝি ভয় নেই ভেবেছেন ?

মুখুজ্জে মশাই কোনও কথাতেই কথা বলেন না। একমনে লম্বা উঁচু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সেট্‌স্কোয়ার আর স্কেল দিয়ে কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টেনে যান। আর মাঝে মাঝে পকেট থেকে ডিবে বার করে পান খান।

নটু ঘোষ বলেন, দাও হে মুখুজ্জে তোমার পান দাও একটা, হিসেবটা মিলতে চাইছে না মোটে—

মনে আছে মুখুজ্জে মশাইকে আমি প্রথমে দেখি নি। টেনিস খেলতে আসত যারা তাদেরই ভালো করে চিনতাম। স্টেসন মাস্টার অম্বিকাবাবু ধুতি পরে খেলতেন। হুকুম সিং চোস্ত পায়জামা পরত। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেব তো পাকা সাহেব। আর জেনকিন্‌স্‌ সাহেব পরত হাফ প্যাণ্ট। আর চিনতাম ওভারসিয়ার নগেন সরকারকে। নগেন সরকারের বিয়ে হয় নি। এদিকে ওভারশিয়ার মানুষ। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করত। সন্ধ্যাবেলা সেই বন-জঙ্গলের মধ্যে যখন সব চুপ-চাপ, যখন কারখানার করাত-চলার ঘড়-ঘড় শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে, হুকুম সিং-এর কুলীদের ডিনামাইট ফাটানোর শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে, তখন দূর থেকে ওভারসিয়ারের ঘর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসত।

বর্ষাকালের আকাশ তখন কালো মেঘে জমাট বেঁধে আছে। এক হাত দূরের লোককে দেখা যায় না, তখন নগেন সরকার গাইছে—

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—

নগেন সরকার বলিষ্ঠ লোক। হাতের পায়ের বুকের মাস্‌ল ছিল মজবুত। লোহাপিটনো শরীর। হাফ প্যাণ্ট পরে কারখানার কাজ দেখত। ভারি কড়া ওভারসিয়ার। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেবের খুব প্রিয় লোক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করাত।

নটু ঘোষ বলতেন, কাল অনেক রাত পর্যন্ত গান গাইছিলেন যে সরকার মশাই—

নগেন সরকার বলত, তা কী করব বলুন, আপনারা তো সবাই বউ নিয়ে বেশ লেপ চাপা দিয়ে ঘুমোবেন, আমি কী করি বলুন ?

—তা বিয়ে করতে বারণ করেছে কে আপনাকে ? বিয়ে করলেই হয় !

নগেন সরকার হাসত। বলত, আপনি একটা পাত্রী ঠিক করে দিন না, আমি বিয়ে করছি—

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, তা পাত্রী ঠিক করব একটা তোমার জন্যে ভাই ?

—করুন না, মুখুজ্জেগিন্নী, কিন্তু আপনার মত দেখতে হওয়া চাই—

মুখুজ্জেগিন্নী হাসত।

বলত, বল গে যাও তোমারি মুখুজ্জে মশাইকে, তাঁর তো মনই পাই না—

নগেন সরকার বলত, আপনাকে যার পছন্দ হয় না তার কপালে ধিক্ মুখুজ্জেগিন্নী !

—তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক ভাই।

মুখুজ্জেগিন্নী হেসে গড়িয়ে পড়ত। কাঁধের আঁচলটা ভালো করে সরিয়ে দিয়ে বলত, এখন তো বলছ খুব, শেষে মুখুজ্জে মশাইয়ের মত একঘেয়ে লেগে যাবে—দেখবে।

নগেন সরকার বলত, তা পরীক্ষা করেই দেখুন না মুখুজ্জেগিন্নী—

—আর হয় না ভাই। মুখুজ্জে মশাইয়ের কষ্ট হবে।

—ও, তাই বলুন, আপনিই ছাড়তে পারবেন না, তাই বলুন—

মুখুজ্জেগিন্নীও হাসত।

সামনে দাঁড়িয়ে নগেন সরকারও হাসত খুব হো হো করে।

মুখুজ্জে মশাইকে আমি প্রথম দেখি আমাদের বাড়িতেই। ছুটিতে দাদার কাছে গেছি। বেড়াতে।

বাইরে থেকে ডাক শুনতেই বেরিয়ে এলাম—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু—

দেখি হাতে অনেকগুলো থলি। টিনের খালি বাক্স। জুতো-পরা, মাথার চুলটায় টেড়ি কাটা। পান খাচ্ছেন মুখ ভর্তি করে।

আমাকে দেখেই কেমন থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন, কে তুমি ?

বললাম, আমি ডাক্তারবাবুর ভাই, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি—

—ও, তা বেশ বেশ! কী কর ? নাম কী ?

বললাম সব।

আবার বললেন, বেশ বেশ! জায়গাটা ভালো খুব, দেখবে খুব মোটা হয়ে যাবে দু দিনেই, আমি এই এমনি রোগা ছিলাম জান—

বলে হাতের ছাতাটা উঁচু করে দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়েই হেসে ফেললেন।

আমিও হাসলাম। বললাম, আপনি এখানে কাজ করেন বুঝি!

—হ্যাঁ, ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের চাকরি করি। দু'শ টাকায় আমার সব খরচা চলেও একশো স'য়াশো টাকা বেঁচে যায় ভায়া—

আমি কী বলব!

মুখুজ্জে মশাই বলতে লাগলেন, কিন্তু কলকাতাতে ? তিনশো টাকাতেও সংসার চালাতে নাকে দড়ি লাগাতে হত—কী বল, ঠিক বলি নি ?

তারপর মুখ নিচু করে বললেন, তা এখেনে খরচ তো কিছু নেই!

—কেন ? খরচ নেই কেন ?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, আরে খরচ করব কী করে ? পাওয়া যায় নাকি কিছু ? আর সংসারে তো দুটি প্রাণী আমরা, আমি আর গিন্নী—

তারপর বলতে লাগলেন—এই কাট্‌নিতে যাচ্ছি, একেবারে এক হপ্তার আলু বেগুন নিয়ে আসব, আর খরচ যা কিছু সব তো মাছে। ওই মাগুরমাছ কিনে জীইয়ে রেখে দিই—কত খাবে খাও না—

এমন সময় দাদা এল।

—এই যে ডাক্তারবাবু, আপনার কী আনতে হবে বলুন।

দাদা বললে, পাঁউরুটি আনতে পারবেন মুখুজ্জে মশাই ?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, আপনি হাসালেন, জেনকিন্‌স্‌ সাহেবের ডিম আনছি, প্রেমলানী সাহেবের গম ভাঙিয়ে আনছি বিশ সের, নটু ঘোষের গিন্নীর শাড়ি, মজুমদারবাবুর ছেলের জুতো—

দাদা হেসে ফেললে। বললে, আর বলতে হবে না মুখুজ্জে মশাই—

কাজটা মুখুজ্জে মশাই নিজেই একদিন যেচে নিয়েছিলেন। কোম্পানী থেকে রেলের পাশ দিত একটা বাজার করবার জন্যে। কিন্তু কে যায়? বিশ্বাসী লোক পাওয়া দুষ্কর। শেষে মুখুজ্জে মশাই নিজেই বললেন—আমি যেতে পারি, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে—

সেই থেকেই শুরু হয়েছিল।

মুখুজ্জেগিন্নীকে জিজ্ঞেস করলে বলত, আসলে তা নয়, উনি একটু ভালমন্দ খেতে ভালবাসেন—

বলতাম, আপনি যেমন রাঁধেন, ও-রকম রান্না পেলে সবাই-ই ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসবে—

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, রান্না করার মধ্যে আর কী বাহাদুরি আছে—

নটু ঘোষের বউ বলত, তোমার কাছে শুক্তুনি রান্না করতে শিখতে যাব ভাই একদিন—

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, ওমা, আপনাকে আমি 'আবার রান্না শেখাব কি দিদি?

—না ভাই, সেদিন তোমার রান্না খেয়ে ওঁর কী সুখ্যাতি—

—ওমা, কবে?

—ওই যে সেদিন তুমি শুক্তুনি করে পাঠিয়েছিলে না, সে খেয়ে উনি ভুলতে পারছেন না একেবারে, রোজ বলেন ওইরকম শুক্তুনি করতে।

মুখুজ্জেগিন্নীর সংসারের বিশেষ কাজ আর কী! মুখুজ্জে মশাই অফিস চলে গেলেই সব শেষ। তিনি খেতে আসেন দুপুরবেলা।

মুখুজ্জে মশাই খেতে খেতে বলেন, হ্যাঁ গো নটু ঘোষ বলছিল, তুমি নাকি তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছিলে ওদের বাড়িতে—

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, কিছু বলছিল বুঝি? সেদিন বেশি হয়েছিল তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—

মুখুজ্জে মশাই বললেন, সেইরকম মাংসের কাটলেট কর না গো একদিন, সবাই তোমার মাংসের কাটলেট খেয়ে সুখ্যাতি করছিল—

বাড়িগুলো সকলেরই ছোট। অন্তত একই মাপের। অনুপপুর থেকে ট্রেনগুলো যখন বিলাসপুরের দিকে যায়, ছোট ছোট চালাগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট বাড়ি বটে, কিন্তু বেশ সাজানো। হুকুম সিং কণ্ট্রাক্টার বেশ ফিতে মেপে সাইজ করে বাড়িগুলো তৈরি করে দিয়েছে। জল আনতে

হয় নদী থেকে ভারী করে। চার-ভারী জল চার পয়সা। প্রেমলানী সাহেবের বউ বাগান করেছিল বাড়ির সামনে। ফোরম্যান সাহেবের পয়সা বেশি। নানারকম গাছপালা করেছিল। বড় বড় গোলাপ ফুটিয়েছিল বাগানে। সেই ফুল মাঝে মাঝে জেনকিন্‌স্‌ সাহেবকে পাঠিয়ে দিত।

সাহেব সেই ফুল টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখত।

কিন্তু সেদিন লাল বড় বড় ফুল সাজানো দেখে সাহেব বললে, কোন্‌ দিয়া ?

এত বড় ফুল তো কোনদিন আসে নি। বড় বড় পাপড়ি। পাপড়িগুলো ফেটে ফেটে যেন ভেঙে পড়ছে।

—কোন্‌ দিয়া বয় ?

বয় বললে, হুজুর ড্রাফট্‌সম্যানবাবুকা আওরাৎ!

তা মুখুজ্জেগিন্নীর সাহসও কম নয়। জেনকিন্‌স্‌ সাহেব রোজ বিকেল-বেলা বেড়াতে বেরত। এক হাতে ছড়ি, আর এক হাতে চেনে বাঁধা কুকুর। কুকুরটা ভারি শয়তান।

মুখুজ্জেগিন্নী তখন ঘোষগিন্নীর সঙ্গে গল্প করে ফিরছিল। রাস্তার মাঝামাঝি আসতেই সামনে সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি। সাহেব চলেই যাচ্ছিল শিস্‌ দিতে দিতে—

মুখুজ্জেগিন্নী দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার সাহেব—

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে ?

মুখুজ্জেগিন্নী হাসতে লাগল। বললে, আমায় চিনতে পারছ না সাহেব, সেই কাটলেট খাইয়েছিলুম ?

সাহেব কাটলেটের কথায় চিনতে পারলে।

বললে, তুমিই ফুল দিয়েছিলে কাল ?

—হ্যাঁ সাহেব, কেমন ফুল বল ?

—ভেরি গুড্‌, ভেরি বিগ্‌ সাইজ, তোমার ফুল আমার খুব পছন্দ—

বলে যে-সাহেব কখনও হাসে না সেই সাহেবই খুব হাসতে লাগল। আরও কাছে সরে আসছিল বুঝি হ্যাণ্ড্‌ শেক করতে।

মুখুজ্জেগিন্নী দু পা সরে এল। হাসতে হাসতে বললে, আসি সাহেব, নমস্কার—

সাহেবও দু হাত উঁচু করে নমস্কার করলে।

সেদিন প্রেমলানী সাহেবের বউয়ের কাছে সেই গল্প করতে করতে মুখুজ্জে গিন্নী হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বললে, কী জ্বালা দিদি, সাহেব আবার হাত বাড়িয়ে দেয়—আমি আবার বাড়ি এসে কাপড় কেচে ফেলে তবে বাঁচি—

—কেন, কাপড় কাচলে কেন বহিন?

—কাচব না? ওদের কি জাত-জন্ম আছে? গরু খায়, শূয়োর খায় বেটারা।

সেদিন ভূধরবাবুও অবাক হয়ে গেলেন।

মুখুজ্জে মশাই এসে বললেন, সত্যনারায়ণের সিন্নী হবে, যাবেন কিন্তু বড়বাবু—

—সত্যনারায়ণের সিন্নী? বলেন কি? আপনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ, হয় তো প্রত্যেকবার, তা বলতে পারি নে সকলকে কিনা।

ভূধরবাবু আরও অবাক হয়ে গেলেন।

—প্রত্যেকবারই করেন? পুরুত পান কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, কাট্‌নি থেকে আনি।

—কাট্‌নি থেকে পুরুত আনেন?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, তা আনতে হয় বইকি! এখানে তো আর ও-সব পাওয়া যায় না।

ভূধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন. তা খরচ তো অনেক পড়ে আপনার? কত খরচ পড়ে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, পুরুতকে দক্ষিণে দিই সোয়া পাঁচ টাকা—

—সোয়া পাঁচ টাকা?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, সোয়া পাঁচ টাকা না দিলে আসবে কেন কাট্‌নি থেকে? এখানে এলে দুটো দিন তো নষ্ট? তারপর এখানে থাকা খাওয়া আছে, নৈবিদ্যি আছে—

কাট্‌নি থেকে পুরুত এনে সত্যনারায়ণের পুজো করা শুনে—ভূধরবাবু যে ভূধরবাবু—তিনিও অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, তা আপনার গিন্নীর তো খুব ধর্মকর্মে মন আছে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, বুঝতেই তো পারছেন, হিন্দু আমরা, ও-সব তো ছাড়তে পারি নে! আমার গিন্নী বলে—বিদেশে চাকরি করতে এসেছি বলে তো হিন্দুত্ব খোয়াই নি—

ভূধরবাবু বললেন, নিশ্চয়ই যাব মুখুজ্জে মশাই, এ-সব কাজে আমি আছি, আমিও তো তাই বলি। বিদেশে ম্লেচ্ছদের কাছে কাজ করতে এসেছি বলে কি একেবারে জাত দিয়ে দিয়েছি! বড় ভালো লাগল কথাগুলো। আজকালকার দিনে এমন মহিলাও যে আছেন এ-ও এক আশার কথা—

তা সিন্নীটাও খুব ভালো হয়েছিল খেতে।

আমি দেখেছি মুখুজ্জেগিন্নীর সিন্নী তৈরি।

সেদিন সকাল থেকে সারাদিনই মুখুজ্জেগিন্নীর উপোস। নদীতে ভোর বেলা চান করে এসেছে। তখন কোনও লোক ওঠে নি অন্তপপুরে। রাত তখন প্রায় চারটে।

নটু ঘোষের বউ শুনছিল। বললে, একলা তোমার অত রাত্তিরে ভয় করছিল না ভাই ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ঠাকুরের নামে গেছি আর এসেছি—ভয় করবে কেন ?

তারপর সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত সারাদিন উপোস করে পূজো করে প্রসাদ মুখে দিয়েছে।

নটু ঘোষ বললেন, তোমার গিন্নী তো খুব হে !

ভূধরবাবু বললেন, সব মেয়েরা যদি মুখুজ্জেগিন্নীর মত হত ভাবনা কিসের ভাই আমাদের দেশের—

ওভারসিয়ার নগেন সরকার ছিল। বললে, হারমোনিয়ামটা আনলে আমি একটা শ্যামাসঙ্গীত গাইতে পারতাম—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমার হারমোনিয়াম আছে ঠাকুরপো, দেব ?

—আপনার হারমোনিয়াম ? আপনিও বুঝি গান গাইতে পারেন মুখুজ্জেগিন্নী ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, একটু একটু পারি ঠাকুরপো, তা সে তোমাদের শোনাবার মত নয়—

নগেন সরকার চেপে ধরল।

বললে, তা হলে একটা গাইতে হবে মুখুজ্জেগিন্নী, সে বললে শুনছি না—

ভূধরবাবু কিছু বলছিলেন না। নটু ঘোষ বললেন, মুখুজ্জেগিন্নীর কি গান-টানও আসে নাকি ?

সবাই-ই অবাক হয়ে গেছে। এমন ধর্মশীলা মহিলা, এত ভক্তি, এমন চমৎকার রান্না করতে পারে, সে আবার গানও গাইতে পারে !

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তুমি আগে গাও একটা, শুনি ?

প্রেমলানী সাহেবের বউ, নটু ঘোষের স্ত্রী—তারাও অবাক হয়ে গেছে। বলে কী! গানও জানে নাকি! নটু ঘোষের স্ত্রী বললেন, তোমার ভাই অশেষ গুণ!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, না দিদি, তেমন গান জানি না, ওই শুনে শুনে যেটুকু শিখেছি তাই আর কী—

হারমোনিয়াম বার করে দিলে মুখুজ্জেগিন্নী। অনেক দিন ব্যবহার হয় নি। বাক্সের ওপর ধুলো জমে আছে।

ওভারসিয়ার নগেন সরকার বললে, বাঃ, এ যে ডবল-রীডের হারমোনিয়াম দেখছি, আবার স্কেল চেঞ্জিং—অনেক দাম এর!

নটু ঘোষের স্ত্রী বললেন, তোমার কর্তার বুঝি গানের শখ আছে ভাই ?

মুখুজ্জেগিন্নী হাসল।

বললে, না দিদি, ওঁর আবার গানের শখ! উনি কেবল খেতে জানেন আর বাজার করতে জানেন—

—তবে হারমোনিয়াম তুমি কিনেছিলে কেন ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে কি আজকে কিনেছি? সে কোন্ যুগে! বিয়ের আগে কিনেছিলাম, মা কিনে দিয়েছিল।

নগেন সরকার কী গাইলে কে জানে। কেউ বিশেষ শুনল না। নটু ঘোষ হাই তুলতে লাগলেন। প্রেমলানী সাহেব বাড়িতে ছেলেমেয়ে রেখে এসেছেন। তাঁরও যাবার তাড়া ছিল। ভূধরবাবুও যাই-যাই করছিলেন।

এক সময়ে নগেন সরকার থামাল।

তারপর হারমোনিয়ামটা মুখুজ্জেগিন্নীর দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, এবার আপনি গান মুখুজ্জেগিন্নী—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি কী গাইব, সংসারে ঢুকে ও-সব পাট তো চুকে গিয়েছে অনেক দিন, ভুলেও গেছি কথাগুলো—

বলে হারমোনিয়ামটা নিয়ে প্যাঁ-পোঁ করলে খানিকক্ষণ। পা দুটো একদিকে জড়ো করে বসে এক হাতে বেলো করতে করতে গান ধরল—

শ্যামা মা কি আমার কালো—

ভূধরবাবু খাড়া হয়ে বসলেন।

নটু ঘোষের এতক্ষণ ঘুম পাচ্ছিল। তিনিও সজাগ হয়ে উঠলেন।

প্রেমলানী সাহেব সমানেই ঝুঁকে পড়ে চোখ বুজে মাথা নিচু করে

রইলেন। চারদিকে সবাই নিস্তব্ধ। গানের সুরে ক্ষেন ভাবের জোয়ার লাগল সকলের মনে। আমি বসেছিলাম একেবারে মুখুজ্জেগিন্নীর সামনে। মুখুজ্জেগিন্নী ঠিক আমার মুখোমুখি বসে গাইছিল। মুখুজ্জেগিন্নীর কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। চুলগুলো এলো করে পিঠের উপর ছড়িয়ে দেওয়া। সারাদিন তার উপোস গেছে। উপোসের পর তার মুখে কেমন যেন একটা করুণ প্রসন্নতা জড়িয়ে ছিল। তসরের লালপাড় শাড়িটা সারা শরীরটায় জড়ানো, মাথায় একটু স্বল্প ঘোমটা। মুখুজ্জেগিন্নী গাইছিল—আর আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম।

সে যে কী গান!

ভূধরবাবু ভাবের ঝোঁকে গানের মধ্যেই যেন এক-একবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। প্রেমলানী সাহেব তখনও চোখ বুজে মাথা নিচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন। নটু ঘোষ ভেবে যেন কোনও কিছুর কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না। তিনি অবাক হয়ে শুধু চেয়ে ছিলেন মুখুজ্জেগিন্নীর মুখের দিকে হাঁ করে। প্রেমলানী সাবেবের বউ, নটু ঘোষের স্ত্রী—ছুজনেরই মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে। মনে আছে অনুপপুরের সেই কলোনীর চালা-ঘরের সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোনে আমরা সব কটি প্রাণী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্যে।

কখন যে গান থেমে গেছে বুঝতে পারে নি কেউ।

নটু ঘোষ বললেন, বাঃ চমৎকার—

প্রেমলানী সাহেব বলে উঠলেন, ওয়াণ্ডারফুল—মার্ভেলাস্—

নগেন সরকার বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, আপনি এমন ভালো গাইতে পারেন আর আমাদের কিনা এতদিন বঞ্চিত রেখেছিলেন—ঈস্—

ভূধরবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নি।

এবার যেন তাঁর ঘুম ভাঙল। বললেন, মা—মা—

তারপর বললেন, সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপা না থাকলে এমন কণ্ঠ কারও হয় না হে নগেন সরকার, ইনি সাক্ষাৎ মা আমাদের—

মুখুজ্জেগিন্নী লজ্জায় পড়ল।

বললে, কী যে বলেন আপনি বড়বাবু, ওসব বলে আমায় লজ্জা দেবেন না আপনি, মায়ের নাম করতে কি আর কণ্ঠ লাগে!

নটু ঘোষের বউ সামনে সরে এসে হাতটা জড়িয়ে ধরলেন মুখুজ্জেগিন্নীর।

বললেন, তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে ভাই—

মুখুজ্জেগিন্নী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে, ছি ছি, ও-কথা বললে আমার পাপ হয় দিদি—বলে নটু ঘোষের স্ত্রীর পায়ের ধুলো নিতে গেল।

ভূধরবাবুর বললেন, তোমার কুষ্টি আছে মুখুজ্জে মশাই ?

মুখুজ্জে মশাই এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিলেন। কোনও কথাতেই কান দিচ্ছিলেন না যেন।

বললেন, কুষ্টি তো আমার নেই বড়বাবু—

নটু ঘোষ লাফিয়ে উঠলেন।

বললেন, কেন কেন ? আপনি কুষ্টি দেখতে জানেন নাকি বড়বাবু ?

ভূধরবাবু বললেন, না, দেখতাম মুখুজ্জে মশাইয়ের জায়া-স্থানে কোন্ গ্রহ আছে, বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে না থাকলে কপালে এমন বউ পায় না কেউ—

সত্যিই মুখুজ্জে মশাইয়ের পত্নীভাগ্য ভালো। শুধু রাঁধতে পারে কিম্বা গান গাইতে পারে বলেই নয়, মুখুজ্জেগিন্নীর অনেক গুণ। গুণের যেন শেষ ছিল না মুখুজ্জেগিন্নীর। বাড়িতে গিয়ে দেখতাম মুখুজ্জে মশাই অফিস চলে যাবার পর মুখুজ্জেগিন্নী ঘর গুছচ্ছে। মুখুজ্জে মশাইয়ের জামা-কাপড় সব আলনায় সাজিয়ে রেখে ঘর-দোর ঝাঁট দিচ্ছে। অথচ সকালবেলাই ঝি এসে ঝাঁট দিয়ে গেছে।

বলতাম, এ কি মুখুজ্জেগিন্নী, নিজে ঝাঁটা দিচ্ছ যে ?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, ঝি-র যেমন কাজের ছিরি, নিজে ঝাঁট না দিলে কি চলে ? আমি নোংরা দেখতে পারি না মোটে—

অথচ নিজের বাড়ির কাজটুকু করলেই চলে না। খাওয়া-দাওয়ার পর যখন মুখুজ্জে মশাই অফিস চলে যেতেন, তখন এক ফাঁকে মুখুজ্জেগিন্নী বেরিয়ে পড়ত। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রদ্দুর। সেই রদ্দুরের মধ্যেই মুখুজ্জেগিন্নী মাথায় আঁচলটা আড়াল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে প্রেমলানী সাহেবের অন্দরমহলে গিয়ে ডাকত, কই গো, সাহেব-বউ কোথায় ?

প্রেমলানী সাহেবের বউ তখন হয়ত দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানার উপর ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। মোটা-সোটা মানুষ!

মুখুজ্জেগিন্নীর ডাকে উঠে পড়ে সাহেব-বউ।

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, এই একটু ঘুম ভাঙাতে এলুম সাহেব-বউয়ের—

—এস বহিন, এস এস।

মুখুজ্জেগিন্নী বলল, এই এত ঘুমোও বলেই এত মোটা হয়ে যাচ্ছ তুমি দিদি, আর দুদিন বাদে প্রেমলানী সাহেব তোমায় জড়িয়ে ধরতে পারবে না।

সাহেব-বউ হাসতে লাগলেন। মুখুজ্জেগিন্নীও হাসতে লাগল খিল্‌খিল্ করে।

সাহেব-বউ বললেন, আর প্রেমলানী সাহেব এখন তো বুড়ো হয়ে গেছে বহিন।

মুখুজ্জেগিন্নী বলল, ওই বুড়ো বয়সেই তো রস বেশি সাহেব-বউ, এই বয়সেই তো দুধটি মরে ক্ষীরটি হয়। পিরীত জমে ভালো—

সাহেব-বউ বুঝতে পারে না। বাংলাই অতি কষ্টে বলে।

বললে, পিরীত কী ?

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, পিরীতের কথা তুমি বুঝবে না সাহেব-বউ, পিরীতি করম পিরীতি ধরম, পিরীতি জীবন-সার, বুঝলে কিছু ?

—না বহিন, বুঝলাম না। আমাকে বাংলাটা শিখিয়ে দাও না, তোমায় কতদিন ধরে বলছি।

মুখুজ্জেগিন্নী হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে দেয়। বলে, সে পরে শেখাব, এখন তোমার কাছে অন্য কাজে এসেছি সাহেব-বউ, তোমার সাহেব কেমন আছে ?

প্রেমলানী সাহেবের আবার কী হল ? সাহেব-বউ ঠিক বুঝতে পারলে না।

—তুমি দেখছি ভাতারের কিছ্‌ছু খবর রাখ না সাহেব-বউ। শোন—

বলে আঁচলের গেরো খুলে কী-একটা শেকড় বার করে বললে, এই এইটে বেশ ভালো করে জলে ধুয়ে শিলে বেটে নিয়ে কাল সকালে সাহেবকে খাইয়ে দিও তো—সেদিন সাহেবের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তোমার সাহেবের তো আবার লজ্জা খুব, আমাকে দেখে আবার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন।

বললাম, কেমন আছেন সাহেব ?

তোমার সাহেব বললে, কোমরে ব্যথা বড়, কদিন ঘুম হচ্ছে না ভালো—তা এই শেকড়টা খেলে ঘুম হবে ভালো, কোমরের ব্যথা সেরে যাবে।

তারপর সাহেব-বউয়ের কানের কাছে মুখ এনে বললে, কিন্তু একটা কথা আছে সাহেব-বউ, এই শিকড়টা যদ্দিন ধারণ করবে, তোমরা দুজনে এক বিছানায় শুতে পারবে না—কেমন, মনে থাকবে তো ? মন কেমন করবে না তো ?

সাহেব-বউ খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগল কথা শুনে। মুখুজ্জেগিন্নীও কথাটা বলে হেসে উঠল।

—যাই সাহেব-বউ, আমার আবার তাড়া আছে।

নটু ঘোষের বউ আবার পোয়াতি হয়েছে। মুখুজ্জেগিন্নী নটু ঘোষের বাড়ি হয়ে তারপর ফিরে যাবে।

নটু ঘোষের বাড়িতে তখন ঝি এসে গেছে। সদর-দরজা খোলা।

মুখুজ্জেগিন্নী ঢুকেই বললে, দিদি কোথায়?

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, এই যে এস ভাই—এস—

নটু ঘোষের ছেলেমেয়ে অনেক। বড় মেয়েরই বয়স ষোল। তারপর তেরো, বারো, এগারো। এমনি পর পর। এতদিন কলকাতাতে হয়েছে। কিছু ভয় ছিল না। এখানে এই বন-জঙ্গলের দেশে কোথায় দাই, কোথায় ডাক্তার, কোথায়ই বা ওষুধ। একটা নতুন ধরনের ওষুধ চাইলেই হেডঅফিসে লিখতে হয়। তিন মাস পরে তার উত্তর আসে, ওষুধ আসতে দেরি হয় আরও কিছু দিন। ততদিন রোগী মরে ভূত হয়ে যায়। প্রথম প্রথম নাকি আরও মরত। হেডঅফিসে চিঠি লিখেও কিছু ফল হয় নি। ওষুধের জন্যে হাসপাতালের সামনে ভিড় হয়ে থাকত সকাল থেকে। শুধু কলোনীর লোক নয়, কোম্পানীর লোকই নয়, বাইরের লোকও আসত প্রচুর। গাঁয়ের চাষাভূষো তারা। দশ-মাইল বিশ-মাইল দূর থেকে তারা চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আসত। আর রোগও কি সব এক রকমের! বিশ্রী বিশ্রী রোগ। একবার গায়ে একটা ঘা হলে আর সারতে চাইত না।

জেনকিন্‌স্ সাহেব বিলিতী মানুষ। বউ আছে কি নেই তার ঠিক নেই। থাকলেও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পড়ে আছে। এখানে একলা-একলা আঙুল কামড়ে পড়ে থাকতে আসে নি। রাত্রে সাহেবের চাপরাসী গাঁয়ে চলে যায়। একজন-না-একজনকে তার ধরে আনা চাই।

তা জেনকিন্‌স্ সাহেব লোক ভালো। মাথা পিছু রাত পিছু পাঁচ টাকা করে দেয়। তেমন খুশী করতে পারলে পাঁচ টাকা কেন, পনেরো টাকাও দিয়ে ফেলে কাউকে কাউকে।

তারপর যখন রোগ বাড়ে তখন ডাক্তারকে ডাকে।

বলে, ডাক্তার একটা ওষুধ দাও—পেন্ হচ্ছে আবার—

ওষুধে একটু কমে, কিন্তু দুদিন বাদে আবার বাড়ে।

ভূধরবাবু বলেন, ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছ একেবারে, সাধ করে কি চান করে ফেলি রোজ—

নটু ঘোষ জিজ্ঞেস করেন, আর মাইনের টাকা?

ভূধরবাবু বলেন, এই তো ধাচ্ছি মাইনে নিয়ে, এগুলো নিয়ে চৌবাচ্চার জলে ফেলে দেব—

তারপর বললেন, বাড়ির খবর কী ঘোষ মশাই ?

নটু ঘোষ বলেন, ও আর আমি ভাবছি না, ও মুখুজ্জেগিন্নী আছেন, তিনিই দেখছেন—

তা সত্যিই নটু ঘোষ মশাইকে ভাবতেই হল না শেষ পর্যন্ত। নটু ঘোষের বড় বড় মেয়েরা পর্যন্ত পারল না।

বড় মেয়ে শেফালী বললে, কাকীমা এবার আপনি বাড়ি যান, কাকাবাবু একলা আছেন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে-সব তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি এক কাজ কর দিকি, বলু টুলুকে চান করিয়ে দিয়ে ভাত খেয়ে নাও, আমার কাজ এগিয়ে থাক্—

মুখুজ্জে মশাই সে কদিন রেঁধে খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। আলুভাতে আর ভাত। বাড়ির একটা চাবি রইল মুখুজ্জে মশাইয়ের কাছে আর একটা মুখুজ্জেগিন্নীর কাছে। সেই যে সোমবার রাত চারটেয় উঠে মুখুজ্জেগিন্নী গেল আর দেখা নেই। যাবার সময় শুধু বলে গিয়েছিল—ঘরদোর খুলে রেখে যেন চলে যেয়ো না—আমি চললুম—

তারপর সোজা নটু ঘোষের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে মুখুজ্জেগিন্নী। সাত ছেলে-মেয়ের মা বটে, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই-এ বড় ভয় পেয়েছিল নটু ঘোষের স্ত্রী। ডাক্তার আছে, কিন্তু ডাক্তারের উপর ভরসা কী! সেই ভয়েই বোধ হয় অর্ধেক শুকিয়ে গিয়েছিল।

নটু ঘোষের বউ বলেছিল, কী হবে ভাই ? কে দেখবে ?

মুখুজ্জেগিন্নী বলেছিল, চাকরটাকে দিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েই যেন আমাকে একটা খবর দেয়, আমি জানলার ধারে শুই, যত রাত্তিরই হোক আমায় একবার ডাক দিলেই চলে আসব দিদি, তুমি কিচ্ছু ভয় পেয়ো না—

কলোনীর ব্যাপার। ঠিক লাগোয়া বাড়ি নয়। এখানে একটা, তারপর একটা খাদ পেরিয়ে আর একটা। এ-বাড়ির কথা ও-বাড়িতে শোনা যায় না। রাত্তিরবেলা সমস্ত কলোনীটা খাঁ খাঁ করে চারদিকে। সাপখোপ আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে। আরও কত কী আছে, কত কী থাকতে পারে। দুপুরবেলাটা বেশ। নদীর এপার থেকে ওপার দেখা যায়। কালো রুক্ষ মাটি। ফুটিফাটা হয়ে আছে। হুকুম সিং-এর দোতলা কাঠের বাড়িটা ওপারে পাহাড়ের গায়ে যেন হেলান দিয়ে আছে। তারপর কেবল জঙ্গল, কেবল জঙ্গল। উত্তর

দিকে নদীর ধার ঘেঁষে একটা পাহাড়। সকাল থেকেই সেই পাহাড়ে পাথর ভাঙার কাজ শুরু হয়। গর্ত খুঁড়ে কুলীরা তার মধ্যে ডিনামাইট পুঁতে দেয়। দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় দূরে। তারপর দড়াম করে একটা বিকট শব্দ হয়। পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলোনী থেকে সেই দৃশ্য দেখে নটু ঘোষের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু রাতটাই ত ভয় করে বেশি। তখন বিলাসপুর থেকে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছুটে আসে। ট্রেনটা রেলের পুলটার উপর উঠলেই কেমন একটা ভয়ানক গুম্ গুম্ শব্দ হয়। নটু ঘোষের বউ তখন ভয়ে আধমরা হয়ে যায় যেন।

ভোর বেলাই মুখুজ্জেগিন্নী গিয়ে হাজির হয়েছে।

নটু ঘোষ সামনে পায়চারি করছিল। বললে ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা কোথায় দিন, আর ডাক্তার ডাকতে গেছে তো?

নটু ঘোষ বললেন, হ্যাঁ—

তারপর সেই যে মুখুজ্জেগিন্নী ঢুকলো ও-বাড়িতে, বেরল সেই তিন দিন পরে। দিন নেই রাত নেই পোয়াতির কাছে বসে সেবা করা। আমার দাদা যতবার গেছে, মুখুজ্জেগিন্নীর সেবা দেখে অবাক হয়ে গেছে। এবার ছেলে হয়েছিল একটা। কিন্তু মরা ছেলে। নটু ঘোষের বউ মরে যেত বোধ হয়। ব্যথাও খুব পেয়েছিল। চাপ-চাপ রক্ত বেরিয়েছিল। আর রক্তও কি একটু-খানি! সেই রক্ত পরিষ্কার করা, পোয়াতিকে খাওয়ানো, ছেলে-মেয়েদের দেখা।

নটু ঘোষ পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন, খুব করলে যা হোক মুখুজ্জেগিন্নী!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কী আর করতে পারলাম দাদা, ছেলেটাকেই বাঁচাতে পারলাম না—

নটু ঘোষ বললেন, তা আর কী হবে, মানুষটা যে বেঁচে উঠেছে, ওই-ই যথেষ্ট—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আপনি আজকে অফিস যান—

—আমি অফিসে গেলে, দেখবে কে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি তো আছি, আমি দেখব—

নটু ঘোষ বললেন, মুখুজ্জে মশাইয়ের হয়ত খুব কষ্ট হচ্ছে একলা রেঁধে খেতে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা হোক, আপনি ওঁকে বলে দেবেন, আরও দু দিন আমি যেতে পারব না বাড়িতে, একটু চালিয়ে নেন যেন—

সাহেব-বউও এসে একদিন দেখে গেল। নটু ঘোষের বউ তখন সেরে উঠেছে।

নটু ঘোষের বউ বললে, মুখুজ্জেগিন্নীর জন্তেই আমি বেঁচে গেলাম ভাই এ-যাত্রা, নইলে আমার তো হয়েই গিয়েছিল—

রাস্তায় ওভারসিয়ার নগেন সরকারের সঙ্গে দেখা।

বললে, বলিহারি আপনাকে, মুখুজ্জেগিন্নী।

মুখুজ্জেগিন্নী হাসলে। বললে, কেন ঠাকুরপো, আমি আবার কী করেছি ?

নগেন সরকার বললে, মানুষ নন আপনি, সত্যি—

—ওমা, ঠাকুরপো কি যে বলে, মানুষ নই তো কী, রাক্ষসী ?

—আমাদের কারখানায় তাই কথা হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কারখানায় তো আপনাদের তাহলে খুব কাজ-কর্ম হয় ?

—না, ঠাট্টা নয় মুখুজ্জেগিন্নী, ডাক্তারবাবুও বলছিলেন, এমন সেবা হাসপাতালের নার্সরাও পারবে না।

ভূধরবাবু বললেন, ওহে, ক্যারেকটারটাই সব, জান, কাটলেটই খাক আর চপই খাক। ক্যারেকটার যদি ভালো হয় তো কোনও কাজই মানুষের অসাধ্য নয়, ওঁর ক্যারেকটারটাই যে খাঁটি—

নগেন সরকার পরদিন সোজা বাড়ি এসে হাজির।

বাইরে থেকেই ডাকলে, মুখুজ্জেগিন্নী, ও মুখুজ্জেগিন্নী—

ভিতর থেকে মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কে ? ঠাকুরপো ? এস ভাই এস।

বলতে বলতে সামনে এসে বললে, কী হলো ঠাকুরপো ? কী মনে করে ? কারখানা নেই ?

নগেন সরকার ভিতরে এসে ঘরে বসল। বললে, ছুটি নিয়েছি আজ।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তোমার হাতে আবার কী ঠাকুরপো ?

—এই প্রসাদ এনেছিলুম, হনুমানজীর মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলাম কিনা।

হনুমানজীর মন্দির অনুপপুর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, গরুর গাড়ি করে যেতে হয়।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ওমা, ঠাকুরপোর দেখছি আজকাল ভক্তি-টক্তি হয়েছে খুব।

—না মুখুজ্জেগিন্নী, চাকরিতে কিছু মাইনে বাড়লো কিনা, তাই।

—কত বাড়ালো শুনি!

নগেন সরকার বললে, পঞ্চাশ টাকা। তা ভাবলাম প্রথমেই মুখুজ্জেগিন্নীকে প্রসাদটা দিয়ে আসি, আপনাকে দিয়ে খেলে যদি পুণ্যি হয়, পুণ্যাত্মা আপনি।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, দাঁড়াও ভাই ঠাকুরপো, বাসি কাপড়টা ছেড়ে আসি—

বলে ভিতরে গিয়ে মুখুজ্জেগিন্নী একখানা তসরের শাড়ি পরে এসে দু হাত জোড় করে প্রসাদটা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। তারপর ভিতরে রেখে এল।

এসে বললে, এবার একটা বিয়ে করে ফেল ঠাকুরপো, মাইনেও তো বাড়লো এবার—

নগেন সরকার বললে, তেমন মেয়ে কোথায়? একটা ভালো দেখে মেয়ে খুঁজে দিন না—

—ওমা, হাসালে তুমি ঠাকুরপো, বাংলা দেশে নাকি মেয়ের অভাব!

নগেন সরকার বললে, তা আপনার মত একজন মেয়ে খুঁজে দিন না, আমি এক্ষুনি বিয়ে করছি—

মুখুজ্জেগিন্নী হেসে ফেললে খিল্‌খিল্‌ করে। নগেন সরকারও হাসতে লাগল।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমাকে বুঝি ঠাকুরপোর খুব মনে ধরেছে ভাই?

নগেন সরকার বললে, তা আপনার মত মেয়ে পেলে কার না মনে ধরে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কই, তোমাদের মুখুজ্জে মশাইয়ের তো মন পেলুম না এখনও—

নগেন সরকার বললে, তা কি আর না ধরেছে! মুখুজ্জে মশাই নিজের মুখে বললেও বিশ্বাস করব না আমি—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি তো ভাই তোমাদের মুখুজ্জে মশাইকে তাই জিজ্ঞেস করেছিলুম, বললুম এত যে এখানকার সবাই আমার প্রশংসা করে, তোমার মুখে তো কখনও প্রশংসা শুনি না আমার!

—তা কি বললেন?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ও মানুষের কথা ছেড়ে দাও ভাই, উনি কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, নিজের বাজার করা আর খাওয়া হলেই নিশ্চিন্দি। এই যে আমি এতদিন নটু ঘোষবাবুর বাড়ি পড়ে ছিলাম, তাতেও ওঁর রাগ-বিরাগ কিছু নেই।

নগেন সরকার বললে, আমরা তো তাই বলাবলি করি আপনার সম্বন্ধে—

—কী বলাবলি কর?

নগেন সরকার বললে, স্টোর্সের বড়বাবুকে চেনেন তো, ভূধরবাবু? তিনি তাই বলছিলেন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ও, ওই যে মাথায় টিকি আছে—

—হ্যাঁ, উনি ভারি সাত্ত্বিক লোক, রোজ নদীতে গিয়ে ভোরবেলা স্নান করে জপ-আহ্নিক সেরে তবে সংসারের কাজ করেন—! আর শুধু কি ভূধরবাবু? আমাদের জেনকিন্‌স্ সাহেবও তো আপনার প্রশংসা করেন—

—সে তো আমার হাতে কাট্‌লেট খেয়ে।

—না মুখুজ্জেগিন্নী, নটু ঘোষের বউকে আপনি এই যে কদিন সেবা করলেন না, এ-ও সাহেবের কানে গেছে। এবার সাহেব বলেছে হাসপাতালে একটা নার্স আসবে, হেডঅফিসে চিঠি চলে গেছে।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা যা-ই বল ঠাকুরপো, তোমাদের সাহেব লোকটা ভালো নয় বাপু—

—কেন? কী করলে সাহেব?

মুখুজ্জেগিন্নী বললেন, ওই যে রোজ গাঁয়ের মেয়ে ধরে এনে এনে রাত্তিরে ঘরে পোরা, এটা কি ভালো? এটা তোমরা আপত্তি করতে পার না?

নগেন সরকার বললে, ও আর কী করবে বলুন, বিদেশ থেকে এসেছে, এখানে মেম-সাহেবটাহেব কিছু নেই, কী করে কাটায় বলুন?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা মেয়েমানুষ না হলে চলে না? এই যে ভূধরবাবু রয়েছেন; তুমি রয়েছ, তোমরা কটা মেয়েমানুষ এনে বাড়িতে পোর শুনি? তোমাদের দিন কাটে না?

নগেন সরকার বললে, আমাদের কথা আলাদা মুখুজ্জেগিন্নী, আমরা হচ্ছি গরিব ওভারসিয়ার কেরানী এই সব, আমাদের যে খারাপ হবার যোগ্যতাটুকুও নেই—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, এই যে তুমি, পুজো দিতে গেলে সেই চল্লিশ মাইল দূরে কোথায়, তোমরা নিজেরা নিজেদের জন্যে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পার না?

—মন্দির? সে যে অনেক টাকা মুখুজ্জেগিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ওই তো তোমাদের মুরোদ, একটা ভালো কাজ বললেই তোমাদের টাকার অভাব পড়ে—সবাই এক মাসে পাঁচ টাকা করে দিতে পার না?

নগেন সরকার বললে, পাঁচ টাকায় কী হবে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, মাথা পিছু পাঁচ টাকা দিলে মন্দির হবে না একটা ?

তখনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলে মুখুজ্জেগিন্নী। পাঁচ টাকা করে দিলেই এমনিতে তিনশো টাকা ওঠে। তারপর কন্ট্রাকটার হুকুম সিং আছে, ফোরম্যান্ প্রেমলানী সাহেব আছে, ডাক্তারবাবু আছে, তারপর জেনকিন্স্ সাহেব তো আছেই।

হিসেব করে দেখা গেল তিন হাজার টাকা উঠছে।

সেদিন অনুপপুরে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথাটা আজও মনে আছে। সে কী উৎসাহ! সবাই হিন্দু। ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়েই বেশির ভাগ লোকের সংসার। বাড়ি-ঘর-ডাক্তার-জল সবই ব্যবস্থা করছে কোম্পানী। তা হলে ওটাও ওই রকম দরকারী। মন্দির হলে হিন্দু মাত্রেরই সুবিধে। ঠাকুর-দেবতার মন্দির কার না দরকার। কথাটা নটু ঘোষবাবুও স্বীকার করলেন।

বললেন, কথাটা মন্দ তোলেন নি মুখুজ্জেগিন্নী, এই তো আমার গিন্নী সেদিন নীলের উপোস করলেন, তা শিবলিঙ্গ নেই যে শিবের মাথায় জল দেবেন—

প্রেমলানী সাহেব কথাটা শুনে বললেন, ভেরি গুড্ আইডিয়া, আমি দেব পঞ্চাশ টাকা আর কারখানা থেকে পাথর আর সিমেণ্টটা ফ্রি দিয়ে দেব—

হেড অফিসেও চিঠি লিখে দেওয়া হল। জেনকিন্স্ সাহেব তাতে সই করে কড়া সুপারিশ করে দিলেন।

নটু ঘোষের বউ বললে, ধন্যি মায়ের দুধ খেয়েছিলে তুমি ভাই, উনি তো ধন্য ধন্য করছিলেন তোমাকে···

প্রেমলানী সাহেবের বউ বললে, তোমার চেষ্টাতেই হল বহিন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আগে হোক সাহেব-বউ, তখন বোল—

যারা ছোকরা কেরানী, অনুপপুরে মেস্ করে থাকত, তারাও বললে—মুখুজ্জেগিন্নী বাহাদুর মেয়ে ভাই—

স্টোর্সের বড়বাবু ভূধরবাবু বললেন, বুঝলে হে, আমি তোমাদের বলেছিলুম, পৃথিবীতে আসল জিনিস হল ক্যারেক্টার, ক্যারেক্টারটি খাঁটি হলে ও টাকা-ফাকা যা বল, ও-সব কিছুই না—মুখুজ্জেগিন্নীর ক্যারেক্টারটা যে খাঁটি।

মুখুজ্জেগিন্নীর ক্যারেক্টার সম্বন্ধে প্রথম-প্রথম ছোকরা কেরানীদের কিছু সন্দেহ হয়েছিল সত্যি। মুখুজ্জে মশাই যখন স্টেশনে প্রথম নামলেন বউ নিয়ে, স্টেশন মাস্টার অম্বিকা মজুমদার দেখেছিলেন।

এ-এস-এম কান্তিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, লোকটি কে হে ? কী বলছিল তোমাকে ?

কান্তিলালবাবু বললেন, কনস্ট্রাকৃশানের লোক, এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে—

—সঙ্গে বউ বুঝি ?

তা দেখে সকলেরই সন্দেহ হত প্রথম প্রথম। ছোকরারা মুখুজ্জে মশাইয়ের পাশে মুখুজ্জেগিন্নীকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতো একটু। মুখুজ্জেগিন্নী ঠিক যেন মুখুজ্জে মশাইয়ের উল্টোটা। মুখুজ্জেগিন্নীর চাওয়া, হাঁটা, পান খাওয়া, কথা বলা সবই কেমন যেন চটপটে, রঙ মেশানো। আবার মুখুজ্জে মশাই তেমনি নিরীহ গোবেচারা মানুষ। জামা-কাপড় সাদাসিধে। সরল অমায়িক মানুষ। আর মুখুজ্জেগিন্নী বেশ ফিটফাট্।

নটু ঘোষের বউও কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে।

মজুমদারগিন্নীকে বলেছিল, হ্যাঁ গা, তেরো নম্বর খুলিতে কারা এসেছে দেখেছ দিদি ?

মজুমদারগিন্নী বলেছিল, দেখি নি, কেন ?

নটু ঘোষের বউ বলেছিল, একদিন যাবে দেখতে ?

মজুমদারগিন্নীর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। ইস্টিশান থেকে অনেক দূর। সব দিন আসা যায় না। নটু ঘোষের বউ মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল একদিন এমনি। মুখুজ্জেগিন্নী সেই প্রথম দিনই আপন করে নিয়েছিল।

বলেছিল, নতুন এলুম দিদি, বিদেশ-বিভূঁই, উনিও একটু ভয়-কাতুরে মানুষ, আপনারা দেখবেন একটু—

—তা আমরাও তো নতুন ভাই, কে আর পুরনো এখেনে !

সেই থেকে সূত্রপাত, তারপর ভাব হয়ে গেল দুজনে। তারপরে আর ভাব থাকতে বাকি থাকল না কারও সঙ্গে। যে ছোকরারা প্রথম প্রথম দূর থেকে নিঃশব্দে টিট্‌কারি দিত, তারাই শেষকালে মুখুজ্জেগিন্নী বলতে অজ্ঞান।

নেপাল যখন-তখন আসত। বলত, মুখুজ্জেগিন্নী চা খাব।

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, হ্যাঁ রে তুই আর আসিস না যে ?

নেপাল বলত, কলকাতায় গিয়েছিলাম, হেড অফিসে—বেস্পতিবারে এসেছি—

ওমা, বেস্পতিবারে এসেছিস্ আর আজ শনিবার, এতদিনের মধ্যে একদিনও আসতে নেই ? একেবারে ভুলে গেলি মুখুজ্জেগিন্নীকে ?

শুধু নেপাল নয়। নেপাল আছে, অরুণ আছে, বিমল আছে।

হঠাৎ হয়ত একদিন অরুণ দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে, মুখুজ্জেগিন্নী, একটু তরকারি দাও তো ?

—শুধু তরকারি ? শুধু তরকারি কী করবি রে ?

অরুণ বলে, নেপালটা রেঁধেছিল, নুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে সব, এখন খেতে পারি না—দাও তোমার কী তরকারি আছে, দাও, নইলে খাওয়া হবে না আজ—

মুখুজ্জেগিন্নী হাসতে হাসতে বলে, কী কাণ্ড দেখ দিকিনি, আমি না থাকলে তোদের তো আজ খাওয়াই হত না—

অনেকখানি ডাল আর আলুর সঙ্গে মাগুর মাছের তরকারি।

দেখে তো অরুণ অবাক। বললে, ও বাবা, এতখানি তরকারি দিলে কেন ? আমরা তো দুজন !

মুখুজ্জেগিন্নী বলেছিল, তা হোক, তোরা খা—

—এ কী, সবটাই যে আমাদের দিয়ে দিলে, তা তোমরা খাবে কী ? মুখুজ্জে মশাই তো অফিস থেকে এসে এখন খাবে ?

—তা হোক, তুই নিয়ে যা।

এক-একদিন তাস খেলা হত। জুড়ি হত মুখুজ্জেগিন্নী আর নেপাল একদিকে আর ওদিকে অরুণ আর বিমল। খেলতে খেলতে ঝগড়া হত। আবার ভাবও হত। হাসির বন্যা ছুটে যেত ঘরময়। মুখুজ্জেগিন্নী বলত, না, নেপালটাকে নিয়ে আর খেলব না এবার থেকে, অরুণ তুই আমার সঙ্গে খেলবি কাল থেকে—

নেপাল বলত, বা রে, আমি কী করে জানব তোমার হাতে হরতনের টেক্কা আছে !

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, তুই একটা হাঁদা, দেখছিস আমি নওলা দিয়ে চুপ করে রইলুম, তোর তো তখুনি বোঝা উচিত ছিল।

খেলার সময় হঠাৎ হয়ত মুখুজ্জে মশাই হাজির হন।

বলেন, খেলছ তোমরা খেল—খেল—

তারপর মুখুজ্জেগিন্নীর দিকে চেয়ে বলেন, ওগো, তিনটে টাকা দাও তো গো ?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, আবার টাকা কী হবে !

মুখুজ্জে মশাই বলতেন, সবাই খেতে চেয়েছ অফিসে—

—কেন ? খেতে চেয়েছে কেন ?

মুখুজ্জে মশাই বলতেন, ওই যে এ-মাসে পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে আমার, তাই মিষ্টি খেতে চেয়েছে সবাই, বলেছি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে খাওয়াব—

মুখুজ্জেগিন্নীর তখন খেলার দিকে লোভ। রুইতনের সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দান দিতে হবে। মুখ তোলবার সময় নেই।

বললে, চাবি নিয়ে বাক্স খুলে নাও—

এবার এই নেপালরাই এগিয়ে এল। বললে, আমরাই তোমার মন্দিরের চাঁদা তুলে দেব—মুখুজ্জেগিন্নী, কত টাকা লাগবে বল ?

চাঁদা নিয়ে প্রথমটা একটু গোলযোগ হয়েছিল। সবাই পাঁচ টাকা করে দিতে পারবে না। বিশেষ করে যারা কম মাইনে পায়। তাও সবাই নয়। দু-একজন।

তারা বললে, মন্দির করে লাভ কী ? তার চেয়ে থিয়েটার হোক না। "সাজাহান" কিংবা "মেবার পতন" হোক দু নাইট, ড্রেসার, পেণ্টার কলকাতা থেকে এনে ওই টাকাতে বেশ ভালো করে থিয়েটার করা যাক আর যদি কিছু বাড়তি থাকে তো ফিস্ট্ হোক, সবাই মিলে পেটভরে মাংস আর পোলাও খাওয়া যাবে একদিন—

নটু ঘোষ বললেন, যত সব ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড, আমি ওতে এক পয়সা দেব না চাঁদা—

প্রেমলানী সাহেব বললেন, কেন ? টেম্প্‌ল্‌ হবে না কেন ?

কর্তারা বললে, কয়েকজন বেঁকে বসেছে, তারা বলছে মন্দিরের বদলে থিয়েটার হবে—

প্রেমলানী সাহেব বললেন, থিয়েটার! থিয়েটারও মন্দ না, তবে থিয়েটারই হোক—

কিন্তু স্টোর্সের বড়বাবু ভূধরবাবু বললেন, জানি হবে না, বাঙালীদের ইউনিটি নেই কোথাও, আমি তখুনি বলেছিলাম—ক্যারেক্‌টার না থাকলে ও-সব একতা-টেকতা সব হাওয়ায় উড়ে যায়, দরকার নেই, দাও ভাই আমার পাঁচটা টাকা আমায় ফেরত দিয়ে দাও—

প্রায় ভেঙ্গে যায়-যায় অবস্থা।

হঠাৎ খবরটা কানে যেতেই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মুখুজ্জেগিন্নী।

ছুটির দিন সেটা। নগেন সরকার বাড়িতে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধছিল। জানলা খোলা। বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলে, ঠাকুরপো—

নগেন সরকার মুখুজ্জেগিন্নীকে দেখেই গান থামিয়ে দিয়েছে। বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, আপনি ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কে বলছে মন্দির হবে না ?

নগেন সরকার মুখুজ্জেগিন্নীর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

বললে, কয়েকজন বলছে ··

—তাঁরা কে ? নাম কী তাঁদের ?

নগেন সরকার বললে, নাম ··

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি বলছি হবে—কোম্পানী থেকে টাকা দিক-বা-না-দিক, কেউ বাধা দিক-বা-না-দিক, মন্দির হবেই—

নগেন সরকার কিছু কথা বলতে পারলে না মুখুজ্জেগিন্নীর সামনে গিয়ে।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তুমি আছ কিনা বল আমার সঙ্গে ?

নগেন সরকার বললে, আমি আছি মুখুজ্জেগিন্নী—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা হলে এই নাও—

বলে বাঁ হাতের একগাছা সোনার চুড়ি ডান হাত দিয়ে জোর করে খুলে ফেলল।

বললে, কেউ না দেয়, আমার দেওয়া রইল, দরকার হলে সব চুড়িগুলোও দিয়ে দেবো, নাও, তোমার কাছে রাখ—

তারপর সেইদিনই মুখুজ্জেগিন্নী আর নগেন সরকার কলোনীর সকলের বাড়ি বাড়ি গেল। সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বললে। তাদেরও বক্তব্য শুনলে। নেপাল অরুণ বিমল ওরাও জুটল সঙ্গে।

নেপালরা বললে, কিছু ভয় নেই মুখুজ্জেগিন্নী, আমরা তোমার সব টাকা যোগাড় করে দেব—

সেইদিন থেকেই শোরগোল পড়ে গেল কলোনীতে। নেপালরা ট্রেনের সময় স্টেশনে গিয়ে চাঁদা চায়। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। এক পয়সা দু পয়সা থেকে শুরু করে এক টাকা দু টাকা পর্যন্ত দেয় কেউ কেউ। প্রথম দিনেই কুড়ি টাকা বারো আনা উঠল, তারপর দিন তেইশ টাকা দু পয়সা।

মুখুজ্জেগিন্নীর কথা শুনে প্রেমলানী সাহেবের বউও নিজের হাতের একগাছা সোনার চুড়ি খুলে দিলে। নটু ঘোষের বউ সোনার চুড়ি দিতে পারলে না। তার অনেক মেয়ে। বিয়ে দিতে হবে। তা-ও কুড়ি টাকা চাঁদা দিলে।

জেনকিন্‌স্‌ সাহেব দিলেন পাঁচশো টাকা নিজের পকেট থেকে।

হেড অফিস থেকেও অনুমতি দিয়ে চিঠি এসে গেল। জমি দিতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। দাদাকেও কিছু দিতে হল। মুখুজ্জেগিন্নী নিজে এসে বলে গেল যে ডাক্তারবাবু আসছে শনিবার দিন কিন্তু আপনাকে বিকেলবেলা যেতে হবে, ওই দিন ভিত খোঁড়া হবে—

আজ এতদিন পরে এই বিড্‌ন্ স্কোয়ারের সামনে মুখুজ্জে মশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আবার সব সেই কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। সেই কলোনীর মাঠের ধারে হাসপাতালের ঠিক পিছনে। কী ভিড় সেদিন সেখানে। কেউ আর বাদ যায় নি সেদিন। ওদিকে বিজুরি, মনেন্দ্রগড়, চিরিমিরি থেকেও লোক এসে গেল। কন্‌ট্রাক্‌টার হুকুম সিং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করতে লাগলেন।

মুখুজ্জেগিন্নী ঘুরে ঘুরে সকলকে সবিনয়ে বলতে লাগল, আপনারা এসেছেন, আমরা যা উৎসাহ পেলাম—

নটু ঘোষ পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে।

বললেন, এই ইনিই হচ্ছেন আমাদের মুখুজ্জেগিন্নী, মিসেস মুখার্জি—বলতে গেলে এঁরই চেষ্টাতে এ মন্দির হল—

মুখুজ্জেগিন্নীর সেদিন সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া নেই। সব চুকেবুকে গেলে মুখুজ্জেগিন্নী বাড়িতে এলেন যখন, তখন অনেক রাত।

নেপালরাও এসেছিল। মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কাল সক্কালবেলা আসবি তোরা—আমার কাছে টাকা-কড়ি রইল, আজকের হিসেবটা লিখে নেব খাতায়—

হিসেবটা ছিল খুব কড়াকড়ি। এক পয়সার হিসেবও নিয়েও মুখুজ্জেগিন্নী এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিত।

বলত, মন্দিরের টাকা, এর প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব দিতে হবে আমাকে, তখন গোলমাল হলে কে জবাবদিহি করবে ?

রোজ রাত্রে মেঝের উপর শতরঞ্জি পেতে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে হিসেব হয়। নগেন সরকার আসে। নেপাল আসে। অরুণ বিমলও আসে।

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, কাল যে আটা কেনা হল ঠাকুরপো, সে-হিসেবটা দিলে না তো ? তোমাকে যে পাঁচ টাকার নোট দিলাম, তার থেকে তুমি আমায় ফেরত দিয়েছ তিনি টাকা সাড়ে তের আনা, বাকি এক টাকা দশ পয়সার কী-কী কিনলে ?

নগেন সরকার বললে, পুরুত মশাইকে দিয়েছি তিন পয়সা বিড়ি খেতে; সেটা লিখেছ ?

এই রকম কত হিসেব কড়া ক্রান্তি পাই পয়সাটা পর্যন্ত। হিসেব না মিললে মুখুজ্জেগিন্নীর যেন মাথা ঘুরে যায়।

যখন সব হিসেব মিলিয়ে মুখুজ্জেগিন্নী শুতে যায় তখন অনুপপুর কলোনীতে অন্ধকার নিশুতি। মুখুজ্জে মশাইয়ের এক ঘুম হয়ে গেছে। আবার ভোরবেলা যখন মুখুজ্জে মশাই ঘুম থেকে উঠেছে তখন দেখেছে মুখুজ্জেগিন্নী অনেক আগেই উঠে স্নান করে রান্না চড়িয়ে দিয়েছে।

বলতাম, এত সকালে যে ? এত সকালেই রান্না চড়িয়েছ মুখুজ্জেগিন্নী ?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, এখন রান্না না চড়ালে কখন চড়াব, এখনই তো মিস্ত্রীদের হিসেব নিয়ে হুকুম সিং-এর কাছে যেতে হবে একবার—

হুকুম সিং কুলী মজুরের দামটা নিজে দেবে বলেছে। পুরো দমে তখন কাজ চলছে। মন্দির শুধু নয়, মন্দিরের সামনে একটু ঢাকা বসবার জায়গাও হচ্ছে। ওখানে দরকার হলে গীতাপাঠও হবে, চণ্ডীপাঠও হবে, দরকার হলে কীর্তনও হতে পারে।

রেল লাইনের কনস্ট্রাক্‌শানের কাজ। আট দশ বছর চলবে এ-সব। তারপরে হয়ত এখানে শহর গড়ে উঠবে। অনুপপুর জংশন স্টেশন হবে। কয়লা-খনির আশেপাশে যেমন কল-কারখানা গড়ে ওঠে তেমনি সব গড়ে উঠবে। কলকাতার লোক আসবে, দিল্লীর লোক, মাদ্রাজের লোক, বোম্বাই-এর লোক আসবে। তখন সবাই এই মন্দির দেখে জিজ্ঞেস করবে, এ মন্দির কারা তৈরি করেছিল ?

তখন নাম হবে এই আজকের কলোনীর লোকদের। এই কজন হিন্দু, তারা নিজেদের সামান্য আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে চাঁদা দিয়েছিল মন্দিরের জন্যে।

প্রেমলানী সাহেব বললেন, মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা বলতে গেলে যখন মিসেস মুখার্জির চেষ্টাতেই একরকম হল; ওঁর নামেই ট্যাব্‌লেট্ লাগানো হোক— মিস্টার ঘোষ, আপনার, কী মত ?

নটু ঘোষ বললেন, আরে মশাই, আমার স্ত্রী তো মরতেই বসেছিল, মুখুজ্জেগিন্নী না থাকলে, এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে তো উইডোয়ার হয়ে যেতাম— মেয়েরা মুখুজ্জেগিন্নীকে কাকী বলে ডাকে, জানেন ?

নগেন সরকার বললে, এ মন্দিরের কথা প্রথম মুখুজ্জেগিন্নীই তুলেছিলেন আমার কাছে—সুতরাং, সমস্ত ক্রেডিট তাঁরই—

শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জেগিন্নীর কানে গেল কথাটা।

তিনি বললেন, ছি ছি, আমার নাম যদি থাকে তো আমি এই মন্দিরের ব্যাপারে আর নেই আজ থেকে, এই বলে দিলাম।

নগেন সরকার বললে, কিন্তু আপনিই তো সব মুখুজ্জেগিন্নী—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তুমি বলছ কি ঠাকুরপো, আমি কি একলা এ-সব করতে পারতুম তোমরা না থাকলে ?

নেপাল বললে, আচ্ছা মুখুজ্জেগিন্নী, তুমি তাহলে সেক্রেটারী হও এই মন্দির কমিটির—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি কিছুই হব না, হতে চাইও না, আমি শুধু রোজ ঠাকুরের মাথায় জল দিয়ে আসব, প্রণাম করে আসব। আর আমার নাম নিয়ে কী হবে বল্ না! আমি মেয়েমানুষ—তোরাই কেউ সেক্রেটারী হ, প্রেসিডেন্ট যা-কিছু হ—

শেষে একদিন মন্দির তৈরি শেষ হল।

সবাই বললে, উদ্বোধনের দিন একটা মিটিং ডাকা হোক—

কথা ছিল সামান্য করে হবে অনুষ্ঠানটা কিন্তু হতে হতে শেষ পর্যন্ত আয়োজন হয়ে গেল অনেক। হুকুম সিং সামনে চাঁদোয়া খাটিয়ে দিলে বিনা পয়সায়।

মুখুজ্জে মশাই কাট্‌নিতে চলে গেলেন খাবার কিনতে। রেওয়ার ঠাকুর সাহেব প্রেসিডেন্ট হতে রাজী হয়ে গেলেন। সব যোগাড়যন্ত্র শেষ। মুখুজ্জে মশাই-ই নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপিয়ে আনলেন কাট্‌নি থেকে। ভদ্রলোক মন্দিরের জন্যে একবার কাট্‌নি যান আবার আসেন। ফিরে এসেই আবার পরের ট্রেনে কাট্‌নি যেতে হয়।

নগেন সরকার বললে, আপনার খুব খাটুনি হচ্ছে মুখুজ্জে মশাই—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, না না ঠাকুরপো, বাজার করতে ওঁর কোনও কষ্ট নেই—

তারপর মুখুজ্জে মশাইকে বললে, সব আনলে, কিন্তু পনেরোটা কাচের গেলাস চাই যে—

মুখুজ্জে মশাই বললেন পনেরোটা কাচের গ্লাস ? দেখি নিয়ে আসি তাহলে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কোত্থেকে নিয়ে আসবে ?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, এর বাড়ি দুটো, ওর বাড়ি পাঁচটা, এমনি করে যোগাড় করে নিয়ে আসি—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা ছাড়া আর কী করবে ? আর দেখ, যদি কয়েকটা ট্রে কোথাও পাও নিয়ে এস তো, হুকুম সিংকে আমার নাম করে গিয়ে বল দিকিন—ওঁর কাছে থাকতে পারে—

এমনি সারাদিন খাটুনি গেল মুখুজ্জে মশাইয়ের। মুখুজ্জেগিন্নীরও কাজের কামাই নেই। ভোর বেলা রান্নাটা সেরে নিয়েই এখানে-ওখানে ঘুরতে লেগেছে। আর শুধু ওঁরাই নয়। নগেন সরকারও খাটছে। নেপাল, অরুণ, বিমল, তারাও খাটছে কদিন ধরে।

হঠাৎ নেপাল এসে বলে, মুখুজ্জেগিন্নী, ফুলের মালা আনতে হবে, মালার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে—

অরুণ বললে, কয়েকটা প্লেট আর কাচের গেলাসও তো দরকার—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে তোদের ভাবতে হবে না, মুখুজ্জে মশাইকে দিয়ে সব যোগাড় করে রেখেছি—

বিকেল বেলা সভা আরম্ভ।

আমরা সবাই যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। দাদা সকাল সকাল হাসপাতাল থেকে এসে গেছে। মুখুজ্জেগিন্নী বলে গেছে নিজে এসে, আপনাকে যেতে হবে কিন্তু ডাক্তারবাবু—

দাদা বলেছিল, আমার যে হাসপাতাল আছে—

মুখুজ্জেগিন্নী বলেছিল, আপনার হাসপাতালের পাশেই তো, আজকে রুগীদের না-হয় একটু সকাল সকাল দে নেবেন—

দাদা কথা দিয়েছিল যাবে।

হঠাৎ সকাল বেলার ট্রেনে প্রশান্তবাবু এসে হাজির। প্রশান্ত দত্ত। দাদার বন্ধু। ইন্সিওরেন্সের লোক। আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই, পরশু কলকাতা করতে হয় প্রশান্তবাবুকে। মাঝে মাঝে দাদার কাছে এসে পড়ে। একদিন দু'দিন থাকে, তারপর আবার চলে যায়।

দাদা বললে, ভালোই হয়েছে, আজ আমাদের এখানে একটা সভা আছে—

—কিসের সভা ?

দাদা বললে, একসঙ্গে যাব চল্, আমাদের এখানকার কলোনীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে একটা আজ—যেতেই হবে, না গেলে চলবে না—একটুখানি গিয়েই চলে আসব।

তা সত্যিই বিরাট আয়োজন হয়েছিল। কোথা থেকে পদ্মফুল এনেছিল নেপালরা। ধূপ ধুনো জ্বলছে। হুকুম সিং বসে আছে সামনে। তার পাশে

ইঞ্জিনীয়ার জেনকিন্‌স্ সাহেব, প্রেমলানী সাহেব। সামনে একটা উঁচু বেদী মতন করেছে বেঞ্চি সাজিয়ে। রেওয়ার ঠাকুর সাহেব গলায় মালা দিয়ে সভাপতির চেয়ারে বসে আছে। এদিকে মেয়েদের বসবার জায়গা।

প্রশান্তবাবুর বোধ হয় এ-সব ভালো লাগছিল না।

বললে, দূর, এসব কী শুনব! যত সব বাজে কাজ, চল্ ওঠ—

দাদা বললে, একটু শোন্ না, বিদেশে আছি, এ-সব ব্যাপারে না থাকলে বদনাম হয়—

প্রশান্তবাবু একটু সাহেব-ঘেঁষা লোক। বললে, এ-সব মন্দির-টন্দিরের ব্যাপারে আমি নেই ভাই, তোর ইচ্ছে হয় তুই শোন্, আমি চললাম—

নগেন সরকার বক্তৃতা দিলে একটা। ওভারসিয়ার মানুষ। লিখে এনেছিল বক্তৃতাটা।

বললে, আজকে আমাদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে যে-মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠা নিরলসভাবে কাজ করে এসেছে, তাঁকেই প্রথমে আমি ভক্তিভরে আমার প্রণাম জানাই, তিনি না থাকলে এ সম্ভব হত না। তাঁর নাম শ্রীমতী মুখার্জি। তাঁকে আপনারা সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কন্‌সট্রাকশনের ড্রাফটসম্যান্ মিস্টার মুখার্জির স্ত্রী।...

জেনকিন্‌স্ সাহেব বক্তৃতা দিলেন।

তিনি বললেন, ক্রিশ্চিয়ানদের পক্ষে যেমন চার্চ, তেমনি হিন্দুদের পক্ষে টেম্পল তাদের ধর্মের অঙ্গ—মিসেস মুখার্জি যখন এই টেম্পলের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে যান আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের হেড অফিস থেকেও যাতে কিছু টাকা পাওয়া যায় আমি তারও ব্যবস্থা করে দিই—

মুখুজ্জেগিন্নী লিস্ট দেখে বললে, ঠাকুরপো, এবারে তোমায় গান গাইতে হবে—

নগেন সরকার বললে, আমি গান গাইব? কী বলছেন আপনি?

—তা হোক, তোমার পর শেফালি গাইবে, তারপর দীপালি।

ডান হাতে একটা কাগজ নিয়ে কার পর কী হবে তারই ব্যবস্থা করছিল মুখুজ্জেগিন্নী।

নেপাল বলে, চায়ের জল চড়িয়ে দিই তাহলে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, এখন না, একটু পরে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, প্রত্যেক ডিসে দুটো করে সিঙ্গাড়া আর দুটো করে রসগোল্লা দিবি, আর প্রেসিডেন্টের জন্যে তো রাজভোগ আছে দুটো—

অরুণ বললে, প্রেসিডেন্টকে তাহলে কি আলাদা খেতে দেব—?

নগেন সরকার তাড়াতাড়ি কাছে মুখ এনে বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, ঠাকুর সাহেব এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চাইছে, সোডা আছে। সোডা দেব ?

অরুণ এসে বললে, এবার কে গাইবে মুখুজ্জেগিন্নী ? দীপালির গান হয়ে গেছে। ভূধরবাবু বললেন আপনাকে একটা গান গাইতে, শ্যামা-সঙ্গীত।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, না, না, আমার গান গাইবার সময় নেই, শেফালি আর একটা গান গাক্—আমি শেফালিকে বলে দিচ্ছি, শেফালিকে ডাক তো—

মুখুজ্জেগিন্নী সেদিন একটা গরদের লালপাড় শাড়ি পরেছে। চুলগুলো এলো খোঁপা করে বেঁধেছে। কপালের উপরে দুটো ভুরুর মাঝখানে একটা সিঁদুরের টিপও দিয়েছে মোটা করে। চমৎকার দেখাচ্ছিল মুখুজ্জেগিন্নীকে। একা আড়াল থেকে সব নজর রেখেছে। কোথাও কোনও গোলমাল হলে, অব্যবস্থা হলে, তার কাছে খবর আসে। একজনকে দিয়েছে আলোর ভার, একজনকে খাবারের। আর একজনকে অতিথি-আপ্যায়নের ভার দিয়েছে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। কোনও দিকে ত্রুটি নেই। বেশ নিঃশব্দে নির্বিঘ্নে সভার কাজ এগিয়ে চলেছে।

ভূধরবাবু ভিতরে এলেন। আজ তিনি তসরের কাপড়, তসরের চাদর পরেছেন। মাথার টিকিটা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ভিতরে ঢুকে তিনি বললেন, আমার মা কই, মা-জননী কই গো ?

একজন তাড়াতাড়ি মুখুজ্জেগিন্নীর কাছে এসে বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, বড়বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন—

মুখুজ্জেগিন্নী তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এল।

ভূধরবাবু তখনও ডাকছেন, মা, ও মা, মা-জননী কই আমার ?

মুখুজ্জেগিন্নী ভূধরবাবুর পায়ের ধুলো নিলে নিচু হয়ে।

বললে, আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না বড়বাবু—

ভূধরবাবু বললেন, না মা, তুমি কি সামান্য মানুষ! তুমি মহাশক্তি, যে যাই বলুক মা, আমার চোখ-কানকে তো কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না—

মুখুজ্জেগিন্নী লজ্জায় নুয়ে পড়ল।

বললে, ছি ছি, আমি যে কত অপরাধ করেছি—আর লজ্জা দেবেন না আপনি আমাকে—

ভূধরবাবু তবু বলতে লাগলেন, না না, আমি তোমার সন্তান, অবোধ সন্তান মা, সন্তানের একটা অনুরোধ রাখবে না তুমি মা হয়ে ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে কি কথা বাবা, বলুন আমি কী করতে পারি ?

ভূধরবাবু বললেন, একটা গান তোমার শুনব মা—আজকে। আর আপত্তি করতে পারবে না মা, বল গাইবে ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কিন্তু আমার যে অনেক কাজ এদিকে বাবা, আমি গানের দিকে গেলে এদিকটা কে সামলাবে ?

ভূধরবাবু বললেন, যিনি সামলাবার তিনিই সামলাবেন মা, তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র···

ভূধরবাবু বললেন, আর তা ছাড়া ঠাকুর-দেবতার স্থানে যে-সব গান এতক্ষণ গাইলে ওরা, সে কি গান ? একটা গানেও ভগবানের নাম নেই !

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কিন্তু সে-সব গান কি সকলের ভাল লাগবে !

ভূধরবাবু বললেন, ভগবানের নাম ভালো লাগবে না ? তুমি আমার মা হয়ে কী বলছ মা ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কোন্ গানটা গাইব আপনি বলুন—

ভূধরবাবু বললেন, কেন মা, তোমার সেই গানটা গাও না—'শ্যামা মা কি আমার কালো—'

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আচ্ছা বাবা, আপনি বসুন গিয়ে, আমি গাইছি—

ভূধরবাবু চলে গেলেন। মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তোমরা একটু এদিকটা দেখ, উনি ধরেছেন, গাইতে হবে—

সবাই লাফিয়ে উঠল। বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, আপনি গাইবেন সত্যি !

—না গেয়ে কী করি বল, উনি পিতৃতুল্য লোক, ওঁর কথা এড়াতে পারি ?

মনে আছে সেদিন সারা সভায় সে কী আলোড়ন! প্রথম যখন ওভারসিয়ার নগেন সরকার ঘোষণা করলে মুখুজ্জেগিন্নীর গানের কথা, চারদিকে হাততালি পড়ল পটাপট্ করে।

নগেন সরকার বললে, এবার আমাদের এই মন্দিরের যিনি প্রাণ, যিনি এর মূলে সেই শ্রীমতী মুখার্জি আপনাদের একটি শ্যামা-সঙ্গীত গেয়ে শোনাবেন—

প্রশান্তবাবু বললে—কে রে ?

দাদা বললে, আমাদের এখানে ড্রাফ্ট্‌স্‌ম্যান আছে, তারই বউ—খুব ভালো গান করে শুনেছি—

—এই মন্দির বুঝি তাঁরই করা ?

দাদা বললে, হ্যাঁ, শুধু মন্দির নয়, সব কাজেই তিনি আছেন, সকলের

বিপদে আপদে উনি দেখেন সকলকে। খুব মিশুক, সবাই ওঁকে খুব ভালোবাসে—

আস্তে আস্তে পর্দা সরে গেল। মুখুজ্জেগিন্নী এসে সামনে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে সকলকে প্রণাম করলে। পাশে তবলা নিয়ে বসে ছিল নেপাল। মুখুজ্জে-গিন্নী সেদিকে না চেয়ে চোখ বুজে গান ধরলে—

শ্যামা মা কি আমার কালো—

সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। যেন আলপিন পড়লেও শুনতে পাওয়া যাবে।

প্রশান্তবাবু বললে, আরে, এ যে বেনারসী—

ভূধরবাবু ভাবাবেগে একবার চিৎকার করে উঠলেন—মা-মা-মা—

সেই ভাবাবেগে সভার সমস্ত লোক যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যেমন সুন্দর কণ্ঠ, তেমনি সুর, আর তেমনি ভক্তি—

ভূধরবাবু বললেন, আহা, এই না হলে গান, গান যাকে বলে।

পাশে নটু ঘোষ বসেছিলেন।

তিনি বললেন, আহা, মনে খাঁটি ভক্তি না থাকলে এমন গান বেরোয় না বড়বাবু!

ভূধরবাবু বললেন, আর খাঁটি ক্যারেক্‌টারও চাই—আমি 'মা' বলে কি ডাকি সাধে!

প্রশান্তবাবু আবার বললে, আরে, এ বেনারসী না হয়ে যায় না—

দাদা বললে, থাম্ চুপ কর তুই এখন, গানটা ভালো লাগছে বেশ।

—আরে বেনারসী শ্যামা-সঙ্গীত গাইছে এখানে, এর কত ঠুংরি শুনেছি! ঠুংরিটাও ভালো গাইত ও—

—কোন্ বেনারসী?

প্রশান্তবাবু বললে, একটা বেনারসীকেই তো আমি চিনি বাবা, সব বেনারসীকে আমি চিনব কেমন করে!

দাদা বললে, এ তো আমাদের ড্রাফট্‌স্‌ম্যান মুখার্জির বউ, আমরা সবাই একে মুখুজ্জেগিন্নী বলে ডাকি!

প্রশান্তবাবু বললে, তুই থাম্, আমি বাজি রাখতে পারি এ বেনারসী, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের তেরো নম্বর ঘরের মেয়েমানুষ—

—বলছিস্ কী তুই?

ভূধরবাবু বললেন, একটু চুপ করুন—

সামনে থেকে কে একজন বললেন; চুপ করুন একটু—বড় গোলমাল হচ্ছে—

প্রশান্তবাবু চুপ করে গেল—

গান থামতেই প্রশান্তবাবু চীৎকার করে বললে, একটা ঠুংরি শুনব—

হঠাৎ দেখলাম মুখুজ্জেগিন্নী যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল হঠাৎ। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে উঠে ভিতরে যেতেই পর্দা টেনে দিলে।

বাইরে একটা হৈ-হৈ উঠল।

ভূধরবাবু বললেন, মা কী গান শোনালে, আহা—আহা—

নটু ঘোষ বললেন, মনে খাঁটি ভক্তি আছে কিনা, তাই ভাব দিয়ে গেয়েছে—আর একটা শুনতে ইচ্ছে করছে—ওহে আর একটা গাইতে বল না মুখুজ্জেগিন্নীকে।

একজন ছেলে ভিতরে গেল।

কিন্তু ভিতরেও তখন বেশ হৈ-চৈ চলেছে। নেপাল, অরুণ, বিমল সবাই ঘিরে রয়েছে মুখুজ্জেগিন্নীকে। বলছে, আর একটা গাইলে না কেন মুখুজ্জেগিন্নী ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমার মাথাটা খুব ঘুরছে রে, আমি আর থাকতে পারছি না।

হঠাৎ কে যেন ডাকলে, বেনারসী !

সবাই পিছন ফিরলে।

প্রশান্তবাবু সামনে গিয়ে হাসতে লাগল এবার।

বললে, বাঃ, এখানে কবে এলে বেনারসী ! কৃপালনী সাহেব আবার বায়না ধরেছিল তোমার ঘরে যাবে বলে। বাড়িউলী বললে, বেনারসী থাকে না এখানে, তা এখানে চলে এসেছ তুমি ? আমাদের তো বল নি কিছু ?

মুখুজ্জেগিন্নী যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। যেন সহ্য করতে পারছে না কিছু।

নেপাল বললে, আপনি কে ? কোত্থেকে আসছেন আপনি ?

প্রশান্তবাবু বললে, বেনারসীর সঙ্গে কথা বলছি আমি, আমার চেনা কিনা !

অরুণ বললে, মুখুজ্জেগিন্নীর শরীরটা খুব খারাপ, আপনি পরে কথা বলবেন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, এক গ্লাস জল দে তো—

প্রশান্তবাবু আর কিছু কথা না বলে হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেল। নেপাল জিজ্ঞেস করলে, ও ভদ্রলোক কে মুখুজ্জেগিন্নী ? তোমার চেনা ?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, মুখুজ্জে মশাইকে ডেকে দে তো, বাড়ির চাবি ওঁর কাছে, এখুনি বাড়ি চলে যাব—মাথাটা ঘুরছে খুব।

মুখুজ্জেগিন্নী চলে যাবে শুনলে ভয় পাবারই কথা! মুখুজ্জেগিন্নী চলে গেলে সব যে পণ্ড। মুখুজ্জেগিন্নী ছাড়া এত কাজ হবে কী করে? এখনও ঠাকুর সাহেবের বক্তৃতা বাকি আছে। সকলকে খাওয়ানো আছে। মুখুজ্জেগিন্নী না থাকলে কোথায় কী ত্রুটি ঘটে যাবে কে জানে!

বাইরেও তখন খুব গোলমাল।

নেপাল বললে, এবার কার বক্তৃতা হবে মুখুজ্জেগিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি চললাম, তোরা যা পারিস করিস ভাই—

মুখুজ্জে মশাই এসেছিল। ভিতরে। মুখুজ্জেগিন্নী বললে, চল—

মুখুজ্জে নির্বিরোধী মানুষ। তিনিও বললেন, চল—

বাইরে ভূধরবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেষকালে বললেন, ওহে, মুখুজ্জেগিন্নীকে আর একখানা শ্যামা-সঙ্গীত গাইতে বল না—

নটু ঘোষ বললেন, শুনছি তিনি নেই, চলে গেছেন নাকি—

—কেন? চলে গেলেন কেন?

আর একজন কে বললে, তিনি তো মুখুজ্জেগিন্নী নন, তিনি বেনারসী—

একজন বললে, বেনারসী মানে?

বেনারসী মানে বেনারসী দেবী!

—বলছেন কী?

—আজ্ঞে ঠিকই বলছি!

প্রশান্তবাবু বললে, আরে মশাই, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে গেছেন? গেলে বেনারসীকে চিনতেন। তার ঘরে একবার গেলে আর ভুলতে পারতেন না তার গান। সে যে মশাই এই কয়লার দেশে মুখুজ্জেগিন্নী হয়ে গেছে তা কী করে জানব?

দাদা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু তুই বেনারসীকে চিনলি কী করে?

প্রশান্তবাবু সিগারেট ধরালে একটা।

বললে, বাবা, আমার কাছে চালাকি! এই ইন্সিওরেন্সের দালালী করে খাই, কত মক্কেল চরালাম, ও গরদের শাড়িই পরুক আর সিঁথিতে সিঁদুরই দিক আমি ঠিক ধরে ফেলেছি—

দাদা জিজ্ঞেস করলে, তুই কি ওর ঘরে গিয়েছিলি?

প্রশান্তবাবু বললে, আরে, আমাকে তো নানান্ জায়গায় যেতে হয়

মক্কেলের জন্যে, কেউ হোটেলে খেতে চায়, কাউকে পার্টি দিতে হয়, কাউকে মদ খাওয়াতে হয়, নিজেও খাওয়ার ভান করতে হয়, আবার কাউকে মেয়েমানুষের বাড়ি নিয়ে যেতে হয়, যে যে-যেরকম মক্কেল তাকে সেইভাবে খাতির করতে হয়, 'কেস' পাবার জন্যে—

ভূধরবাবু বললেন, থামুন মশাই, সতিলক্ষ্মীকে নিয়ে যা তা বলবেন না, জিভ খসে যাবে আপনার—

নটু ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারবাবু ইনি আপনার বন্ধু নাকি ?

ভূধরবাবু বললেন, তা আমাদের চেয়ে কী আপনি বেশি চেনেন মুখুজ্জে-গিন্নীকে ? জানেন আমি মুখ দেখে ক্যারেকটার বলে দিতে পারি ?

প্রশান্তবাবু বললে, তা চলুন না, ভজিয়ে দিচ্ছি আপনার সামনেই, ও মুখুজ্জেগিন্নী না বেনারসী !

—চলুন, চলুন, ওঁর মুখের দিকে চেয়ে ও-কথা বলবার সাহস কী করে হয় আপনার দেখি।

—তা চলুন ! ভজিয়ে দিচ্ছি সামনা-সামনি।

ভূধরবাবু প্রশান্তবাবু দু'জনেই উঠলেন।

নটু ঘোষবাবু বললেন, চলুন ডাক্তারবাবু, ব্যাপারটা কী দেখাই যাক্ না—কী জানি মশাই, আমি যে ওর হাতের রান্না খেয়েছি, আমার স্ত্রীও খেয়েছে, ছেলেমেয়েরা সবাই খেয়েছে। কী হবে ?

ভূধরবাবু বললেন, আমিও তো খেয়েছি মশাই, ওঁর তৈরি সত্যনারায়ণের সিন্নী খেয়েছি তাঁরই বাড়িতে বসে, জানেন ? তা হলে বলছেন আমি লোক চিনি না ? জানেন, আমি এই বয়স পর্যন্ত মুখুজ্জেগিন্নী ছাড়া আর কারও হাতের ছোঁয়া খাই নি !

প্রশান্তবাবু বললে, অত কথায় কাজ কি মশাই, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—চলুন না—

কথাটা মেয়ে-মহলেও ছড়িয়ে পড়ল।

নটু ঘোষের বউ বললে, ওমা সে কি সর্বনেশে কথা মা, শুনে আমার যে হাত-পা হিম হয়ে আসছে !

সাহেব-বউ বললে, তা কখনও হতে পারে দিদি ?

স্টেশন মাস্টার অম্বিকা মজুমদারের বউ বললে, ওমা, কী কেলেঙ্কারির কথা ভাই, জাত-জন্ম সব গেল যে আমাদের !

সবাই ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমিও চললাম সঙ্গে। কিন্তু মুখুজ্জে-

গিন্নী নেই। মুখুজ্জেগিন্নী মুমুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে তখন বাড়ি চলে গিয়েছে। মাথা ধরার জন্য আর থাকতে পারে নি।

প্রশান্তবাবু বললে, তা হলে চলুন তার বাড়িতেই যাই—

ভূধরবাবু বললেন, চলুন—

নটু ঘোষবাবু বললেন, থাক্ থাক্, এত রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই, কাল সকাল বেলাই এর বিহিত করলে হবে'খন, আপনিও তো আছেন, আর আমরাও আছি—

প্রেমলানী সাহেব বললেন, সেই ভালো—

সে-রাত্রের মতন সেইখানেই সে-গোলমাল থামল। যা কর্তব্য পরের দিন স্থির করলেই চলবে। যে-যার বাড়ি চলে গেলেন। সভা আর বেশিক্ষণ জমলো না। ভাঙা আসর ভেঙে গেল মাঝপথে।

কিন্তু সকাল বেলা আবার যখন সবাই জড়ো হলেন, তখন ভূধরবাবুই আগে এসে হাজির আমাদের বাড়ি।

বললেন, কাল সারারাত আমার ঘুম হয় নি মশাই—যাকে মা বলে ডেকেছি তার এমন কাণ্ড যে ভাবতেই পারা যায় না মশাই—চলুন—

নটু ঘোষবাবুও এসে গেলেন শেষকালে।

বললেন, সারারাত কাল আমার স্ত্রী কেঁদেছে মশাই জানেন, কতদিন ছোঁয়ামেশা করেছে ওর সঙ্গে, শেফালি তো ওকে কাকীমা বলতে অজ্ঞান—

কলোনীর দক্ষিণ দিকে উঁচু খাদের উপর তের নম্বর কুঠি। বাইরে ফুলের বাগান। ফুল ফুটে আছে গাছে গাছে। মুখুজ্জেগিন্নীর কত সাধের বাগান। কিন্তু কাছে যেতেই দেখা গেল সদর দরজায় তালা ঝুলছে। কেউ কোথাও নেই। মুখুজ্জেগিন্নীর বাড়ির ঝিটা আসছিল এই দিকে।

নেপাল জিজ্ঞেস করলে, এই লছমী, তোর মা কোথায়?

নগেন সরকার বললে, হ্যাঁরে, মুখুজ্জেগিন্নী কোথায় গেছে রে?

লছমী বললে, মা কাল রাত্তিরের ট্রেনে চলে গেছে।

—চলে গেছে! কোথায়? সবাই যেন একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে।

—তা জানি নে বাবু!

—মাল-পত্তর নিয়ে গেছে?

লছমী বললে, মাল-পত্তর কিছুই নেয় নি বাবু, খালি হাতে চলে গেছে—

সেই শেষ। মুখুজ্জে মশাই আর মুখুজ্জেগিন্নীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি কারও। আর তারা ফিরেও আসে নি কোনোদিন। কলোনী আরও কয়েক

বছর ছিল সেখানে। চিরিমিরি পর্যন্ত রেল লাইন তৈরি হতে আরও চার-পাঁচ বছর লেগেছিল। লাইন শেষ হওয়ার পর কলোনী উঠে গেল। অফিসও উঠে গেল। সকলের চাকরিও চলে গেল। তালা ভেঙে মুখুজ্জেগিন্নীর জিনিসপত্রগুলো অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল। হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, তাকিয়া-বালিশ সমস্ত। তারপর সে জিনিসগুলো কী হল শেষ পর্যন্ত—কেউ আর খবর রাখে নি।

আজ এতদিন পরে বিডন্ স্কোয়ারের পাশে সেই মুখুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে যে আবার দেখা হবে ভাবতেই পারা যায় নি।

বললাম, মুখুজ্জেগিন্নী কোথায় ?

মুখুজ্জে মশাইয়ের মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বললাম, শেষকালে কিনা আপনি অনুপপুরের সকলের জাত মারলেন মুখুজ্জে মশাই !

মুখুজ্জে মশাইয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল টপ্ টপ্ করে।

বললাম, বিয়ে করতে আর মেয়ে পেলেন না আপনি ? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষকালে কিনা···

মুখুজ্জে মশাই আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি ধরে রাখলাম।

বললাম, বলুন আপনি, আপনাকে বলতেই হবে, কেন আপনি বিয়ে করেছিলেন একটা বাজারের মেয়েমানুষকে ? কোত্থেকে পরিচয় হল আপনার সঙ্গে ?

মুখুজ্জে মশাই আমার দিকে অসহায়ের মত চাইলেন।

বললেন, বিশ্বাস কর ভায়া আমার সঙ্গে বেনারসীর ছোটবেলা থেকে ভাব ছিল, সেই দু-তিন বছর বয়স থেকে। আমাদের এক গাঁয়ে বাড়ি কিনা, বেলডাঙ্গাতে—

মুখুজ্জে মশাই এইটুকু কথা বলতেই যেন হাঁপিয়ে পড়লেন।

তারপর বললেন, তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি ভায়া, কিন্তু বারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি জানতাম ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে, বেনারসী আমাকে খুবই ভালবাসত কিনা। আর আমিও ওকে ভালবাসতাম—সত্যি কথা বলতে কি।

বললাম, তারপর ?

—তারপর কী যে হল, ওরা ওদের এক মামার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে কলকাতায় গেল একটা যোগে, তারপর আর ফিরল না। গেল তো গেল। গরীব বিধবা মা, বাড়িটা ও ছিল ভাঙা—

—তারপর ?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, তা তোমার বয়স হয়েছে, তোমাকে বলতে আর লজ্জা নেই, প্রায় কুড়ি বছর পরে বেনারসীর সঙ্গে আবার হঠাৎ দেখা—

বললাম, কোথায় ?

—ওই ওরই ঘরে, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তখন ও থাকে, সেখানে গান শুনতে গিয়েছিলমে ওর, খুব ভালো ঠুংরি গাইতে পারত কিনা ও, তা আমি ওকে চিনতে পারলাম প্রথম। বললাম, বেনারসী না ?

মুখুজ্জে মশাই কোটের একটা হাতা দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

বললেন, সেই দিনই বামুন ডেকে ও আমায় বিয়ে করে ফেললে—

বললাম, তারপর ?

মুখুজ্জে মশাই বললে, এই পার্কের মিটিং দেখতে দেখতে তাই ভাবছিলাম, আইনও পাস হল তো সেই, কিন্তু আর কটা বছর আগে পাস হলে কী ক্ষতি হত !

এতক্ষণে যেন আমারও অনুপপুরের মুখুজ্জেগিন্নীর কথা মনে পড়ল।

বললাম, মুখুজ্জেগিন্নী এখন কোথায় ?

মুখুজ্জে মশাই তেমনি বলতে লাগলেন, তারপর থেকে ভায়া চাকরি নিয়ে যেখানেই গিয়েছি, সব জায়গাতেই একদিন-না-একদিন ধরা পড়ে গিয়েছি—কোথাও গিয়ে শান্তি পাই নি।

আবার বললাম, মুখুজ্জেগিন্নী এখন কোথায় ?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, মারা গেছে।

আমি চুপ করে রইলাম শুনে।

মুখুজ্জে মশাই বলতে লাগলেন, শেষ জীবনটা ভায়া বড়ই কষ্টে কেটেছে তার, মনের মধ্যে দগ্ধে দগ্ধে পুড়েছে, আর কেবল লুকিয়ে এসেছে, শেষের কদিন তো কথাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—

নায়ক-নায়িকা

রাস্তাটা বড়। রাস্তার এদিকে ছোট একটা মাটির বাড়ি। মাটির বাড়ি, টিনের চাল। দরজার ওপরে মাথার ওপর ছোট একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে—'দি গ্রেট্ হোমিও হল'। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় ঘরের ভেতরে পাঁচজনের বেশি লোক ধরে না।

রাস্তা দিয়ে তীর্থযাত্রীরা যেতে যেতে সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়লে হেসে ফেলত।

বলত, দেখ দেখ হে—'গ্রেট্ হোমিও হল' দেখ—

আলকাতরা মাখানো একটা দরজা। ঘরের ভেতরে ঢুকতে গেলে মাথা নিচু করতে হয়। চেহারা দেখে মনে হত একটা ঝড়ের ঝাপটা এলেই ঘরটার বুঝি আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না, একেবারে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। আর আরও ভিতরের দিকে যারা চাইত তারা হেসে গড়িয়ে পড়ত। রুগী নেই পত্র নেই—একটা কমবয়সী লোক রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকত। বোধ হয় রোগীর আশাতেই বসে থাকত।

আর ডাক্তারখানার উল্টো দিকে?

উল্টো দিকে মস্ত একটা বাড়ি। লাল ইঁটের মনোহারি বাড়িটা। বাড়িটার সদর দরজায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত দরোয়ান। আর এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত বাড়ির সবগুলো জানলা-দরজা সমস্ত দিন বন্ধ থাকত। নতুন বাড়ি। অন্তত: জানলা-দরজা ইঁট-কাট সমস্ত রঙ করা হয়েছিল নতুন করে। ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করত বাড়িখানা। আর মাঝে মাঝে একটা বিরাট মোটর এসে দাঁড়াত সামনে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খাটানো হয়ে যেত মোটর থেকে নামবার পথে। কে নামত, কে উঠত বোঝা যেত না। শুধু 'দি গ্রেট্ হোমিও হল'-এর ডাক্তার —ডাক্তার তিনকড়ি ভঞ্জ হাঁ করে চেয়ে থাকত সেই দিকে।

আসলে বড় রাস্তার এই বড় বাড়িটা নিয়েই আমার এই গল্প।

নির্মল লাহিড়ী বললেন, কই মশাই, এই তো গেল পুজোর সময় দেওঘর

গিয়েছিলাম আমি, আপনার ওই বড় বাড়িখানা দেখেছি বলে মনে পড়েছে বটে—কিন্তু ওই 'দি গ্রেট্ হোমিও হল' তো দেখি নি—বড় রাস্তার দুদিকেই তো শুধু দুটো বাড়ি আছে দেখেছি—

বললাম, একি আজকের কথা! তখন আমার বয়স কত আর, বারো কি চোদ্দ—বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম, আমিই বলে সেই 'গ্রেট্ হোমিও হল' দেখি নি তো আপনি দেখবেন কী করে? এ-সব আমার শোনা কথা! ওই টিনের চালের ডাক্তারখানাও দেখি নি, আর ওই দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটাও তখন ভেঙে নুয়ে পড়েছে—। আসলে ওই ডাক্তার তিনকড়ি ভঞ্জও আর তিনকড়ি ভঞ্জ নেই। সে চেহারাই বদলে গেছে তাঁর।

কয়েকজন বন্ধু মিলে গল্প হচ্ছিল বিকেল বেলা।

নির্মল লাহিড়ী বললেন, ছোটবেলায় কেবল ফাঁকি দিয়েছি ভাই, সুতরাং জীবনে কিছুই হল না—ভালো করে আড্ডাও যদি দিতুম তো একটা কাজের মত কাজ হত, আড্ডাবাজ হিসেবেও নাম হত, এখন না-ঘাট্‌কা না-ঘরকা—

চিত্ত সরকার বললেন, যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে তাই-ই তো হবে, এই দেখ না অদৃষ্টে ছিল বারোটা ছেলের বাপ হব, তাই হয়েছি—

সমীর দে বললেন, অদৃষ্ট-ফদৃষ্ট সব বাজে, আসলে পুরুষকার। পুরুষকারই হল সব—আইনস্টাইন বলেছেন···

চিত্ত সরকার বললেন, রাখ তোমার আইনস্টাইন, আইনস্টাইন তোমার এত বড় যুদ্ধটা আটকাতে পারলে?

সমীর দে বললেন, এই তোমাদের মত ফেটালিস্ট্ নিয়ে কারবার বলেই ইণ্ডিয়ার এত হয়রানি, নইলে আরও দু শো বছর আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত—এই বলে রাখলাম—

চিত্ত সরকার বললেন, এখন আর হয়েছে কী ভাই, সবে বিয়ে করেছ, বউটি এখনও নতুন, রক্তে তেজ আছে তোমার তাই পুরুষকার পুরুষকার বলে চেঁচাচ্ছ!

নির্মল লাহিড়ী বললেন, অদৃষ্ট-চক্র বলে চক্র! অদৃষ্ট-চক্রের চরকিতে পড়ে হাড়-মাস ভাজা-ভাজা হয়ে গেল ভাই, তাই তো কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই—

চিত্ত সরকার বললেন, সেটি পারবেন না দাদা, তা হলে আর অদৃষ্ট নাম হত না বেটার—

সমীর দে বললেন, তা হলে বলুন এই যে দালাইলামার ব্যাপারী—খেয়ে

মেয়ে রাজত্ব করছিল—হঠাৎ রাজ্যপাট ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় পালিয়ে আসতে হল, এ-ও অদৃষ্ট ?

চিত্ত সরকার বললেন, ওই তো মজা ভাই, যে অদৃষ্ট রাজা করায়, সেই অদৃষ্টই একদিন আবার ভিখারী বানিয়ে ছাড়ে—নইলে সাধে কি আর ঋষিরা বলেছেন—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র—

সমীর দে রেগে গিয়েছিলেন।

বললেন, তাহলে বলব international politics আপনারা ছাই বোঝেন—

আমি হঠাৎ বললাম, তর্ক থাক, তার চেয়ে আমি বরং একটা গল্প বলি—

নির্মল লাহিড়ী বললেন, তাই বলুন, উঃ। এতক্ষণ প্রায় জমে যাবার যোগাড় হচ্ছিলাম—

চিত্ত সরকার বললেন, আড্ডা চলছিল, বেশ চলছিল, সমীরটা তর্ক তুলেই মাটি করে দিলে—

সমীর দে বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, থাম তুমি সমীর—তর্ককে আমি বড় ভয় করি। বিশ্ব-সংসারে তর্ক করে কেউ জিতেছে এমন নজির আমি তো পাই নি। তর্ক থামাবার জন্যেই আমি গল্প আরম্ভ করলাম। কারণ গল্প হল তর্কের যম।

আমার বাবা ছিলেন নামকরা কবিরাজ। সেকালে দক্ষিণ কলকাতায় আমার বাবার মত নাম-ডাক আর কার ছিল জানা নেই। রাজা-রাজড়া এটর্নী ব্যারিস্টার থেকে শুরু করে অফিসের কেরানী পর্যন্ত অনেক ছিল তাঁর ক্লায়েন্ট্। মাঝে মাঝে কাশী, পাটনা, পুরী, আসামের চা-বাগানের থেকেও কয়েকবার ডাক আসত। বাবার সঙ্গে ইস্কুলের ছুটি থাকলে আমিও যেতাম। এইরকম করে অনেক দেশই আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছিল একে একে।

তা সেবার দেওঘর বদ্যিনাথ থেকে ডাক এল।

কলকাতার বড় ব্যারিস্টার কিরণ চৌধুরী সেবার দেওঘরে হাওয়া-বদল করতে গিয়েছিলেন। কিরণ চৌধুরী বাবার বহুদিনের পেসেন্ট্। সকাল বেলাই 'তার' এল। কিরণ চৌধুরীর সিরিয়স অসুখ, 'তার' পাওয়া মাত্র যেন কবিরাজ মশাই দেওঘর চলে আসেন।

আমার ইস্কুলের তখন ছুটি চলছিল।

কয়েকটা ওষুধপত্র তৈরি করিয়ে নিয়ে বাবা আর আমি দেওঘর রওনা হলাম।

কয়েকদিন বেশ কাটল দেওঘরে। বাবা তো প্রথম কদিন রুগী নিয়েই ব্যস্ত। সাহেবী কেতা-দুরস্ত মানুষ কিরণ চৌধুরী। দেওঘরে গিয়েও সাহেবিয়ানা বজায় রেখেছেন। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর ডিনারের ঠেলায় যখন প্রায় আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় তখন কিরণ চৌধুরী একটু ভালর দিকে মোড় ঘুরলেন।

বাবা বললেন, এবার আমি তাহলে আসি চৌধুরী সাহেব, এবার আর ভয় নেই—

চৌধুরী সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন—আর একটা সপ্তাহ থেকে যান কবিরাজ মশাই, সম্পূর্ণ সেরে উঠলে তবে আপনি যাবেন—

বাবার অবশ্য খুব ক্ষতি হচ্ছিল না। সপ্তাহে হাজার টাকা দর্শনী আর তা ছাড়া খাওয়া থাকা ওষুধের দাম। তার ওপর কলকাতা থেকে দেওঘর আসা যাওয়ার ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনের ভাড়া।

কিন্তু বাবা বললেন, থাকতে তো পারি কিন্তু এ সপ্তাহে আমার খাওয়ার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে, আপনার ওই ডিনার লাঞ্চ আর চলবে না—

চৌধুরী সাহেব বললেন, তা যা আপনার সুবিধে বলুন, সেই ব্যবস্থাই হবে—

বাবা বললেন, আমাদের জন্যে ও-সব স্টু, স্যুপ, চলবে না—ও-সব বাদ দিয়ে শুকতুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝিঙেপোস্ত, থোড়-ছেঁচ্‌কি—এই সব করতে হবে এখন থেকে—

চৌধুরী সাহেব বললেন, তা তাই-ই হবে—

কিরণ চৌধুরী বাইরে খাঁটি সাহেব হ'লেও অন্তরে-অন্তরে ছিলেন বাঙালী। বোধ হয় চৌধুরী-গিন্নীর পাল্লাতে পড়েই অত সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী হয়েছিলেন। নইলে অত সাহেব হলেও অসুখের সময়ে এ্যালোপ্যাথ না ডেকে কেন কবিরাজ ডাকলেন ?

তা পরদিন থেকে সেই ব্যবস্থাই বহাল হল। আমরা আরও এক সপ্তাহ রইলাম দেওঘরে। আমরা বাপ-বেটায় সকাল বেলায় বেড়াতে বেরোই, দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করি, তারপর সন্ধ্যাবেলা আবার বেড়াতে বেরোই। তখন চৌধুরী সাহেবও ভাল হয়ে আসছেন ক্রমে ক্রমে।

ঠিক যেদিন চলে আসব তার আগের দিন ঘটনাটা ঘটল।

সেই ঘটনাটাই আমার গল্পের বিষয়বস্তু।

তোমরা এতক্ষণ পুরুষকার-দৈব নানারকম কথা আলোচনা করছিলে। আমি চুপ করে শুনেছিলাম। বইতে কেউ তো সত্যি কথা লেখে না। বই

পড়লে আসল মতামতটা পাওয়া দূরে থাক জিনিসটা আরও গুলিয়ে যায়। নেপোলিয়ন শুনেছি নিজে নাকি ভগবান মানতেন না। কিন্তু তিনি চাইতেন প্রজারা ভগবান মানুক—তাতে তাঁর সুবিধে। দুর্ভিক্ষের সময় তাহলে ভগবান ছেড়ে রাজার ঘাড়ে আর কেউ দোষ চাপাবে না। যদি বল ভগবান আর ভাগ্য, ও-দুটো কি এক কথা? আমি বলব এক না হোক আলাদা নয়।…

নির্মল লাহিড়ী বললেন, আবার তত্ত্ব নিয়ে কেন কচকচি করছেন—গল্পটা বলুন—

বললাম, গল্প বলছি, তবু তত্ত্বটা একটু না বললে গল্পকে নেহাত আষাঢ়ে গল্প বলেই তোমরা উড়িয়ে দেবে—গল্পের সঙ্গে তত্ত্বের একটু পাঞ্চ্ না করলে তোমরাই বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নেবে কেন?

সমীর দে এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এবার আর থাকতে পারলেন না।

বললেন, আপনার গল্প কি দৈবকে support করে? তাহলে কিন্তু আমি উঠলাম।

চিত্ত সরকার বললেন, গল্প তোমার একার জন্যে নয় হে, আমরাও আছি, আমরাও গল্প শুনতে ভালবাসি, আর তাছাড়া গল্প কি জ্যামিতির থিয়োরেম যে কিছু প্রমাণ করতেই হবে?

সমীর হয়ত উত্তরে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, সমীর ভাল রকমই জানে যে গল্প আর থিয়োরেম আলাদা জিনিস, সুতরাং আর তর্ক কোর না তোমরা—। এখন থেকে পাঁচশো বছর আগে এর প্রমাণ দেওয়া হয়ে গেছে। পাঁচশো বছর আগেই মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষ পাপগ্রস্ত জীব নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র সাধনা নয়। মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নিরক্ষরতা, অত্যাচার আর দুর্নীতি এগুলো দৈবের অমোঘ বিধান নয়।

নির্মল লাহিড়ী হঠাৎ বললেন, আপনি কি গল্প শোনাবার নাম করে আমাদের রেনেসাঁস্ শেখাচ্ছেন?

বললাম, না, গল্পের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে বলেই বলছি—

চিত্ত সরকার বললেন, না না, আমরা গল্প শুনতে চাই, তত্ত্ব শুনতে থ চাই নে—গল্প আরম্ভ করে দিন আপনার—

বললাম, গল্পটা মুখে বলছি বলেই তত্ত্বটা একটু খুলে বলছি, নইলে লিখে বলতে গেলে আর বলতাম না এ-রকম। গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত—।

যা হোক সেই পাঁচশো বছর আগে যে রেনেসাঁস-এর আবির্ভাব হল তার ফলে চার্চের একচ্ছত্র শাসনে ফাটল ধরল, দিকে দিকে মানুষ বেরিয়ে পড়ল নতুন দেশ আবিষ্কারের উন্মাদনায়, আর তার প্রভাব ছড়িয়ে গেল আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় আফ্রিকায়···আর তারই ফলে হল লিবারেলিজম্।

চিত্ত সরকার বললেন, এসব আপনি কী বলছেন দাদা? লিবারেলিজম্ রেনেসাঁস—ও-সব কথা কে শুনতে চাইছে?

সমীর দে বললেন, আপনি আগে বলুন আজকের আলোচনার সঙ্গে আপনার গল্পের যোগাযোগ কী?

নির্মল লাহিড়ী বললেন, গল্প এখনও আরম্ভই হল না, এরই মধ্যে তুমি গল্পের যোগাযোগ খুঁজতে বসলে?

সমীর দে বললেন, কিন্তু গল্পটা নিয়ে তা জিজ্ঞেস করবার অধিকার তো আছে আমাদের?

বললাম, না, সে অধিকার তোমাদের নেই। কেন নেই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তার দরকার নেই। তার চেয়ে বলে রাখি আমার এ গল্প প্রেম নিয়ে।

সমীর বললেন, এঃ, আবার সেই প্রেম?

বললাম, হ্যাঁ, প্রেমের মত এত রস্তা-পচা পুরনো জিনিসও আর নেই, আবার এত আনকোরা নতুন জিনিসও আর নেই সংসারে! এ যেন ঠিক পৃথিবীর মত, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোজ নতুন হওয়া, অথচ এত বড় পুরনো জিনিস তো আর কিছু নেই।

খানিক থেমে আবার বলতে লাগলাম, প্রেম কখনও পুরনো হয় না। প্রেম কি সবাই পায়? যে পেয়েছে সে-ই কেবল তার মজাটা জানে। প্রেম কাছেও টানে, দূরেও ঠেলে—কিন্তু কখনও বঞ্চিত করে না। প্রেম নিয়ে বৈষ্ণব কবিরা হাজার হাজার পদাবলী লিখে গেছেন, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল! বোঝ ঠেলাটা! আমরা তো স্ত্রীর কাছে তিন ঘণ্টা একসঙ্গে থাকলে পালাই-পালাই করি আর লাখ লাখ যুগের কথা তো ভাবতেই ভয় পাই! তাহলেই বুঝতে পারছ যাকে আমরা প্রেম বলছি সেটা আসল প্রেম নয়—প্রেম আলাদা জিনিস।

তাহলে তোমরা শোন, গোড়া থেকেই বলি!

ব্যারিস্টার কিরণ চৌধুরী তো সেরে উঠেছেন ভাল করে। পরের দিন আমরা চলে যাব। তার আগের দিন বিকেল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছি।

দেওঘরের সব ক'টা দ্রষ্টব্য জিনিস ততদিন প্রায় দেখা শেষ করে ফেলেছি। রাস্তার ধার দিয়ে বাবার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। দেওঘরের রাস্তা, বুঝতেই পারছ, সে রাস্তার কোনও বালাই নেই কোথাও। এবড়ো-খেবড়ো খোয়া-ওঠা রাস্তা। আশে পাশে একটা দোকান কিম্বা বাড়ি। কাজ তখন বাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সুতরাং উদ্বেগও ছিল না মনে। এমনি গল্প করতে করতে চলেছি দুজনে।

বাবা বললেন, যাক্ দেওঘরটা এই সূত্রে তোমার দেখা হয়ে গেল।

আমি বললাম, ঠিক ভাল করে দেখা হল না বাবা।

বাবা বললেন, এর থেকে আর ভাল করে দেখা কাকে বলে!

বললাম, এখানকার কোনও লোকের সঙ্গে তো আলাপ হল না—এখানেও তো অনেক লোক আছে, যারা চিরকাল বাস করছে এখানে, বহুদিন ধরে।

এমনি কথা বলতে বলতেই যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ পাশের একটা বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক বাইরে এসে ডাকলেন, কবিরাজমশাই, আসুন, আসুন—

বাবার অচেনা লোক।

ভদ্রলোক বললেন, আমাকে ঠিক চিনবেন না আপনি, আমার বাড়ি এটা, আমি আজ তিরিশ বছর ধরে এখানে বাস করছি—তাতে কি, আসুন ভেতরে।

ভেতরে ঢুকলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম তিনকড়ি ভঞ্জ, আমি অবশ্য বাংলা দেশের লোক, কলকাতাতেই আমাদের আদিবাড়ি, ভবানীপুরে, এখন এখানেই থাকি।

তারপর বাবার দিকে গড়গড়ার নলটা দিয়ে বললেন, আসুন—তামাক ইচ্ছে করুন।

বাবা বললেন, থাক্ থাক্, আমি তামাক খাই নে।

ভদ্রলোক বললেন তাহলে পান খান, কিছু না খেলে আপ্যায়িত করি কী করে।

বলে চাকরকে ডেকে ভেতর থেকে পান আনিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক বললেন, শুনেছি চৌধুরী সাহেবের চিকিৎসা করতে আপনি এসেছেন।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, এখন একটু সেরে উঠেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ তা-ও শুনেছি, প্রথমে যখন অসুখটা হল ওঁর আমাকেও কল্ দিয়েছিলেন।

বাবা বললেন, আপনিও ডাক্তার বুঝি ?

তিনকড়িবাবু বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি এখন আর ডাক্তারী করি না।

—তার মানে ?

—মানে ডাক্তারী বলতে গেলে আমি একবারই করেছি, একটিমাত্র রুগীই সারিয়েছি জীবনে, সেই একবার ডাক্তারী করেই এই যা-কিছু দেখছেন সব। এই তিনতলা বাড়ি, এই পেছনে সাত বিঘে জমি, আমার চাকর-বাকর যা কিছু দেখছেন, সব। এখনও আমার চাল, ডাল, তরি-তরকারি ঘি-তেল কিছুই কিনে খেতে হয় না—

—সে কী!

বাবা আর আমি দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম।

তিনকড়িবাবু বললেন, পাস-টাস তো করি নি মশাই, শুধু একখানা বাংলা হোমিওপ্যাথির বই পড়েছিলাম জীবনে, তাতে এর বেশি আর কী হবে! যথেষ্ট হয়েছে আমার, ক'জন ডাক্তার একটা রুগী সারিয়ে এত বড় বাড়ি, সাত বিঘে জমি আর সারা জীবনের আশ্রয় করতে পারে আমার মতন, বলুন ?

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আর ডাক্তারী করলেন না কেন ?

তিনকড়িবাবু বললেন, করতে তো ইচ্ছে ছিল মশাই, রুগীও আসত অনেক, আমার যখন নাম হয়ে গেল খুব, তখন একজন-দু'জন করে করে অনেক রুগী আসতে লাগল আমার বাড়িতে। আমিও বই খুঁজে খুঁজে ওষুধ দিতে লাগলাম, কিন্তু সারল না একটাও।

বলে ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন।

বললেন, চা খাবেন নাকি! চা নিজে খাই না কিনা, তাই জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেছি।

বাবা বললেন, না না, ও-সব হাঙ্গামা করবেন না আর, তা ছাড়া আমিও চা খাই না, আমার ছেলেও চা খায় না।

তিনকড়িবাবু বললেন, ও না খাওয়াই ভাল কবিরাজ মশাই, আপনার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কী বলে তা জানি না, আর আমাদের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে কী বলে তা-ও জানি না, তবে এইটুকু জানি যে জিনিসটা খারাপ।

বাবা বললেন, ও-সব কথা থাক, আপনার গল্পটা বলুন—যাক এসেছিলাম এখানে তাই আলাপ হল। কত বাঙালী কত দেশে ছড়িয়ে আছে, সবাই

আপনার জনের মতন, তা ছাড়া ভবানীপুরে তো আমারও বাস, সেখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল না, হল কিনা, এখানে এসে।

তিনকড়িবাবু বললেন, ভবানীপুরে বাস ছিল বটে, কিন্তু এই তিরিশ বছরের মধ্যে ভবানীপুরে আর যাওয়াই হয় নি, আর সেখানে কেউ থাকলে তো যাব! যাঁরা আছেন তাঁরা গেলে হয়ত খাতির-যত্ন করবেন, কিন্তু যেতে আর মন চায় না—

—ভবানীপুরে কোন্ পাড়ায় আপনাদের বাড়ি?

তিনকড়িবাবু বললেন, চাউলপটি চেনেন নিশ্চয়, এখনও রাজকমল ভঞ্জের বংশ বললে ওখানকার দু'একজন বুড়ো মানুষ চিনিয়ে দিতেও পারে। কিন্তু শুনেছি আজকাল চাউলপটির চেহারাই নাকি বদলে গেছে। আর বদলে যাবেই না বা কেন বলুন! দেওঘরেরই কি কম বদলেছে এই তিরিশ বছরে! আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, এ রাস্তায় একটা আলো ছিল না, জানেন? ওই যে একটা বাড়ি দেখছেন, তিনতলা, ওইখানে মাঠ ছিল, ছেলেরা ফুটবল খেলত এখানে—ওর সামনেই একটা তেলের আলো জ্বলত টিম্ টিম্ করে—আর এই সারা রাস্তাটা ছিল ঘুরঘুট্টি অন্ধকার! আর এই যে আমার বাড়িটা দেখছেন, এখানেও কিছু ছিল না, একটা বস্তি ছিল। কয়েকটা কুঁড়েঘর, আমি যখন প্রথম আসি এখানে, তখন এই একখানা কুঁড়েঘরে এক টাকা মাসিক ভাড়া দিয়ে ডিস্‌পেনসারি খুলেছিলাম।

—ডিস্‌পেনসারি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ কবিরাজ মশাই, আমার হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারি শুধু নামেই, ভেতরে ছিল না কিছুই। আমি একটা ভাঙা টেবিল আর একখানা ভাঙা চেয়ার কিনেছিলাম বাজার থেকে। একজোড়া তিন টাকায়। তাই-ই তখন আমার দেবার সামর্থ্য ছিল না। এক টাকা মাসিক ঘর-ভাড়া, তাই-ই তখন কেমন করে দেব ভেবে ভয় পেতাম! দেব কেমন করে? রুগী তো একটা আসে না। আর চিকিৎসারই বা আমি কি জানি ছাই যে রুগী আসবে আমার কাছে?

বাবা বললেন, তা এত জায়গা থাকতে এই দেওঘরেই বা এসেছিলেন কেন আপনি? চিকিৎসা করতে?

তিনকড়িবাবু বললেন, আসলে চিকিৎসা করাটা ছিল আমার একটা ছুতো। ভেবেছিলাম, বাবা বৈদ্যনাথের চরণে এসে পড়লে একটা-না-একটা কিছু জুটে যাবেই। এই যেমন আপনি এসেছেন চৌধুরী সাহেবের চিকিৎসা করতে, এ-রকম আসা তো আমার নয়—আমি, বলতে গেলে একরকম

পালিয়েই এসেছিলাম—বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মীয়স্বজনের ওপর অভিমান করে। যেদিন এসেছিলাম, মনে আছে সঙ্গে ছিল কেবল আমার স্ত্রী আর সাঁইত্রিশটি টাকা সম্বল।

তারপর একটু থেমে বললেন, তবে আপনাকে সমস্ত গোড়া থেকেই বলি শুনুন, আপনার হাতে এখন কোনও কাজ নেই তো?

বাবা বললেন, না না, আপনি বলুন।

মনে আছে তিনকড়িবাবুর গল্প শুনতে শুনতে ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিদিকে। দেওঘরের সেই রাত্রিটায় আসবাবপত্রের মধ্যিখানে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে বসে যেন এক আরব্য উপন্যাস শুনলাম সেদিন। আমি তখন ছোট, সঙ্গে বাবা রয়েছেন। সব বিষয়ে নিজে কোনও প্রশ্ন করছি না। একজন বৃদ্ধ লোক, ষাট বছরের বৃদ্ধ, নিজের জীবনের কাহিনী শোনাচ্ছেন। কাহিনী শুনতে শুনতে আমিও যেন সেই চাউলপটির পুরোন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে একজন দর্শকে পরিণত হয়েছি।

সে এক অদ্ভুত সময়। তখন একজোড়া জুতোর দাম তিন টাকা। এক টাকায় একটা শার্ট। সস্তাগণ্ডার দিন। চাউলপটির ইস্কুলে পড়তে পড়তে একদিন নাম কাটা গেল।

দাদা একদিন বড়বাজারে একটা দোকানে ঢুকিয়ে দিলে। সাত টাকা মাইনে। সোজা হেঁটে যেতে হবে ভবানীপুর থেকে একেবারে বড়বাজার পর্যন্ত।

গদিবাড়িতে গিয়ে ন'টার সময় হাজরে দিতে হয়। চটি ফটাস্ ফটাস্ করতে করতে গিয়ে হাজির হতাম সেই গদিতে। দর্মাহাটার তিন নম্বর বাড়ির একতলায় ছিল একটা খাবারের দোকান। দহিবড়া, জিলেবি, ফুচকা এই সব।

দাদা বললে, এখেনে লেগে থাক্, কাজ-টাজ শিখে নিলে একটা দোকান করে দেব তোকে।

তিনকড়িবাবু বললেন, প্রথম প্রথম বেশ লেগে থাকলাম মশাই, বেশ কাজ করতে লাগলাম। কেমন করে খাতা রাখতে হয়, কেমন করে হিসেবের গরমিল ধরতে হয়, কত মালে কত নাফা, কত আয় হলে কত খরচ করা উচিত, কী দামে মাল কিনে কী দামে বেচা উচিত—এইসব শিখতে লাগলাম, দেখতে লাগলাম।

ঘনশ্যামবাবু ছিল মালিক। গদিবাড়ির মালিক।

বলত, এ বাঙালীবাবু—

ঘনশ্যামবাবু আমাকে বাঙালীবাবু বলে ডাকত। লোকটি ভাল। বয়স হয়েছে। পশ্চিমের কোন দেশ থেকে এসে পৈতৃক ব্যবসাতে ঢুকে পড়েছিল। নানা রকম ব্যবসা ছিল ঘনশ্যামবাবুর। ঘি-এর ব্যবসা, গামছার ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা। যা ধরত তাতেই লাভ হত। এই রকম দশটা গদি ছিল বড়বাজারে। ঘনশ্যামবাবু টেলিফোন নিয়ে বসে থাকত সারাদিন আর হুকুম করত একে ওকে। আমি সাত টাকা মাইনের চাকর। বেশি ক্ষমতা ছিল না আমার। দূর থেকে দেখতাম ঘনশ্যামবাবু টেলিফোনে কাকে বকছে আর আমার প্রাণ দুর-দুর করত। যদি আমাকে বকে কোনও দিন ওই রকম করে!

ঘনশ্যামবাবু গদিতে থাকত অনেক বেলা পর্যন্ত। এক-একদিন সাতটা-আটটা পর্যন্ত। তার জন্যে আমরাও বসে থাকতাম দেরি করে। কাজ করতাম।

দাদা চাকরি করত সওদাগরী অফিসে। অফিস থেকে রাত্রে বাড়িতে ফিরে আমাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ করত।

বলত, এত দেরি যে তোমার?

বলতাম, ঘনশ্যামবাবু আজ অনেক রাত্তিরে বাড়ি গেলেন।

দাদা বলত, গদি থেকে আর কোথাও যাবে না, সোজা বাড়ি চলে আসবে।

সাত টাকাতেই আরম্ভ করেছিলাম চাকরি। ঠিক ছিল দু'এক মাস কাজ করলে মাইনে বেড়ে দশ টাকা হবে। তাই বড় মন দিয়ে কাজ করতাম। আমার কোনও দিকে নজর ছিল না। আমাদের বয়সের ছেলেদের কত দিকে আকর্ষণ ছিল তখন। ভাবতাম সংসারে যার দাদা ছাড়া আর কেউ নেই তার পক্ষে কোনও বিলাসিতাই শোভন নয়। না খেলা, না বেড়ানো, না পড়াশুনা। পড়াশুনোও যেন আমার কাছে বিলাসিতা। সকাল বেলা হাঁটতে হাঁটতে যেতাম সেই বড়বাজারে। সেখানে গিয়ে নিজের ডেস্কের সামনে বসে খাতা লিখতাম এক মনে।

সংসারে কেই বা ভালবাসত আমাকে দাদা ছাড়া!

বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই। একদিন আমারও বিয়ের সম্বন্ধ এল।

দাদা বললেন, তোমার তো ভাবনার দরকার নেই—যা বলছি কর।

আমি একটু ইতস্ততঃ করেছিলাম মনে আছে।

দাদা বললে, আমি যখন রয়েছি, তোমার ভাবনা কী! তুমি যেমন চাকরি করছ করে যাও, আমি তো মরি নি।

মনে আছে ঘনশ্যামবাবুর কাছে গিয়ে ছুটি চাইতেই বললেন, সাদি? সাদির শখ হয়েছে?

বললাম, দাদা খুব পীড়াপীড়ি করছে, তাই···

—কত দিনের ছুটি ?

বললাম, তিন দিন, তিন দিন হলেই চলবে আমার।

ঘনশ্যামবাবু লোক ভাল। হেডমুন্সী ছিল পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীকে বলে আমার তিন দিনের ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন। বিয়ের নামে অন্য সকলের আনন্দ হয় শুনেছি, কিন্তু আমার যেন কেমন আতঙ্ক হল মশাই। সে কতকাল আগের কথা। প্রথম যৌবনের কথা সব। তখনকার দিনে আনন্দ হলেই স্বাভাবিক হত। একটু রোমাঞ্চ কি একটু উত্তেজনা। কিন্তু আমার সে-সব কিছুই হয় নি মনে আছে। আমার কেবল মনে হয়েছিল দাদার ঘাড়ে আরও বুঝি বোঝা চাপানো। কেমন করে সংসার চলবে। কেমন করে এতগুলো মুখের অন্ন যোগাবে দাদা। দাদা ছিল আমার দেবতুল্য লোক। সংসারের সমস্ত বোঝাটা নিজের মাথায় চাপিয়ে যেন আনন্দ পেত দাদা। আর বউদি ? বউদির নিজের বলতে কিছুই ছিল না। দাদার কথাতেই সব চলত। সংসারে এমন এক-একজন মানুষ নিশ্চয় দেখেছেন আপনি যে সকলের সব দায়িত্বের সব চাপটা নিজের মাথায় নিয়ে নিশ্চিন্তে চালিয়ে যায়, অন্য লোককে বুঝতে দেয় না কিছু, আমার, দাদা ঠিক সেই প্রকৃতির মানুষ ছিল। দাদার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছিল। তাদের ভাবনাও আছে। তাদের চাকরি, তাদের বিয়ের ভাবনাও আছে। বিধবা বোন ছিল একজন। তখনও দু'বোনের বিয়ে দিতে হবে দাদাকে। তা সত্ত্বেও আমার বিয়ের জন্যে দাদা যে কেন অত পীড়াপিড়ি করেছিল কে জানে।

দাদা সব কথাতেই বলত, তোমরা অত ভাবছ কেন, আমি তো আছি।

দাদা যে আছে তা তো আমরা জানতাম। কিন্তু দাদার সামর্থ্যও তো আমরা জানতাম। তাই সবাই আমরা দাদার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকলেও দাদার মুখের হাসি কখনও থেমে যেতে দেখি নি।

সকাল থেকে সমস্ত সংসারটা দিদি বউদি মিলে যেভাবে চালিয়ে যেত দেখে আমারও কেমন মায়া হত। আমি মাইনেটা এনে দাদার হাতে তুলে দিতাম। দাদা সেই ক'টা টাকা নিয়ে একটা টাকা আমার হাতে দিত।

বলত, তোমার খরচা-পত্তরের জন্যে রাখ এটা।

তা আমার যেন কেমন লজ্জা করত মশাই। মাত্র তো ওই ক'টা টাকা মাইনে! তার মধ্যে দাদাকেই বা ক'টা টাকা দেব, আর চলবেই বা সমস্ত কী করে। হঠাৎ যদি দাদার একটা কিছু ভাল-মন্দ হয় তখন করব কী আমরা,

থাকব কোথায়, খাব কী? রাস্তায় চলতে চলতে অনেক দিন এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি। কতদিন গাড়িচাপা পড়বার মত হয়েছে। কোথায় সেই চাউলপটি, আর কোথায় বড়বাজার! জুতোটা ছিঁড়ে গেলেও পয়সার জন্যে দাদার কাছে হাত পাততে লজ্জা করত। ছাতির অভাবে অনেকদিন বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে উঠেছি। তারপর ভিজে জামা-কাপড় আবার গায়েই শুকিয়ে গেছে। কাউকেই মুখ ফুটে কিছু বলি নি। বলতে আমার লজ্জা করত।

বাড়িতে নতুন যে মানুষটা এল সেও আমারই মতন। আমারই মতন লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে থাকত সারাদিন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলে নিজেকেও যেন সে বড় লুকিয়ে রাখতে চাইত। সংসারের কাজের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইত। আমি যখন অফিস থেকে আসতাম, তখন বাড়িতে ঢুকেই প্রথম আমার দাদার সঙ্গে দেখা করে তবে ঢুকতাম নিজের ঘরে। একদিন আমাদের বংশের নাম জানত সবাই, সে কথাটা যেন ভুলে থাকতে চাইতাম।

দাদা বলত, আজ কী খবর? ঘনশ্যামবাবু ভাল আছেন তো?

বলতাম, হ্যাঁ—

যেন ঘনশ্যামবাবুর ভাল থাকা-থাকির ওপরেই আমার আর আমাদের ভাল থাকা নির্ভর করছে। যেন ঘনশ্যামবাবুই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। আর ভাগ্য-বিধাতা নয়ই বলি কেন! ঘনশ্যামবাবুর অসুখ হলেই সারা গদি-বাড়ির লোকজনের টনক নড়ে উঠত। আমারও ভাবনা হত। এক ঘনশ্যামবাবুর জন্যে এতগুলো লোকের সংসার চলছে, এতগুলো পরমায়ু টিঁকে আছে। ঘনশ্যামবাবুই তো সব। ঘনশ্যামবাবুর এককণা কৃপাদৃষ্টি পেলেই তো আমাদের যে-কোনও জন ধন্য হয়ে যেতাম।

আমার স্ত্রীও বুঝত সব মশাই। গদিবাড়িতে যদি কোন দিন হেড-মুন্সীর কাছে বকুনি খেয়ে মনটা বিরস হয়ে থাকত তো আমার স্ত্রী টের পেত সব। সেদিন কিছু জিজ্ঞেস করত না, চুপ করে শুধু আমার দিকে চেয়ে দেখত, চুপচাপ পাখাটা নিয়ে বাতাস করত।

বলত, তুমি ঘুমোও, আমি হাওয়া করছি তোমাকে।

বলতাম, আমাকে হাওয়া করতে হবে না, তুমি ঘুমোও।

গরমের চোটে ঘুমই কি আসত আমার। জোরে জোরে পাখা চালালেও ঘুম আসত না। কেবল ভাবতাম জীবনে কী হল! কী-ই বা আমার জীবনের

দাম। সংসারে সচ্ছলতার জন্যে কতটুকু আমি করতে পারি। কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা।

আমার স্ত্রী আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করত, তুমি অত ভাব কেন, আমি তো বেশ সুখেই আছি।

দাদাও বলত, যাক, তোমার চাকরিটা হল, বাঁচলাম, আর আমার কোনও ভাবনা নেই।

সত্যি যত ভাবনা যেন সব আমার। কেমন করে বড় হব, কেমন করে দশজনের একজন হব, দাদার মুখোজ্জ্বল করব তাই-ই ছিল আমার দিন-রাত্রের চিন্তা। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ওই রকম একটা বাড়ি হলে খুব সুখ হবে মনে হত। ও-সব বাড়ির ভেতরে যারা থাকে তারা কত সুখী। ভেতরে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলত আর আমার মনের সব আলোগুলো যেন নিভে আসত। সকলের চেয়ে আমরা গরীব। আমার বোনের ময়লা শাড়ি, দাদার রোগা শরীর, স্ত্রীর নিরাভরণ চেহারা সব যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত।

গদিবাড়িতেও আমার কাজের অন্ত ছিল না। সেখানে গিয়ে কাজের চাপে কিন্তু সব ভুলে যেতাম। চালান্, ইন্‌ভয়েস, পার্শেল, অর্ডার, মুনাফা, হিসেব—সব কিছুরই মধ্যে তলিয়ে যেতাম একেবারে।

ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়িতে বাঙালী বলতে মাত্র আমিই একজন।

হেডমুন্সী বলত, লোকে বলে বাঙালীবাবুদের বুদ্ধি খুব সাফ্!

ওপাশ থেকে তিলকচাঁদ বলত, বাঙালীবাবুরা যে মছ্‌লি খায় পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করত, আজ মছ্‌লি খেয়েছ বাঙালীবাবু?

চতুরাননজী বলত, বাঙালীবাবুরা রোজ মছ্‌লি খায়—দিনে ভি খায়, রাতে ভি খায়।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করত, ব্রাহ্মণরা ভি মছ্‌লি খায় বাঙালী বাবু?

আমি ততক্ষণ সব কথা শুনছিলাম। পণ্ডিতজীর প্রশ্নটা কানে যেতেই মুখ তুলে বললাম, বাঙালীদের সবাই মছ্‌লি খায় মুন্সিজী। ব্রাহ্মণরাও খায়।

পণ্ডিতজী কথাটা শুনেই 'ছিয়া' 'ছিয়া' করে উঠলেন।

বললাম, এতদিন বাংলা দেশে আছেন, আপনি তা জানতেন না?

তিলকচাঁদ কাজ করতে করতে মাথা উঁচু করে বললে, বাঙালী ব্রাহ্মণদের জাত নেই মুন্সীজী—তারা গোস্ ভি খায়—মুর্গীর গোস্।

চতুরাননজী বললে, মুর্গার গোস্ হাঁসকা গোস্ পঞ্ছিকা গোস্—সব খায় বাঙালী ব্রাহ্মণরা।

পণ্ডিতজী বলত, বাঙালী লোক বড় নোংরা আছে তো!

আমি বিশেষ প্রতিবাদ করতাম না এ-সব কথার।

শুধু মাঝে মাঝে বলতাম, বড় বড় আদমি পয়দা করেছে তো বাংলা দেশ—স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ওরা কিছু বুঝতে পারত না নাম শুনে।

জিজ্ঞেস করত, কারা ওরা? শেঠজী? কীসের কারবার?

বলতাম, কারবার করতেন না পণ্ডিতজী, এমনি বড় লোক ছিলেন সব, মছলির দেশেই জন্মেছিলেন একদিন।

আমার কথা শুনে তিলকচাঁদ চতুরাননজী ওরা খুব হো হো করে হেসে উঠত।

কিন্তু আসলে পণ্ডিতজী মনে মনে ভালও বাসতেন আমাকে। আমাকে যেমন বিশ্বাস করতেন এমন আর কাউকে করতেন না।

আড়ালে আমাকে বলতেন, বাঙালীবাবু মন দিয়ে কাজ শিখে নাও, তোমার তন্‌খা আমি শেঠজীকে বলে বাড়িয়ে দেব।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলতাম, সাত টাকা মাইনেয় আমার কুলোয় না মুন্সীজী! বউ আছে, অবিবাহিতা বোন আছে দু'টো, দাদার ঘাড়েই বসে বসে খাচ্ছি বলে—

আমার কাঁদো-কাঁদো ভাব দেখে ধমকে দিত।

বলত, রোতা হ্যায় কেঁও—কাঁদছ কেন? কাম করো, শেঠজী খুশী হলেই তন্‌খা বাড়িয়ে দিতে বলব আমি।

কিন্তু ঘনশ্যামবাবু ছিলেন আমার নাগালের বাইরে। তাঁর কাছ পর্যন্ত প্রথম প্রথম পৌঁছতেই পারতাম না। বিরাট এক মোটা গদির ওপর বাবু হয়ে বসে থাকতেন ঘনশ্যামবাবু তাঁর নিজের ঘেরা ঘরে। চারদিকে মোটা মোটা খেরো-বাঁধানো খাতার পাহাড়। দু-দুটো টেলিফোন। দিনরাতই টেলিফোন দু'টো বেজে চলেছে। মাঝে মাঝে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসতেন। তার পরেই আবার টেলিফোন বেজে উঠত। সেই সেখানে বসে বসেই লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকার লেন-দেন করতেন ঘনশ্যামবাবু। ঘনশ্যামবাবুর লোক সমস্ত কলকাতাময় ঘুরে বেড়াত। কেউ যেত গঙ্গার জেটিতে, কেউ রেলের মালগুদামে, কেউ শেয়ার মার্কেটে। সব জায়গা থেকে

টেলিফোন আসত। আর ঘনশ্যামবাবু গদিতে বসে বসেই নির্দেশ দিতেন, ধমকাতেন। রেলের বাবুরা মাল ছাড়ছে না তো পান খেতে দাও, গঙ্গার জেটিতে পুলিস মোষের গাড়ি আটকে দিয়েছে তো পুলিসের হাতে কিছু দাও। টাকা ফেললে সবাই জব্দ। সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে আঙুল বেঁকাও!

ঘনশ্যামবাবু বলতেন, দুনিয়া তো রূপেয়াসে চলে—রূপেয়া ছড়াও, সব কাজ হাঁসিল।

এক-একদিন দেখতাম আমরা যাবার আগেই ঘনশ্যামবাবু গদিবাড়িতে এসে গেছেন। সব থম্ থম্ করছে। লোকজন এসেই সেদিন আর গল্প-গুজব করা নয়, একেবারে কলম নিয়ে বসে গেছে যে-যার। ঘনশ্যামবাবুর ঘর থেকে তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে। সে কি চিৎকার! চিৎকার করে বলছেন, বেচ্ বেচ্ দে—

কখনও আবার বলছেন, লী—লী—লী—

প্রথম প্রথম আমি কিছুই বুঝতাম না।

পণ্ডিতজীও সেদিন ভয়ে ভয়ে নিজের কাজ নিয়ে বসত। তাঁরও মুখে কথা নেই। আমিও আমার নিজের ডেস্কে বসে হিসেব কষতে বসতাম। তিলকচাঁদের মুখে যে অত ফোড়ন, সে-ও চুপ। চতুরাননজীও ঘষ ঘষ করে কলম চালাচ্ছে।

ওধার থেকে তখনও চিৎকার আসছে জোরে জোরে।

আমার দিকে এক ফাঁকে চেয়ে নিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, আজ আপনা মন সে কাম করো বাঙালীবাবু।

আমি কিছু বুঝলাম না।

খানিক পরে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, আজ কী হয়েছে মুন্সীজী?

পণ্ডিতজী শুধু বললেন, কয়লা পড়ে গেছে।

কয়লা পড়ে যাওয়া মানে ভীষণ ব্যাপার। ঘনশ্যামবাবুর কোম্পানীর অনেক টাকা কয়লার শেয়ারে খাটছে। সেই শেয়ারের যদি দাম পড়ে যায় তো কোম্পানী কোথায় দাঁড়াবে! আর কোম্পানী পড়লে আমরা কোথায় যাব? কোম্পানীর সঙ্গে যে আমাদের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। কী ভয়ে ভয়ে যে সেদিন সারাদিন কাটালাম গদিতে! মনে হল—আমার যেন চাকরি চলে গেছে। আমি আবার বেকার হয়ে গেছি। দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়াব কী করে! কোন্ মুখ নিয়ে কথা বলব!

কিন্তু বেশিদিন আর সে-রকম অবস্থা থাকে না। কয়লা আবার একদিন

ওঠে।' সেদিন ঘনশ্যামবাবু দেরি করে গদিতে আসেন। সেদিন আবার হাসি-ঠাট্টা চলে আমাদের।

পণ্ডীতজী আবার বলেন, তোমাদের মোহনবাগান জিৎ গিয়া বাঙালীবাবু—তুমি কোন্ দলে ?'

তিলকচাঁদ বলে, বাঙালীলোগঁকে সিরফ্ মোহনবাগান হ্যায় পণ্ডীতজী, ঔর কুছ নেহি হ্যায়।

চতুরাননজী বলে, ঔর মছলি ভি হ্যায়—

পণ্ডিতজী বলেন, আজ কেয়া মছ্লি খায়া বাঙালীবাবু ?

আমি হাসি। আমার আর রাগ হয় না কারোর ওপর। কোম্পানীর অবস্থা ভাল হয়ে গেছে। কয়লার দর উঠেছে, ঘনশ্যামবাবুর মেজাজ ভাল হয়েছে, আমার চাকরি আছে। মাস গেলেই মাইনে পাব। মাইনে পেয়ে দাদার হাতে গিয়ে টাকাটা দেব। বোনের শাড়ি কেনা হবে, চাল, ডাল, তেল, নুন, আটা, কেনা হবে। রাস্তা দিয়ে যেন রাজার মত বুক ফুলিয়ে হাঁটি। আমিও সুখী। আমার চাকরি আছে। আমার ত সব আছে।

সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে হেসে কথা বলি।

স্ত্রী এসে কালীঘাটের প্রসাদ দেয়। বলে, তুমি যে-রকম ভাবিয়ে তুলেছিলে, তাই মায়ের বাড়িতে গিয়ে পূজো দিয়ে এসেছিলাম।

আজ আমার এই বাড়ি দেখছেন। সাত বিঘে জমির ওপর এই বাড়ি। এই চাকর-বাকর, এই ঐশ্বর্য—তখনকার দিনে আমি এ-সব ভাবতেও পারতাম না। তখনকার কথা আজ আপনাদের বলতে ভালও লাগছে সেই জন্যে। সে যে কী কষ্টে কী ভাবনায় দিন কাটিয়েছি তা আপনারা হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আপনারা ভাবছেন, করতাম ঘনশ্যামবাবুর গদিতে খাতা-লেখার চাকরি, তা থেকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারই বা হলাম কী করে, আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করে এত টাকা করলামই বা কী করে! আপনি এসেছেন কিরণ চৌধুরী সাহেবের রোগ সারাতে, তাই আপনাকে দেখে সেই সব পুরোন দিনের কাহিনী বলবার একটা লোক পেয়েছি।

বাবা বললেন, বলুন, বলুন, আমাদের এখন কোনও কাজ নেই, একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম এমনি এদিকে, আলাপ হয়ে গেল আপনার সঙ্গে, ভালই হল—

তিনকড়িবাবু বলতে লাগলেন, রোজই আপনাদের দেখি, প্রায়ই ভাবি

ডেকে একটু আলাপ করব, তা ভাবতে ভাবতেই আপনারা চলে যান, আর ডাকা হয় না, আজ ডাকব বলেই সামনে বসে ছিলাম।

একটু থেমে বলতে লাগলেন, তখনকার দিনের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে কবিরাজ মশাই, কী সস্তাগণ্ডার দিন সব। কিন্তু সেই সস্তাগণ্ডার দিনে যে কী অভাবের মধ্যে কেটেছে আমার কী বলব! একটা ভাল শাড়ি কখনও কিনে দিতে পারি নি প্রাণ ভরে নিজের স্ত্রীকে। মনে হত ঘনশ্যামবাবুর কোম্পানীর অবস্থা যেন আরও ভাল হয়, তাতে আমাদেরও ভাল কোম্পানীরও ভাল। মাঝে মাঝে হাত জোড় করে অদৃশ্য ঠাকুরকে ডাকতাম কেবল—হে ঠাকুর কয়লার দাম যেন না পড়ে আর, লোহার দাম যেন না পড়ে আর, তামার দাম যেন না পড়ে আর।

মাসের শেষে মাইনেটা নিয়ে আগে দাদার হাতে দিয়ে তবে অন্য কথা।

দাদা বলত, মাইনে বাড়াবার কথা আর কিছু বলেছে ওরা?

মাইনে বাড়ানোর কথা দূরে থাক, চাকরিটা থাকলেই বাঁচি!

বলতাম, এখন মাইনে বাড়ানোর কথা আর বলি নি দাদা।

—কেন?

বলতাম, এই সেদিন ঘনশ্যামবাবুর মেজাজ খারাপ গেছে, এর মধ্যে যদি মাইনে বাড়ানোর কথা বললে মেজাজ আবার বিগড়ে যায়?

—কিন্তু ওরা যে বলেছিল বাড়াবে?

—বলে তো ছিল, তারপর যে কয়লার শেয়ারের দাম পড়ে গিয়েছিল, অফিসময় হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গিয়েছিল ক'দিন—

দাদা বলত, তা শেয়ার মার্কেটের দর তো ওঠা-নামা করবেই, ঘনশ্যামবাবুর কি একটা কারবার, ওঁর লাখ লাখ টাকা, গেলেই বা কী আর এলেই বা কী!

বললাম, পণ্ডিতজী তো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন কয়লা যদি পড়ে যায় তো কোম্পানী উঠে যাবে।

—দূর, তাই কখনও হয়। ঘনশ্যামবাবুর ব্যবসা কি এক পুরুষের! আজ সাতপুরুষ ধরে ওই কারবার চালাচ্ছে কলকাতায় বসে, কতবার কী ঘটল ওদের! কিচ্ছু হবে না, ওরা কি আমাদের মত বাঙালী? ওদের ওতে কিছু হয় না।

সত্যই ঘনশ্যামবাবুকে যতই দেখতাম ততই অবাক হয়ে যেতাম।

পণ্ডিতজীর কাছে শুনতাম ঘনশ্যামবাবুর গল্প। লেখাপড়া কিছুই শেখেন নি। বাবা শিবশ্যামবাবুর সঙ্গে তখন এক-একদিন এসে বসত গদিতে। কতদিন এই গদিবাড়িতে বসে গল্প করেছে পণ্ডিতজীর সঙ্গে। তখন ছোট ছেলেটি

ঘনশ্যামবাবু। শিবশ্যামবাবু নিজের গদিতে বসে এখনকার ঘনশ্যামবাবুর মত টেলিফোন নিয়ে ব্যবসা চালাতেন। ভুররা খেতেন। লম্বা লম্বা কলকে ছিল। একটা ফুরিয়ে গেলে আর একটা। দু'টো হাতের আঙুলে জড়িয়ে ধরে লম্বা লম্বা টান দিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে কপালের সবগুলো শির ফুলে ফুলে উঠত। বড় কৃপণ ছিলেন শিবশ্যামবাবু। ব্যবসা তখন এমন বিরাট ছিল না। অল্প অল্প মূলধন নিয়ে অল্প অল্প শেয়ার ধরতেন। সাবধানী মানুষ ছিলেন শিবশ্যামবাবু। তেরটা ছেলে ছিল বাড়িতে। এক-একজনকে এক-একটা ব্যবসায় ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন।

শিবশ্যামজী বলতেন, বেশি টাকা রাখব না, ছেলেরা নবাব হয়ে যাবে।

এক ছেলেকে দর্মাহাটায় লোহালক্কড়ের দোকান করে দিয়েছিলেন, এক ছেলেকে বেনে-মশলার কারবার। এমনি সবাইকে। কেউ বসে নেই। সব কারবারই ভাল চলছে। কিন্তু বড়ছেলে ঘনশ্যামকে দিয়েছেন নিজের পৈতৃক কারবারটা।

শিবশ্যামবাবুর আদিপূর্বপুরুষ এসেছিলেন পাটনা না গয়া না ছাপরা—কোন্ একটা জেলা থেকে। তখন সবে কলকাতার পত্তন হচ্ছে। সে-সব অনেক দিনের ব্যাপার। একটা গামছার দোকান করেছিল ফুটপাতের ওপর। ঠিক দোকান নয়। কাঁধে নিয়ে ফেরি করতেন গামছা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে। হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ডেকে ডেকে সস্তায় গামছা বেচতেন অল্প লাভে। সেই গামছা-বেচা পয়সায় একটা ছোট দোকান হল দই-হাটায়। তারপর সেই ছোট দোকানটুকুই দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে এই এত পুরুষে মস্ত কোম্পানী হয়েছে। কটন স্ট্রীটে বাড়ি হয়েছে। সে-বাড়িও যে-সে বাড়ি নয়। সাত ছেলের একসঙ্গে বাড়ি হয়েছিল। এখন এক-একজন আলাদা বাড়ি করে আলাদা আলাদা জায়গায় উঠে গেছেন। এখন ঘনশ্যামবাবুর দর্মাহাটার গদিবাড়িতে সারা ভারতবর্ষের লোক এসে বসে। ব্যাপারী যারা আসে, এসে ওঠে তাদের গদিতে, তাদের জন্যে থাকবার খাবার বন্দোবস্ত আছে। গদিবাড়ির পশ্চিম দিকে ব্যাপারীদের মুনিমরা এসে থাকে। সেখানে ঠাকুর-চাকর আছে। রসুই-ঘর আছে। মুনিমরা সকালে উঠেই গঙ্গায় গিয়ে স্নান সেরে নেয়। তারপর নিচের চায়ের দোকানে ভাঁড়ে করে চা খেয়ে আসে গিয়ে। যে-যার কাজকর্মে বেরিয়ে যায়। বড়-বাজার, ডালহৌসি স্কোয়ার, অফিস-পাড়ায় ঘুরে দুপুর বেলা খেতে বসে রসুইঘরে। বিরাট রসুইঘর।

লম্বা একখানা শোবার ঘর। খাটিয়া পাতা আছে সার-সার। সেইখানেই শোয় সব। ঘনশ্যামবাবুর পুরোন খদ্দের তারা। বহুদিন থেকেই এমনি হয়ে আসছে। হাওড়া স্টেশনে নেমে সোজা এসে ওঠে ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়িতে।

চেনা-জানা লোক সব।

ঠাকুর চিনতে পারে সবাইকে।

—আজকে কী খানা হয়েছে চৌবেজী?

ঠাকুর বলে, রহড় ডাল ঔর ভিণ্ডিকা ভাজি আর চাপাটি।

—রাতমে কেয়া বানায়গা?

—খিচড়ি।

—খিচড়িমে থোড়া মিরচা জেয়াদা ডাল্না। বাংলা দেশে থেকে তুমি বাঙালী হয়ে গেছ চৌবেজী, একদম বাঙালী বন্ গয়া।

ঠাকুরও হাসে, নোকরও হাসে, মুনিমজীও হাসে।

বলে, কলকাত্তা আজব দুনিয়া চৌবেজী, ছাপ্পান সাল ধরে কলকাত্তায় আসছি চৌবেজী, য়্যায়সা শহর ম্যয় কভি নেহি দেখা—তোমার শিবশ্যামবাবু বড় ভাল আদমী থে, রাজা আদমী থে। উ জমানা মে ··

তারপর জিজ্ঞেস করে, ঘনশ্যামবাবুর তবিয়ৎ তো আচ্ছা?

—নেহি হুজুর।

ঘনশ্যামবাবুর তবিয়ৎ কদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। গদিবাড়িতে আসতে পারেন নি ক'দিন। পণ্ডিতজী হেড মুন্সী আসে। চতুরাননজী আছে, তিলকচাঁদজী আছে,—ঔর একঠো বাংগালীবাবু ভি আছে—

সকাল থেকেই হৈ চৈ পড়ে যায় গদিবাড়িতে। যারা বাইরের লোক আসে স্টেশন থেকে, তারা কলকাতায় গিয়ে ভিড় করে। রসুইঘর ধোয়া মোছা হয়। জমাদার এসে সমস্ত বাড়িখানা ঝাড়পোঁছ করে। আটা মাখতে বসে যায় সুখলাল। বিরাট কাঠের বারকোশের ওপর আটা ঢেলে জল দিয়ে তাল পাকায়। সেই আটাই দুই হাতের তালুতে ফেলে চাপাটি বানায় চৌবেজী। তারপর চৌকিতে এক-একখানা করে ফেলে আর পাতে দেয় ঘি মাখিয়ে। ভিণ্ডির ভাজ্জি দেয়, রহড় ডাল দেয় বাটিতে। গরম চৌকির সামনে বসে চৌবেজী দর-দর করে ঘামে। ঘামে পৈতে ভিজে যায়।

যারা খেতে বসে তারা বলে, বাস্ বাস্ চৌবেজী—ঔর নেহি—

—চাটনী দেব না মুনিমজী?

—থোড়া আচার দেও চৌবেজী, নিম্বুকা আচার।

রসুইঘরে যখন মুনিমজীদের খাওয়া-দাওয়া চলে তখন বড়বাজারের পাড়ায় তুমুল হৈ-চৈ। নিচের চা-ওয়ালা আসে কেটলি আর ভাঁড় নিয়ে গদিবাড়ির ভেতরে। চা-ওয়ালার অনেক কাজ। দশটা গদিতে চা দিয়ে আসতে হয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হাঁকে, গরম চায়—

তার হাঁটার শব্দ শুনেই বোঝা যায় চা-ওয়ালা আসছে। কাঠের সিঁড়িতে দপ্ দপ্ করে আওয়াজ হয়। পণ্ডিতজী চা নেয়, চতুরাননজী চা নেয়। তিলকচাঁদজীও চা নেয়।

তিলকচাঁদ বলে, বাঙালীবাবু চা খাবে না?

বললাম, আমি চা খাই না।

চা খাব আমি! বরং সে-কটা পয়সা বাঁচলে সংসারের মাসকাবারি সাশ্রয় হবে। চা খেতে গেলেই মনে পড়ত দাদার মুখটা, মনে পড়ত দিদির মুখ, বোনদের মুখ, স্ত্রীর মুখ। সকলেই যেন আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। আমি অপরাধের ভয়ে মাথা নিচু করে সমস্ত ঐশ্বর্য সমস্ত বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলতাম নিজেকে। আমার জন্যে ও-সব কিছু নয়, আমার জন্যে ও-সব নিষিদ্ধ। চিরজীবনের মত নিষিদ্ধ।

এমনি করেই হয়ত সারা জীবনটা আমার ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়িতেই কেটে যেত। এমনি করেই হয়ত সারা-জীবন ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়ির উত্থান-পতনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের ওঠা-পড়া মিশিয়ে ফেলতাম। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ভীষণ দুর্ঘটনা। আর আমার জীবনের সব লেন-দেনের হিসেব এক মুহূর্তে আমূল বদলে গেল। আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম।

দুর্ঘটনাটা যদি না ঘটত সেদিন তো আজ আপনারা আর আমাকে এই দেওঘরের বাড়িতে দেখতে পেতেন না। এই বাড়িও দেখতে পেতেন না আমার। এই আরাম আর শান্তির মধ্যেও শেষ জীবনটা কাটাতে পারতাম না।

তবে শুনুন।

ঘনশ্যামবাবুর একদিন অসুখ হল। তিনি আসতে পারলেন না গদিতে।

আমি যথারীতি হাঁটতে হাঁটতে গদিতে গেছি। সেদিন খুব বৃষ্টি। বৃষ্টিতে অর্ধেক ভিজে গেছে আমার শরীর। গদিতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন আর কেউ আসে নি। অন্যদিন ঘনশ্যামবাবু একলাই সকলের আগে এসে কাজ আরম্ভ করে দেন। নিজের ঘরটাতে বসে টেলিফোন করেন দশজনকে—

খাতাপত্র নিয়ে নিজের কাজে লেগে যান। পণ্ডিতজী এসেই তাঁর ঘরে গিয়ে 'জয়রামজীকি' করে আসে। তারপর কাজের তাড়া। কাজের যুদ্ধ লেগে যায় তখন। তখন আর জ্ঞান থাকে না কারো। রসিদ, ভাউচার, ডেলিভারিখাতা, আমদানি-রপ্তানি, লোক-লস্কর, খদ্দের, পাওনাদার সবাই আসে। গোলমাল হয়। চতুরাননজী একমনে কলম পিষতে পিষতে ঘাড় ব্যথা করে ফেলে। তিলকচাঁদজীরও তখন অন্য কথায় মন দেবার ফুরসৎ থাকে না। আর আমি একমনে কাজ করে যাই, পণ্ডিতজীকে খুশী করতে চেষ্টা করি। পণ্ডিতজী খুশী থাকলেই আমার ভাগ্য ফিরবে।

সেদিন গদিতে যেতেই পণ্ডিতজী বললেন, বাঙালীবাবু!

ডাক শুনেই কাছে গেলাম।

দেখলাম পণ্ডিতজী খুব ব্যস্ত।

পণ্ডিতজী বললেন, কটন স্ট্রীটে যেতে হবে তোমাকে একবার।

—কটন স্ট্রীটে! কখন?

পণ্ডিতজী বললেন, আজ সন্ধ্যাবেলা। ঘনশ্যামবাবুর অসুখ, টেলিফোন করেছিলেন বাবুজী। তিনখানা খাতা নিয়ে যেতে হবে সই আনতে।

বললাম, এখন দিন না, যাই।

পণ্ডিতজী বললেন, এখন কি খাতা তৈরি হয়েছে? ভাউচার জমা হবে তবে তো।

ভাউচার জমা হবে খাতায় তবে নিয়ে যেতে পারব। গদির কাজ শেষ করে খাতাগুলো নিয়ে কটন স্ট্রীটে গিয়ে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে সই করবার জন্যে নিয়ে যাব। খাতা সেইখানেই থাকবে। পরের দিন আবার আনতে হবে আমাকেই।

চাকরি যখন, তখন যা হুকুম হবে তাই-ই করতে হবে। না বললে কে শুনবে!

গদিবাড়ি বন্ধ হয়ে গেল সকাল সকাল। চতুরাননজী আর তিলকচাঁদজীও সকাল সকাল ছুটি পেয়ে গেল। আমার কপালেই ছুটি নেই। আমাকে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে গিয়ে তখন সব বুঝিয়ে দিতে হবে। ভয়ে আমার বুকটা কাঁপতে লাগল। কেন আমাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলা! আমি তো নিরিবিলিতে গদিতে কাজ করেই সন্তুষ্ট। আমি পারতপক্ষে ঘনশ্যামবাবুর কাছে যেতেই চাই না। চিরকালের ভীরু গো-বেচারা মানুষ আমি। জীবনে আমাদের মতন লোকেরা হেরে যেতেই যেন জন্মেছে। আমরা জয় চাই না, কোনও রকমে টিঁকে থাকতে চাই। যেন কোথাও কোনও বিপর্যয় না ঘটে,

কোনও ব্যতিক্রম না ঘটে। যেন অব্যাহত শান্তিতে নিশ্চিন্তে জীবনটা কেটে যায়। কারোর ক্ষতি করব না আমরা, আমাদেরও যেন কেউ ক্ষতি না করে। এমনি মানুষই আমরা। এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি নিয়েই আমি জন্মেছিলাম সংসারে। ভেবেছিলাম এই রকম দুঃখ কষ্ট আর পরের চাকরি করেই দিন কাটবে আমার। এর বেশী কিছু চাইও নি—চাইবার সাহসও কখনও হয় নি আমার। সাহস হবেই বা কী করে! আমরা সত্য পথে থাকি বটে কিন্তু সত্যি কথা বুক ফুলিয়ে দশজনের সামনে বলার সাহসও নেই আমাদের। আমরা মনে মনে গর্জাই, মনে মনে আমরা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প নিই, কিন্তু মুখ ফুটে অন্যায়ের প্রতিকার করতে গেলে ভয়ে পেছিয়ে আসি। আসলে আমি ভীরু, আমি ভীতু প্রকৃতির মানুষ। চাকরির জন্যেই আমি যেন তৈরি, আর সে-চাকরি তেমন কোনও চাকরি নয়, একটা অশ্রদ্ধার অবজ্ঞার আর অবহেলার চাকরি আমার। আমার অভাবে ঘনশ্যামবাবুর গদি অচল হয়ে যাবে না, আমার অনুপস্থিতিতে কিছু আটক থাকবে না। আমি বাড়িতেও একটা বোঝা, গদিতেও তাই। আমার অভিমান দুর্জয়, অনুভূতি তীব্র, কিন্তু ক্ষমতা আমার সামান্য। দরকার হলে ভাল করে প্রতিবাদ করতেও আমি পারি না এই এমনি লোককেই পাঠানো হল কটন স্ট্রীটে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন।

কটন স্ট্রীটটা আমার জানা ছিল। ওই সব রাস্তা দিয়েই আমি হাঁটতে হাঁটতে গদিতে যেতাম। তখনও সে-রাস্তায় ভিড় খুব। ও-সব পাড়ায় অনেক রাত পর্যন্ত ভিড় থাকে।

পণ্ডিতজীকে আসবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঘনশ্যামবাবুকে কী বলতে হবে?

পণ্ডিতজী বলেছিলেন, কিছু বলতে হবে না, স্রেফ খাতা ক'টা দিয়ে চলে আসবে তুমি।

বলেছিলাম, ঘনশ্যামবাবু কি একতলায় থাকেন?

পণ্ডিতজী বলেছিলেন, এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারবে না? একতলায় থাকেন কি দোতলায় কি তিনতলায় তা-ও আমাকে বলে দিতে হবে? বাড়িতে কি দরোয়ান চাকর কেউ নেই?

একটু লজ্জায় পড়েছিলাম। বড়লোকের বাড়ি—সামনেই চাকর-বাকর দরোয়ান মুন্সী কেউ-না-কেউ থাকবেই। তাদের জিজ্ঞেস করলেই চলবে।

নম্বর খুঁজে গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই দেখি বিরাট বাড়ি। রাস্তার ওপর বাড়িটা সোজা চার-পাঁচতলা উঠে গেছে। ওপরে সাদা-সবুজ রেলিঙের সার। নিচে একটা দরজা। দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। লোক যাতায়াত করছে সেই দরজা দিয়ে। কেউ আমাকে জিজ্ঞেসও করে না কিছু। ভেতরে ঢুকেই দু'পাশে ঘর—আর তারপর একটা উঠোন। উঠোনের চারদিকে সরু সরু লাল-নীল থাম। পাশেই যেন কাঁসর-ঘণ্টা বাজার শব্দ হচ্ছে। মনে হয় যেন কী পুজো হচ্ছে।

আস্তে আস্তে ঢুকলাম ভেতরে।

দেখি সত্যিই পুজো হচ্ছে। বোধ হয় বাড়ির কোনও বিগ্রহ। ধূপ-ধুনোয় ঘরটা ঝাপসা হয়ে আছে। একজন কাঁসর বাজাচ্ছে ঝাঁই-ঝাঁই করে। বড়লোকের বাড়ি, নিত্য-পুজোর ব্যবস্থা আছে হয়ত। চারিদিকের দেয়ালে নানান ধরনের পট ঝুলছে। হনুমানের লঙ্কাদহন, সীতাহরণ, হনুমান পেট চিরে রামের ছবি দেখাচ্ছে। অনেকক্ষণ খাতা তিনটে নিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে আছে, একবার ঠাকুরকে উদ্দেশ করে প্রণামও করলুম। হাজার হোক, না-ই বা হল বাঙালীদের ঠাকুর—কিন্তু যে-কোনও ঠাকুরই হোক, ভগবান তো। ভগবান সকলেরই ভগবান। তা ছাড়া ভগবান ছাড়া আমার ভরসাই বা কী! অনেকক্ষণ মাথাটা নুইয়ে প্রণাম করলাম। তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও দেখে না। দু'একজন চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক উঠোনের দিক থেকে বাইরে আসছিল, যাচ্ছিল। কার সঙ্গে কথা বলব কাকে জিজ্ঞেস করব বুঝতে পারলাম না। আমি স্বভাবভীরু বাঙালী, আর সকলেই হিন্দুস্থানী গোছের লোক। আমাকে যেন তারা দেখেও দেখে না। আমি যেন একটা মানুষই নই। ভেতর দিকে চেয়ে দেখলাম, বিরাট বাড়ি। চক্-মিলানো বাড়ি। চারদিকে রেলিং-ঘেরা বারান্দা—তার পরেই সার সার ঘর সব।

একজন লোক বাইরের দিকে আসছিল।

কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, বাবুজী কোথায়?

লোকটা আমার দিকে ভালো করে না চেয়েই বললে, ভিতরে যাও।

বলেই লোকটা যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলে গেল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেতরে কোথায় যাব বুঝতে পারলাম না। বারান্দার ধারে একটা আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তাতে উঠানে আলো বেশি হয় নি। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অন্ধকার। অন্ধকারে কেউ কোথাও বসে

আছে কিনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পূজোর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে আর কোনও শব্দ কানে আসার কথা নয়।

আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। এদিক-ওদিক চারদিক চেয়ে দেখলাম। আকাশ পর্যন্ত উঁচু বাড়ি। একটা চৌকো অন্ধকার আকাশ শুধু মাথার ওপর দেখা যায়। আর চারপাশে রেলিং ঘেরা বারান্দা আগাগোড়া। দোতলা-তেতলা চারতলার বারান্দাতেও কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। লোকজন কোথাও যদি থাকে তা-ও দেখতে পাবার উপায় নেই। বলতে গেলে অত ঘর—সেই হিসেবে বাড়িতে অনেক লোক থাকবারই কথা। বাড়িটা দেখে মনে হয় যেন গিজ্ গিজ্ করছে লোক ভেতরে। কিন্তু তা নয়—যত লোক তার চেয়ে বেশি চাকর-বাকর। যত চাকর-বাকর তার চেয়ে যেন বেশি ঘর বাড়িটার মধ্যে।

খাতা তিনটে বগলে নিয়ে কী করব ভাবছি। কাকে জিজ্ঞেস করলে ঘনশ্যামবাবুর সন্ধান পাওয়া যাবে।

আর একজন পাগড়িপরা লোক হন্ হন্ করে আসছিল। হাতে তার একটা বালতি।

বললাম, বাবুজী কোন্ দিকে থাকেন?

লোকটা আমার দিকে চেয়ে বললে, ভিতরমে যাইয়ে।

বলে সে-লোকটাও যেমন হন্ হন্ করে আসছিল তেমনি হন্ হন্ করে চলে গেল আমাকে পাশ কাটিয়ে।

মুশকিলে পড়লাম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। মনে আছে কী বিপদেই যে পড়েছিলাম সেদিন। আজও ভাবলে আমার গা-টা কাঁটা দিয়ে ওঠে। চাকরির জন্যে অবশ্য তখন সব করতেই প্রস্তুত আমি। চাকরির জন্যে মান অপমান সবই সহ্য করতে রাজী আছি। চাকরির জন্যেই সেদিন সেই মধ্যবিত্ত সমাজের তিনকড়ি ভঞ্জ সব কিছুর জন্যেই বুঝি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তখনও কি জানি যে মাথার ওপর সেদিন আমার খাঁড়া ঝুলছে? তখনও কি জানি কী কুক্ষণে গদি থেকে বেরিয়েছিলাম ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যাবার জন্যে! কাজটা আর কাউকে দিলেই হত। তিলকচাঁদ কি চতুরাননজী—ওদের মধ্যে যে-কেউ কাজটা করতে পারত। পণ্ডিতজী নিজেও কাজটার ভার নিতে পারতেন। কিন্তু হয়ত আমার ভালর জন্যেই পণ্ডিতজী আমাকে পাঠিয়েছিলেন ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি। যাতে ঘনশ্যামবাবুর নজরে পড়ি আমি—যাতে

আমার মাইনে বাড়ে—যাতে ঘনশ্যামবাবুর কাছে প্রমাণ হয় আমি কাজের লোক।

সিঁড়ির ধারে একটা লোক বসে বসে বোধ হয় আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছিল।

তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবুজী কোথায় থাকেন?

লোকটা আমার দিকে ভাল করে চাইলে না পর্যন্ত। বললে, উপর—

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় মশাই, কেউ কি বলতে পারে! দেখুন না, চাকরি করি সাত টাকা মাইনের, কাজ করব গদিতে আর বাড়ি আসব ছুটির পর। এই তো নিয়ম। নইলে আমার কপালে কী বিপদ সেদিন ঘটল তাই বলি। আর সেই একদিনের এতটুকু ঘটনাই আমার জীবনে এক চরম দুর্ভাগ্য ডেকে আনল। আর দুর্ভাগ্যই বা বলি কী করে আজ? আজ তাকে সৌভাগ্যই বলতে হবে। নইলে হয়ত সারা জীবন সেই সাত টাকা মাইনেতেই জীবন কাটিয়ে দিতে হত গদিবাড়ির ভেতরে।

অন্ধকার-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। ঠিক পুরো অন্ধকার নয়—আলো-আঁধারি বলা যায়। টিম্‌টিমে একটা আলো জ্বলছিল সিঁড়ির মাথায়, তার আলোয় সিঁড়িটা যেন আলোর চেয়ে অন্ধকারই হয়েছে বেশি।

সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা লম্বা বারান্দা। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত লম্বা।

এধার-ওধার চেয়ে দেখলাম। মনে হল পশ্চিম দিকের একটা ঘর থেকে কে যেন বেরিয়ে আবার পূব দিকের ঘরে চলে গেল।

মনে হল ডাকি তাকে। ডেকে জিজ্ঞেস করি, ঘনশ্যামবাবু কোন্ ঘরে থাকেন। কিন্তু লোকটা এক মুহূর্তের মধ্যে যে কোথায় চলে গেল তা ঠিক করতে পারলাম না। আন্দাজ করে বারান্দাটার একটা দিক ধরে চলতে লাগলাম।

এ কোথায় এলাম আমি? এ কেমন বাড়ি! এত ঘর, এত বড় লম্বা বারান্দা, ঘরের ভেতরে নিশ্চয় অনেক লোক আছে। কিন্তু কাকে ডাকি!

বারান্দাটা ধরে বরাবর সোজা চলতে লাগলাম। পাশে এক-একটা করে ঘর। ঘরগুলোর দরজা ভেজানো। কোন্ ঘরে ঢুকব বুঝতে পারছি না। অনেকখানি যেতে একটা বাঁকের মুখে এসে আবার ডান দিকে ঘুরলাম। সেখানেও সোজা লম্বা বারান্দা।

একবার পেছনের দিকে চেয়ে দেখলাম।

কতদূর এসেছি বুঝতে পারলাম না।

মনে হল ফিরে যাই। কোথায় না বলে-কয়ে ঢুকেছি কে জানে। হয়ত এটা অন্দর-মহল। হয়ত এদিকে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু ফিরে যেতেও মন চাইল না। সবাই-ই তো সোজা ভেতরে আসতে বললে। দু'তিন জনকে জিজ্ঞেস করেছি। সবাই-ই তো বলেছে, ভেতরে যাও। তবে কি ভেতরে আসবার আরও সিঁড়ি আছে!

আর একবার দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলাম।

এখানে রাস্তার ট্রামের ঘড়-ঘড় আওয়াজ আর শোনা যায় না। বহু দূর থেকে যেন পূজোর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। এত বড় বাড়ি—কোন্ দিক দিয়ে ঢুকে কোন্ পথে এতদূর এসেছি! এখন ফিরে যেতে চেষ্টা করলেও হয়ত আর ফিরে যেতে পারব না। পথ না দেখিয়ে দিলে হয়ত রাস্তাই চিনতে পারব না।

পাশেই দেখলাম একটা ঘর। দরজাটা ভেজানো।

ভাবলাম যদি সেখানে কেউ থাকে দেখা যাক। জিজ্ঞেস করব তাকেই।

দরজার পাল্লাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

দেখি ঘরটা বড়। বসবার ঘর। দেয়ালের গায়ে কিছু ছবি টাঙানো আছে। বেশির ভাগই ঠাকুর দেবতার ছবি। তিনটে সোফা—কয়েকটা চেয়ার। একটা টেবিল। মেঝের ওপর কার্পেট পাতা।

মনে হল ঘরে যেন এখনি কেউ ছিল। একটু আগেই কোথাও চলে গেছে।

ভাবলাম এখানে অপেক্ষা করলেই হয়ত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কোনও চাকর-বাকর। দেখে তো মনে হয় এটাই ঘনশ্যামবাবুর বসবার ঘর। এখনি হয়তো কেউ এসে পড়বে।

কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল।

পাশের ঘরেই যেন কার গলা শুনতে পেলাম। মেয়েমানুষের গলা।

হিন্দুস্থানী ভাষাটা বলতে আমি ভাল পারতাম না। কিন্তু হিন্দুস্থানীদের গদিতে কাজ করে করে বুঝতে পারতাম ভাল।

কে যেন বলে উঠল, লজ্জা করে না তোমার? শরম লাগে না তোমার?

অদ্ভুত মিষ্টি মেয়েলি গলা। হিন্দি ভাষায় কথা বলছে। খুব রাগ-রাগ ভাব।

আর একজন পুরুষের গলা পেলাম।

বলছে, তুমি বিশ্বাস কর জয়ন্তীয়া, আমার কথা শোন।

মেয়েটি বললে, থাম, বেওকুফ কোথাকার!

—ছি, অত চেঁচিও না, কেউ শুনতে পাবে।

মেয়েটি বললে, কেউ শুনতে পাবে না, আজ কেউ নেই বাড়িতে, সব সাদির নেমন্তন্ন খেতে গেছে—তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

পুরুষটা বললে, কেন, আমি তো আসি, আমি তো না ডাকতেই আসি।

—থাম তুমি, একটা লম্পট কোথাকার, কোথায় যাও তুমি আজকাল তা জানি না ভেবেছ!

পুরুষটা বললে, আমি আবার কোথায় যাই! আমি তো নিজের কাজ ছাড়া আর কোথাও যাই না!

মেয়েটি যেন খুব রেগে উঠল।

বললে, তুমি কোথায় যাও তা আমি জানি না ভেবেছ! পরশু রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে? সারারাত বাড়িতে আসো নি তুমি। সারারাত বাইরে কার কাছে কাটাও তা আমি জানি না ভেবেছ? আমি সব খবর পাই, আমার কাছে ঢাকতে চেষ্টা কোর না।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম কথা বার্তা শুনে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। এ কি স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া? স্ত্রী স্বামীকে বকছে? আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে আমি কেন কান দিই? আমার কী অধিকার আছে পরের গোপন কথা শোনবার?

একবার ভাবলাম চলে যাই, কিন্তু শোনবার লোভও হচ্ছিল। আমাদের মতন মধ্যবিত্ত লোক যারা, তাদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয় জানি। ঝগড়া হয়, কথা বন্ধ হয়ে যায় কিছু দিন। তারপর আবার ভাব হয়ে যায়। কিন্তু বড়লোকদের মধ্যে? বড়লোকদের তখন দূর থেকেই দেখেছি কেবল। গাড়ি চড়ে যেতে দেখেছি তাদের। বিরাট গাড়ি—তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে চলেছে। তাদের সাজ-পোশাকের বাহার, তার গয়না-গাঁটি, তাদের হাব-ভাব চাল-চলন দূর থেকে দেখে মনে মনে হিংসে হয়েছে। ভেবেছি ওদের বোধ হয় কোনও সমস্যা নেই জীবনে। তাদের যত দেখেছি, নিজের জীবনের ওপর তত ঘৃণা জন্মেছে। ওদের মধ্যে বোধ হয় এমন ঝগড়া হয় না আমাদের মত। ওদের জীবনে কেবল সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য, কেবল বিলাস আর বৈভব। রাস্তায় একলা হাঁটতে হাঁটতে বড়লোকের দোতলা-তেতলা বাড়ির জানলায় কোনও বউকে দেখে নিজের বউ-এর কথা মনে পড়েছে। কী প্রশান্ত চেহারা সব—কী রূপ! কী বাহার! ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে,

কপালে সিঁদুরের টিপ, ঠোঁট দুটো পান খেয়ে লাল টক্ টক্ করছে। হয়ত স্বামী অফিসে গেছে, তারই পথ চেয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে। আমার স্ত্রীকেও যদি অমনি বাড়ি দিতে পারতাম, অমনি গয়না-শাড়ি দিতে পারতাম, অমনি বিলাস আর অবসর দিতে পারতাম! বাড়িতে এসে দেখেছি কতবার স্ত্রী ময়লা শাড়ি পরে তখনও সমানে খেটে চলেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত সে-খাটার আর বিরাম নেই। ক্ষার-কাচা, বাড়ির লোকের রান্নাবান্না, ঘর মোছা বাসন মাজা, কী নয়। দুই বোন, বউদি, আমার নিজের বউ—সকলেই খেটে খেটে পরিশ্রান্ত। তবু একটু সচ্ছলতা আসে না। তবু একটু শান্তি পায় না। আর ওরা কেমন আছে! কেমন গাড়ি করে বেড়াতে যায়! কেমন হাসি-হাসি মুখ! কেমন পরিচ্ছন্ন, কেমন প্রশান্ত রূপ!

একদিন বড়লোকদের সম্বন্ধে এই ধারণাই ছিল।

হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে তখনও কথা কাটাকাটি চলছে।

মেয়েটি হঠাৎ বললে, আমার সঙ্গে তুমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলে? আর আমি তোমার জন্যে কী করেছি তুমি ভুলে গেছ?

লোকটি বললে, না না, সত্যিই তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ জয়ন্তীয়া, আমার সব মনে আছে—সব।

মেয়েটি বললে, ছাই মনে আছে, টাকার জন্যে যখন তোমার কারবার বন্ধ হচ্ছিল, তখন বাবুজীকে বলে তোমায় আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইয়ে দিই নি? তোমার যখন অসুখ করেছিল, রাত্রিতে যন্ত্রণার চোটে ঘুমুতে পারতে না, তখন কে ডাক্তার-ওষুধের খরচ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিল?

লোকটা কিছু কথা বললে না এবার।

মেয়েটি আবার বলতে লাগল, যখনই তোমার টাকার দরকার হয়েছে, তখনই আমি তোমায় তা দিয়েছি, যখনই তোমার কারবারে লোকসান হয়েছিল আমিই জুগিয়েছি টাকা, বাবুজীকে না বলে তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিয়েছি। সব তুমি ভুলে গেলে?

লোকটা বললে, আমাকে কি তুমি এই বলতেই এখানে ডেকে নিয়ে এসেছ আজ?

মেয়েটি বললে, আমার টাকায় তুমি অন্য মেয়েকে গয়না কিনে দেবে, আর আমি চুপ করে থাকব—না?

কথাগুলো কানে আসতেই আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। কিছুই

বুঝতে পারছিলাম না। এ তো ঠিক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো ঠিক এরকম হয় না। শুধু আমাদের মতন গরীব লোকদের মধ্যেই নয়, কোনও সমাজেই হয় না। তবু কী জানি, সব সমাজের খবর তো তখন জানতাম না। বড়লোকদের দূর থেকেই দেখেছি, তাদের সঙ্গে কখনও তো ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পাই নি। তাদের শোবার ঘরে দূরের কথা, তাদের বাড়ির মধ্যেও কখনও ঢুকি নি তার আগে। সেখানে তারা কী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তার পরিচয় জানতাম না তখন। আমাদের সংসারে সারাদিন খাটুনির পর দেখেছি যখন বাড়িতে ফিরে গিয়েছি, আমার স্ত্রী এসে হাত-মুখ ধোবার জল দিয়ে গেছে। সারাদিনের কাজের খবর নিয়েছে। বলেছে, আজ এত দেরি হল যে আসতে? কিম্বা হয়ত বলেছে, ভাত হয়েছে—দেব?

কিন্তু এ-সব সংসারের কথাই আলাদা। বিশেষ করে আবার যখন বাঙালী নয়। এদের স্বামী-স্ত্রী হয়ত অন্য ধরনের।

কিন্তু তখনও তো আসল ব্যাপার জানতাম না। কে সরযূপ্রসাদ, কে জয়ন্তীয়া—সরযূপ্রসাদের সঙ্গে জয়ন্তীয়ার সম্পর্কটা যে কী, তা-ও তখন জানতাম না। কেন যে সরযূপ্রসাদ এ-বাড়িতে আসে, কেন জয়ন্তীয়া তাকে ডেকে পাঠায়—কিছুই জানতাম না। আমি শুধু তখন অবাক হয়ে ভাবছি এ কোথায় এলাম। কোন্ রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম নিজে। এখান থেকে যেতেও পারি না, অথচ আবার এখানে থাকাও অন্যায়। বুঝুন আপনি তখন আমার অবস্থাটা। আজ এই ঘরে বসে এতদিন পরে সেদিনকার সেই ঘটনার কথা ভাবলেও যেন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিন সে-বাড়ি ছেড়ে আমার চলে আসবার ক্ষমতা ছিল না। আমাকে ঘনশ্যামবাবুর গদিতে চাকরি করতেই হবে। না করলে আমার চলবে না। না করলে আমাদের সংসার অচল হয়ে যাবে। না করলে আমি আমার স্ত্রী আমাদের সমস্ত পরিবার উপোস করবে।

সেইজন্যেই খাতা তিনটে বগলে নিয়ে ঘরের মধ্যেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পা দু'টো তখন থর থর করে কাঁপছে। ঘরের বাইরে কাউকে দেখছি না যাকে জিজ্ঞেস করব যে ঘনশ্যামবাবু কোন্ ঘরে থাকেন।

একবার ঘরের বাইরে তাকাচ্ছি, আর একবার কি করব ভাবছি।

মনে হল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কথাগুলো শোনাও যেন অন্যায় আমার পক্ষে। বাড়িসুদ্ধ লোক সবাই বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেছে তো জয়ন্তীয়া

যায় নি কেন? সরযূপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করবে বলে? কে সরযূপ্রসাদ? কীসের জন্যে তাকে জয়ন্তীয়া এই সন্ধ্যেবেলা ডেকে পাঠিয়েছে?

আপনি হয়ত ভাবছেন আমি সরযূপ্রসাদের নাম জানলাম কেমন করে! সত্যিই, লোকটার নাম যে সরযূপ্রসাদ তা আমি তখনও জানতাম না। জানতাম ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে দাম্পত্য-কলহ হচ্ছে। স্ত্রী হয়ত স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে অনুযোগ করছে। কিন্তু আমার সে-সব কথায় তখন থাকবার দরকার ছিল না—আগ্রহও ছিল না। আগ্রহ ছিল না ভয়ের জন্যে। মালিকের বাড়ির মেয়ে-বউ-জামাই-এর ব্যাপারে থাকা অন্যায়। তাতে চাকরি চলে যেত জানাজানি হলে।

হঠাৎ ভেতর থেকে যেন কথা কাটাকাটি আরও বেড়ে উঠল।

লোকটা বলে উঠল, তুমি কি চাও যে তোমার কথামত আমি চলব?

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ, আমার কথামতই তোমাকে চলতে হবে।

—কখনও নয়।

—আমার কথা না শুনলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি তুমি?

—আমাকে তুমি তেমন মেয়ে পাও নি যে আমি তোমার কথাই মেনে নেব।

লোকটা বললে, আমিও বলছি তোমার কথা আমিও মেনে নেব না।

—মানবে না? আলবাৎ মানবে। মানতে তোমাকে হবেই। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার এইসব কাণ্ড সহ্য করব?

লোকটা বললে, সহ্য আমিও করব না আর।

মেয়েটা বললে, সহ্য করবে না মানে? কে তোমার কারবার দাঁড় করিয়ে দিয়েছে? ছিলে ত পথের ভিখিরি, খেতে পেতে না, ফুটপাতে গামছা বিক্রী করতে, এখন যে আপিস করেছ, টেলিফোন করেছ, শেয়ার কেনা-বেচা করছ—কার টাকায় শুনি? কত টাকা বাবুজীর কাছে ধার নিয়েছিলে? কত সুদ দিয়েছ তার? হিসেব রেখেছ?

—কে চেয়েছিল তোমার টাকা?

মেয়েটি বললে, কে চেয়েছিল? শরম লাগে না তোমার কথা বলতে? আবার বলছ—কে চেয়েছিল তোমার টাকা!

লোকটা বললে, জামা ধরে টানছ কেন?

মেয়েটি বললে, খুব সিল্কের জামা পরেছ! কেন, জান না তোমার সব তেল

ভেঙে দিতে পারি? জান, তোমার সব জারিজুরি বার করে দিতে পারি? তুমি ভেবেছ কি আমাকে?

লোকটি বললে, ছাড় পথ ছাড়, আমার কাজ আছে, আমি যাই।

মেয়েটি বললে, কেমন করে যেতে পার যাও দিকি নি, দেখি!

—কেন তুমি যেতে দেবে না আমাকে?

মেয়েটি বললে, আমার কথার জবাব না দিয়ে যেতে পারবে না।

—কী তোমার কথা বল।

মেয়েটি বললে, তুমি ভেবেছ কি? তুমি ভেবেছ আমাকে ঠকিয়ে তুমি পার পাবে? আমার চোখে ধুলো দিয়ে তুমি রেহাই পাবে?

লোকটি বললে, আমাকে তোমার এই প্যান্‌প্যানানি শোনাবে বলে ডেকেছিলে নাকি?

মেয়েটি বললে, প্যান্‌প্যানানি?

লোকটি বললে, না তো কী! তোমার কাছে এলেই তুমি তো কেবল ওই সব আরম্ভ কর আজকাল! তোমার মুখে তো অন্য কথা নেই কিছু!

মেয়েটি বললে, আজ তুমি এই কথা বলছ? একদিন তুমিই না আমার একটুক্‌রো হাসির জন্যে জীবন দিতে পারতে বলেছিলে? একদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে বলে আমাদের বাড়ি এসে ঘুর-ঘুর করতে?

লোকটি বললে, হ্যাঁ তা করেছি—কিন্তু তুমি আর সে-রকম নেই—তুমি বদলে গেছ।

মেয়েটি বললে, বদলে গেছি? আমি বদলে গেছি না তুমি বদলে গেছ?

লোকটি বললে, আমি যদি বদলেও থাকি সে তো তোমার জন্যে।

মেয়েটি হঠাৎ যেন রেগে উঠল আরও।

বললে, নির্লজ্জ মিথ্যেবাদী কোথাকার!

—গালাগালি দিয়ো না—সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে।

মেয়েটি বললে, শুধু গালাগালি! তোমাকে খুন করে ফেললেও আমার শান্তি হবে না।

লোকটি বললে, ছাড়, পথ ছাড়, আমি যাব, আমার কাজ আছে।

মেয়েটি বললে, থাম, এত সহজে তোমায় আমি ছাড়ব না।

আপনি তখনকার মনের অবস্থা আমার কল্পনা করতে পারবেন না, কবিরাজ মশাই। আজ আমার বয়স হয়েছে, আরও অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু জেনেছি, অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু সেদিন আমার কম বয়স, সেদিন আমার

নতুন বিয়ে হয়েছে—সেই অবস্থায় আমি সেখানে আর কী করতে পারতাম! আমি এইটুকু বুঝেছিলাম যে যারা কথা বলছে তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। তাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরেছে তা-ও বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি যেন কী-রকম হয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে থেকে চলেও আসতে পারছিলাম না যেন। যেন আমার পা দুটো কেউ পেরেক মেরে সেই ঘরের মধ্যে আটকে দিয়েছে। আমার আর নড়বার ক্ষমতা নেই যেন। আর তা ছাড়া আমি সে-ঘর থেকে বেরিয়েই বা কোথায় যাব? অত বড় বাড়ির মধ্যে হারিয়েই যাব হয়ত। কোথা দিয়ে ঢুকে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে উঠে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম তা-ও ঠিক করতে পারার কথা নয়। যদি সেই অবস্থাতেই কেউ আমাকে দেখে ফেলত তা-হলেও আমার অপরাধের মাত্রা কিছুই কমত না। কোথাকার বাইরের একটা পুরুষমানুষ, ও-বাড়ির অন্দরমহলের ভেতর ঢুকে পড়েছিই বা কী করে! কী কৈফিয়ৎ আমি দেব?

আপনি হয়ত বলবেন আমারও কিছু দুর্বলতা ছিল নিশ্চয়ই। আমারও কৌতূহল ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার পারিবারিক অবস্থা, আমার মানসিক গঠন, আমার আর্থিক সঙ্গতির কথা ভাবলে আর সে-কথা আপনি বলবেন না। যার চাকরি যাবার ভয় দিনরাত, তার কাছে ও-রকম কৌতূহল হওয়া তো বিলাস। বিশেষ করে আমার মালিকের যে বাড়ি ওটা। সেখানে কোনও বেসামাল কাজ করার কথা যে ভাবাই যায় না।

ভাবলাম ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি একবার। তারপর যেমন করে পারি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা যে-দিক দিয়ে ঢুকেছিলাম সেইখানে গিয়ে আবার ভাল করে জিজ্ঞেস করি। কিংবা কাউকে বলি ঘনশ্যামবাবুর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে। এমন ভাবে একলা বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়া উচিত হয় নি।

ঘরে থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আন্দাজ করে যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেইদিকেই চলতে লাগলাম। কোথাও কোনও লোকের সাড়াশব্দ নেই। পাশাপাশি সার সার ঘর। সব ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বারান্দার ওপর। ওপরে চেয়ে দেখলাম। কোনও কোনও ঘরে আলো জ্বলছে। নিচের একতলাটা পুরোপুরি অন্ধকার, সেখানেও জন-মানুষের চিহ্ন নেই। বাইরের পুজোর দালানে তখন আরও জোরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। ঠিক কোন্ দিক দিয়ে গেলে যে সেখানে পৌঁছোন যাবে ঠাহর করতে পারলাম না। কোন্ সিঁড়ি দিয়ে নামলে যে সেদিকে

গিয়ে পৌঁছতে পারব তা-ও বুঝতে পারলাম না। হয়ত যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও অন্দরমহলের ভেতর ঢুকে পড়ব—তখন আরও বিপজ্জনক।

আস্তে আস্তে আবার যে-ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম সেই ঘরের দিকেই এলাম। তখন ভেতরে আলো জ্বলছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মনে হল আর কেউ-ই সে-ঘরে ঢোকে নি। হতাশ হয়ে আবার চারিদিকে চাইতে লাগলাম—যদি কারো দেখা পাওয়া যায়। এক-একবার মনে হয় হয়ত একজন লোক এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে—কিন্তু ডাকবার আগেই সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। চিৎকার করে যে কাউকে ডাকব তারও সাহস পেলাম না। সামান্য গদিবাড়ির চাকরে মালিকের বাড়ির ভেতরে এসে চিৎকার করে ডাকবার সাহস কেমন করে পাবে বলুন।

শেষ পর্যন্ত ভাবলাম চলেই যাব। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

বারান্দাটা দিয়ে বরাবর হাঁটতে লাগলাম সোজা। এঁকে বেঁকে এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক জায়গায় এসে রাস্তা বন্ধ। সেখানে মাথার ওপর একটা বাতি জ্বলছে টিম্ টিম্ করে।

আশ্চর্য বটে! এত বড়লোকের বাড়ি। একটা লোকজনও থাকতে নেই! বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেছে কি সকলেই? আর চাকর-বাকর তারাও সব পূজোর দালানে গিয়ে জড়ো হয়েছে! এত ভক্তি তো ভাল নয়। যদি চোর আসত! বড়লোকের বাড়িতে নিশ্চয় গয়নাগাঁটি-টাকাকড়ি আছে সিন্দুকে। যদি আমি না হয়ে চোর ডাকাত কেউ আমার মত ঢুকে পড়ত এমনি করে!

আর ঘনশ্যামবাবু? তিনিই বা কোথায়? তাঁর অসুখ। অসুখের জন্যই তিনি গদিতে যেতে পারছেন না। তাঁর অসুখের জন্যেও তো কেউ থাকবে। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করবার লোকও তো দরকার।

আজ এতদিন পরে সেই সব কথা শুনতে আপনাদের ভাল লাগছে কিনা জানি না। আপনারা এসেছেন, তাই আপনাদের শুনিয়েই আমি আবার যেন সেই সব দিনে ফিরে যেতে পারছি। সে-সব দিন আমার খুব সুখের নয় জানি, অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যেই আমার সে-সব দিন কেটেছে অবশ্য। এখন নিশ্চয়ই খুব সুখে আছি, কিন্তু অতীত যত দুঃখেরই হোক, তার বোধ হয় একটা মোহ আছে। সেই মোহ যত বয়স বাড়ে ততই বেড়ে চলে। নইলে আপনাদের ডেকে বসিয়ে কেন আমি সেই সব দিনের কথা বলছি। আপনি বুড়ো হয়েছেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পারবেন।

বাবা বললেন, না না, আপনি বলুন, আমার তো শুনতে খুবই ভাল লাগছে।

তিনকড়িবাবু বললেন, ভাল না লাগলেও আমি আপনাদের সে-সব কথা শোনাব—সকলে তো সব বোঝে না। সকলকে সব কথা বলেও আনন্দ পাওয়া যায় না, আপনি প্রবীণ লোক, চিকিৎসক, আর একজন প্রবীণ চিকিৎসকের ব্যথাটা বুঝবেন।

বাবা বললেন, কিন্তু আপনি চিকিৎসকই বা হলেন কী করে ?

তিনকড়িবাবু বললেন, সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি আমি। সেই ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়ির সামান্য কেরানী থেকে আমার ডাক্তার হওয়ার কাহিনীটাই আপনাকে বলছি। সেদিন যদি ঘনশ্যামবাবুর অসুখ না হত, আর আমি যদি খাতা সই করাতে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে না যেতাম তো আমার চিকিৎসক হওয়াও হত না, আর এই এত সম্পত্তি, এই বাড়ি এই ঐশ্বর্যের মালিক হওয়াও হত না। আমার দুই ছেলে, তারা মোটা মাইনের চাকরি করে পঞ্চকোট স্টেটে। পঞ্চকোটের রাজা তাদের ডেকে চাকরি দিয়েছেন। সবই সেই রাত্রের ঘটনার জন্যে। সেই রাত্রে যদি আমি অমন বিপদে না পড়তাম, তাহলে সারাজীবন বোধ হয় যেন তিলকচাঁদ আর চতুরাননজীর মত খাতা লিখেই সেই গদিবাড়িতেই কাটাতে হত আমাকে।

—তারপর ?

তিনকড়িবাবু বলতে লাগলেন, মানুষের সংসার সম্বন্ধে আমার আগে কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। বাইরে থেকে যা দেখতাম সেইটেকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু চোখের দৃষ্টির আড়ালে যে আর একটা সংসার আছে যেখানকার আইনকানুন সম্পূর্ণ আলাদা, সেটা চোখে দেখতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার যে সবখানিই সত্যি তাতেও তো সন্দেহ নেই। বড়লোকদের আগে আমি যে-চোখ দিয়ে দেখতাম সেই ঘটনার পর থেকে তা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

মনে আছে আদালতে সেদিন ভীষণ ভিড়। চারিদিকে চোখ চেয়ে চাইতেও আমার লজ্জা হচ্ছিল। আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রেলিংটা ধরে থর থর করে কাঁপছিলাম।

ওদের উকিল জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি আসল ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে না ঢুকে যে তার পাশের বাড়িতে ঢুকেছিলে, সেটা কি ইচ্ছে করে ?

আমার তখন বুক-পা-হাত সমস্ত শরীর কাঁপছিল।

বলেছিলাম, আমি জানলে ও-বাড়িতে ঢুকতাম না।

—সরযূপ্রসাদের কাছে কখনও তুমি টাকা ধার নিয়েছিলে ?

বলেছিলাম, সরযূপ্রসাদের নামই কখনও শুনি নি আমি—দেখা বা টাকা ধার করা দূরের কথা।

—কত টাকা মাইনে পাও তুমি ঘনশ্যামবাবুর গদিতে ?

—সাত টাকা।

—সাত টাকায় তোমার চলে কী করে ? নিশ্চয় টাকা ধার করতে হত ?

—দাদাও চাকরি করেন, দুজনে মিলে অতি কষ্টে-স্বষ্টে সংসার চালাই আমরা।

—কখনও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয় নি তোমার ? বড়লোকদের মত গাড়ি চড়তে ইচ্ছে হয় নি ?

—ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু ভগবানের ওপর ভরসা করে বেঁচে আছি, তিনি যদি দেন তো বড়লোক হব।

—বড়লোক হবার জন্যে কখনও বড়লোকদের টাকা সরিয়ে নেবার মতলব হয় নি তোমার ?

—আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত লোক, আমাদের অত সাহস নেই।

—সাহস থাকলে পারতে ?

এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব বলুন ! সাহস থাকলে তো সবই পারতাম। সাহস থাকলে কি আর সাত টাকা মাইনের চাকরিই করতাম গদিবাড়িতে !

আপনি হয়ত ভাবছেন কোর্টের ব্যাপার কীসে এল—আমিই বা কাঠগড়ায় আসামী হতে গেলাম কেন ?

আমার দাদাও তাই ভেবেছিল। শুধু দাদা নয়। জানা-শোনা পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবাই সেদিন সেই কথাই ভেবেছিল। সারাজীবন ধরে চাকরি করব আর শান্তশিষ্টের মত মাসকাবারে মাইনেটা এনে বাড়িতে দেব, এইটেই চিরাচরিত জীবনযাত্রার আদর্শ চিত্র। এই মানুষকেই সবাই সম্মান করে, প্রশংসা করে। এমন লোককেই মানুষ জামাই করতে চায়—এমন লোকেরই পরিচয় দিতে আনন্দ হয়। কিন্তু খুনের আসামী ?

উকীল আরও জিজ্ঞেস করেছিল, সরযূপ্রসাদকে তুমি অনুসরণ করেছিলে কোথা থেকে ?

বললাম, আমি তাকে অনুসরণ করি নি।

—তাহলে এত বাড়ি থাকতে, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি কাছে থাকতে, ওই জয়ন্তীয়াদের বাড়িতেই বা তার পেছন-পেছন ঢুকেছিলে কেন?

বললাম, তার পেছন-পেছন তো ঢুকি নি।

—তাহলে কী করে সদর উঠোন পেরিয়ে একেবারে ভেতর-বাড়ির অন্দর-মহলে, একেবারে মেয়েমহলে ঢুকেছিলে?

বললাম, ভুল করে।

—আচ্ছা ধরে নিলাম ভুল করে। কিন্তু বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে তখন বাড়ির সবাই চলে গিয়েছিল এ-কথা জানলে কী করে?

—আগে জানতাম না। দুজনের কথাবার্তায় জানতে পারলাম।

—তখন বুঝি ঠিক করলে যে সরযূপ্রসাদের ওপর চরম প্রতিশোধ নেবার ওই-ই সুযোগ?

—আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা আমি ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমার আসল উদ্দেশ্য ছিল সরযূপ্রসাদের উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়া, তাই সন্দেহ এড়াবার জন্যে তুমি ঘনশ্যামবাবুর হিসেবের খাতা নিয়ে ও-বাড়িতে গিয়েছিলে—এই না?

বললাম, আমাকে পণ্ডিতজী ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যেতে বলেছিলেন বলেই গিয়েছিলাম—আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমার।

—কিন্তু কী করে জানলে যে তোমার মহাজন সরযূপ্রসাদও ঠিক সেই সময় ও-বাড়িতে যাবে?

বললাম, সরযূপ্রসাদ তো আমার মহাজন নয়।

এ-সব আইনের কূট তর্ক শুনিয়ে আমি আপনাদের বিরক্ত করব না। এ-সব পরের ঘটনা। কিন্তু জীবনে পরে ঘটলেও আগেই তো তার বীজ পোঁতা হয়ে যায়। কবে আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে নিয়ে কী খেলা খেলবেন বলে যে ভিত তৈরি করেছিলেন তা তো কারও জানবার কথা নয়। আমরা মানুষ তাই হঠাৎ বিপদের দিনে মুষড়ে পড়ি। হঠাৎ দুর্ঘটনায় আমরা বিচলিত হয়ে উঠি। কিন্তু সেদিন কী জানতাম সে রাত আমার একদিন পোহাবে, সে বিপদ থেকেও একদিন উদ্ধার পাব। সেদিনের দুর্ভাগ্যের সময়ে কিন্তু মনে হয়েছিল এর থেকে কোনও দিনই আর মুক্তি পাব না। সে-সব দিনের আমার মনের অবস্থা যদি বর্ণনা দিই তো ভাববেন আমি পাগলই বা হয়ে যাই নি কেন! মাথার ওপর অত বড় সংসার, বাড়িতে অবিবাহিত বোন, স্ত্রী—তারপর আছে লোকলজ্জা, সমাজের চোখে—সমস্ত!

যা'হক পরের কথা পরে হবে। আগে সেই রাত্রের কথা বলি।

আবার সেই ঘরে এসে দাঁড়ালাম। ভাবলাম যাদের গলা শুনতে পাচ্ছি তাদের তুজনের মধ্যে কেউ-না-কেউ হয়ত আমাকে দেখতে পাবে। যদি ঘরের বাইরে আসে একবার জিজ্ঞেস করব ঘনশ্যামবাবুকে কোন্ ঘরে গেলে পাব।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ যেন একটা চাপা গোঙানির শব্দ কানে এল।

সেই তুজনের কথাবার্তা যেমন চলছিল তা আর নেই।

আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক পরে গোঙানির শব্দ আস্তে আস্তে থেমে এল। মনে হল সমস্ত বাড়িটা যেন হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়ির সাত টাকা মাইনের খাতা-লেখা কেরানী সেই টিম্‌টিমে আলোর নীচে নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে। তার মাথাটা ঘুরতে লাগল হঠাৎ। কী হল ভেতরে! এতক্ষণ এত ঝগড়া চলছিল—সব তো এমন করে থেমে যাবার কথা নয়। কী হল হঠাৎ! সব নিস্তব্ধ। বাইরে পূজো-বাড়িতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজলেও তা তখন সেখান থেকে আর শোনা যাচ্ছে না। কিম্বা হয়ত তখন আর তা কানে পৌছোবার মত অবস্থা নয়।

হঠাৎ ভেতরের দিকে একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল।

আর দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসছিল।

তিনকড়িবাবু অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন মেয়েটার ভয়ার্ত চোখ তুটো তাঁকে দেখেই হঠাৎ চমকে উঠেছে।

—কে?

তিনকড়িবাবু বললেন, মেয়েটার চোখে মনে হল সুর্মা আঁকা। কিম্বা চোখ তু'টোতে যেন কে কালি লেপে দিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলাম না কোন্‌টা ঠিক। ফরসা টক্‌টক্ করছে গায়ের রঙ। সে রঙ কী-রকম কী করে বলব। পাকা আমের এক-একটা রঙ থাকে যা হলদেও নয় লালও নয়—অথচ সাদাও নয়। তিনটে রঙ মিলে একরকম রঙ হয়—এ-ও ঠিক তেমনি। আর কত রকম-যে গয়না গায়ে সব নামও তার জানি না। কানে গলায় নাকে হাতে সব জায়গাটা সোনায় মোড়া। আমি নিজে গরীব হলেও দূর থেকে তো অনেক মেয়েদেরই দেখেছি। জানালার ফাঁক দিয়ে কত বউকেও দেখেছি। অত ফরসা রঙও দেখি নি কখনও আগে—অত গয়নাও দেখি নি। মনে হল মেয়েটা

যেন এতক্ষণ কথা বলে বলে ঝগড়া করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর আমাকে দেখেই চম্‌কে উঠেছে। ভাবলাম—চম্‌কানোটাই স্বাভাবিক। একেবারে অন্দরমহলের মধ্যে অচেনা অজানা পুরুষমানুষ দেখলে আজকালকার বাঙালী মেয়েরাও চম্‌কে উঠত। ওর আর অপরাধটা কী। অপরাধ তো আমারই। আমিই না বলেকয়ে ঢুকে পড়েছি এখানে।

—কে? কোন্ হ্যায়? কে আপনি?

কিছুক্ষণ কোনও কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরোল না। আমি ভাবছিলাম যদি তখন কোনও পুরুষমানুষ ঢুকে পড়ে আমাকে সেই অবস্থায় দেখতে পায় তো আমার কী দশা হবে। কী কৈফিয়ৎ দেব তাকে? এতক্ষণ যে পুরুষটার গলা শুনছিলাম সেই-ই যদি বেরিয়ে এসে হঠাৎ দরোয়ান ডাকে। এসেছি ঘনশ্যামবাবুর কাছে গদির কাজে, এ-কথা বললে কেউ-ই শুনবে না। ভাববে নিশ্চয়ই কোনও মতলব ছিল আমার। নইলে সদর ছেড়ে অন্দরে ঢুকিই বা কেন? এত লোক-লস্কর, এই সদর-গেটের পূজো-বাড়িতে জিজ্ঞেস করে অন্তত আসতে পারতাম! তারাই বলে দিতে পারত ঘনশ্যামবাবুর ঘর কোন্ দিকে। কিম্বা বললেই তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসত আমাকে। আমি কোন্ সাহসে ভেতরে ঢুকে পড়েছি? আমাকে তারা গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারে। কিম্বা পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিতে পারে। ঘনশ্যামবাবুই একমাত্র ভরসা আমার। কিন্তু ঘনশ্যামবাবুই কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন? হয়ত আমার চাকরিই চলে যাবে এই অপরাধে।

কিন্তু মেয়েটা তখনও আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

অনেক কষ্টে বললাম, আমি ঘনশ্যামবাবুর কাছে এসেছি।

—কোন্ ঘনশ্যামবাবু?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। ঘনশ্যামবাবুর নামটাই তো যথেষ্ট। মেয়েটি হয়ত ঘনশ্যামবাবুরই মেয়ে। অথচ ঘনশ্যামবাবুর নাম বললেও চিনতে পারছে না।

বললাম, দর্মাহাটায় যে ঘনশ্যামবাবুর গদি আছে—

মেয়েটি যেন নিজেকে হঠাৎ সামলে নিলে। এক মুহূর্তে তার চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল। মনে হলো তার মুখ-চোখ যেন আরও লাল হয়ে উঠেছে। যেন এতক্ষণে চিনতে পেরেছে। যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে আমি একেবারে অনাহূত নই। একেবারে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার মত লোক আমি নই। বিশ্বাস করা যায় যেন আমাকে।

আবার বললাম, ঘনশ্যামবাবুর কাছেই এসেছি—এই খাতাগুলো সই করাতে।

মেয়েটি বললে, ও, আপনি বসুন।

বসবার অবস্থা তখন আমার নয়। অত সাহস তখন আমার নেই। পা দুটো ব্যথা করছিল—টন টন করছিল—থর থর করে কাঁপছিল। বসে পড়তে পারলেই যেন বাঁচতাম। বসতে পারলেই শান্তি পেতাম, স্বস্তি পেতাম।

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর ঘরটা আমায় দেখিয়ে দেবেন ?

মেয়েটি হেসে উঠল। তার হাসিটাও খুব চমৎকার লাগল।

বললাম, হাসছেন যে ?

সত্যিই বলছি, মেয়েটির মুখে হাসি দেখে তখন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। এমন ভাবে আপ্যায়িত হব আশা করি নি। এত বড়লোকের মেয়ে—আমার দিকে চেয়ে এমন করে হেসে কথা বলবে এ তো ভাবতেই পারা যায় না।

বললাম, বাইরের লোকজনদের জিজ্ঞেস করতে তারা ভেতরে আসতে বললে।

নিজের অপরাধের মাত্রাটা কমানোর জন্যেই বোধ হয় কিছু ওজুহাত দিতে যাচ্ছিলাম।

মেয়েটি বললে, আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

বললাম, অনেকক্ষণ।

—অনেকক্ষণ ?

বললাম, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ! বাড়িতে কেউ নেই বোধ হয় এখন, তাই কাউকেই দেখতে পেলাম না ভেতরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে চারিদিকে ঘোরাফেরা করতে করতে দেখলাম এই ঘরে আলো জ্বলছে, তাই ঢুকেছিলাম।

মেয়েটি এবার যেন কী ভাবলো।

বললে, কতক্ষণ ঢুকেছেন আপনি—আধঘণ্টা হবে ?

বললাম, তা হবে—আধঘণ্টার বেশিও হতে পারে।

—ঘরের মধ্যে আমরা কথা বলছিলাম, শুনতে পেয়েছেন ?

বললাম, হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি।

কথাটা শুনে মেয়েটি যেন কী-রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

যেন আমার কথা শুনে চম্‌কে উঠল একটু। যেন ভয় পেলে।

আবার জিজ্ঞাসা করলে, কী শুনেছেন ?

বললাম, তা জানি না—আপনারা কথা বলছিলেন। মনে হল আপনাদের কাউকে দেখতে পেলে ভাল হয়।

—আপনি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন ? ডাকলেন না কেন ?

বললাম, আমার ভয় করছিল খুব।

মেয়েটি বললে, আমাদের কথা শুনে ভয় করছিল ?

বললাম, না।

—তবে ?

—ভাবছিলাম, বাইরের পুরুষমানুষ হয়ে একেবারে আপনাদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছি।

—কে আপনাকে ঢুকতে দিলে ?

বললাম, কাউকে তো সামনে পেলাম না—একজন-দুজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা ভেতরে আসতে বললে।

—সদরের সিঁড়ি পেলেন না ?

বললাম, অন্ধকারে কোন্‌টা সদর, কোন্‌টা অন্দর ঠিক ঠাহর করতে পারি নি।

—তাই সোজা অন্দরে চলে এলেন ?

বললাম, আমাকে মাফ করবেন—আমি জানতাম না।

—কী জানতেন না ? কোথায় থাকেন আপনি ? কোথায় চাকরি করেন ? কী করতে এসেছেন ?

একসঙ্গে পর পর এতগুলো প্রশ্নে আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। এখন যদি চিৎকার করে দরোয়ান ডাকে! পুলিসে ধরিয়ে দেয়! আমি কী জবাবদিহি করব ? পুলিসে ধরিয়ে দিলে সারারাত সারাদিন হয়ত হাজতে আটকে থাকব। দাদাকে খবর দেবে কে ? কী করবে তারা ? আমি বাড়িতে না গেলে দাদা যে ভাববে! স্ত্রীও যে ভাববে! সবাই-ই ভাববে। তারপর যদি বা খবরই পায় তো উকিল-মোক্তার-কাছারি কে করবে! টাকা আসবে কোথা থেকে ? আর বদনাম! আমি সকলের অসাক্ষাতে বাড়ির মেয়েদের মহলে ঢুকে পড়েছি কোন্ মতলবে—তা কারো জানতে বাকি থাকবে না। পাড়ার লোকের কাছে, সমাজে, শ্বশুরবাড়িতে, বাড়িতে মুখ দেখাব কেমন করে ? গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া যে আমার কোনও গতিই থাকবে না। আমি সকলের চোখে ছোট হয়ে যাব। আমার কোনও সম্পদ নেই। কোনও ঐশ্বর্য নেই। বলবার মত, ঘোষণা করবার মত কোনও কিছু নেই। আছে

কেবল আত্মমর্যাদা জ্ঞান। মধ্যবিত্ত মানুষের আর কী থাকতে পারে সমাজে? উপোস করে থাকলেও বাইরে তা প্রকাশ করতে আমার বাধে। আমার অভাবের কথা দশজনকে বলতে আমার গলায় আটকে যায়। আমি আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখি—আমার দারিদ্র্য ফরসা জামা-কাপড়ে চাপা রাখতে চেষ্টা করি। কেউ যেন আমার কোনও ত্রুটি জানতে না পারে, কোনও ফাঁক টের না পায়।

কিন্তু এর পরে তো সব প্রকাশ হয়ে পড়বে, সব জানাজানি হয়ে যাবে। রাস্তায় পাড়ার সবাই তো আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাবে। বলবে, ওই সেই লোকটা যাচ্ছে—ওই সেই লোকটা চলেছে।

তখন টিটকিরি দেবে সবাই। হাসি ঠাট্টা তামাশা করবে চারদিক থেকে। কেউ আর বাকি থাকবে না তখন। যে চিনত না এতদিন, সে-ও চিনে ফেলবে।

মেয়েটির মুখের চেহারা তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। একটু আগেই যে-মুখের চেহারা দেখে একটু আশা হয়েছিল, সে মুখখানাই আবার দেখে ভয় পেতে লাগল। যেন আমার এই অনধিকার প্রবেশে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি ধমকের সুরে বললে, বলুন—কোথায় থাকেন আপনি? কোথায় চাকরি করেন?

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর গদিতে।

মেয়েটি বললে, ঘনশ্যামবাবুর গদিতে চাকরি করেন তো এ বাড়িতে কী? এ বাড়িতে কেন? বলুন, কী মতলবে এসেছেন?

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি এটা নয়?

আমি যেন অবাক হয়ে গেলাম। তবে এ কোথায় এসেছি? পণ্ডিতজী তো আমাকে ঠিকানা বলেই দিয়েছিল। সেই ঠিকানা দেখেই তো ঢুকেছি। বাড়িতে ঢোকবার আগে তো ঠিকানাটা ভাল করে দেখে নিয়েছিলাম। অন্ধকারে অবশ্য ভাল দেখা যায় নি। কিন্তু যতটা দেখা গিয়েছে তাতে তো কোনও ভুল হবার কথা নয়। শেষকালে এমন ভুল করব! কটন স্ট্রীট দিয়ে ঢুকে একে একে তো সব বাড়ির নম্বরগুলোই দেখতে দেখতে এসেছিলাম লাল রং-এর বাড়ি। পঁচাত্তরের দুই নম্বর। চারতলা বাড়ি, সামনে সবুজ-সাদা রেলিং। কোনও বিষয়েই তো ভুল হবার কথা নয়।

ভয়ে আমার সমস্ত শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। মনে হল সেখানেই হয়ত অচৈতন্য হয়ে পড়ব।

আবার বললাম, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি এটা নয় ?

মেয়েটি বললে, না।

তা হলে! আমি তো ভুল করেছি! কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমি ভুল করেছি। সবাই বলবে আমি জেনেশুনে ইচ্ছে করে এখানে এই বাড়িতে এসেছি।

বললাম, তাঁর বাড়িটা কোথায় তবে ?

মেয়েটি বললে, তা আমি জানি না।

ভাবুন, সেই অবস্থায় আমার মনটা কেমন হতে পারে! মনে হল দু'হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে যাই। কিন্তু পালাবার পথও যে তখন বন্ধ।

মেয়েটি বললে, আপনার নাম কী ?

নাম বললাম।

মেয়েটি বললে, আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

বললাম, অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে ভেতরে আপনাদের কথা শুনছিলাম।

মেয়েটি বললে, কী কথা শুনেছেন ?

বললাম, সব কথা তো বুঝতে পারি নি। দুজনে কথা হচ্ছিল আপনাদের, একজন আর একজনকে বকছিলেন।

মেয়েটি বললে, বকাবকি কেন হচ্ছিল বুঝতে পেরেছেন কিছু ?

বললাম, আমি কী করে বুঝব ? আমি তো আপনাদের চিনি না। চিনলে হয়ত আপনাদের কথা বুঝতে পারতাম।

মেয়েটি বললে, পরের বাড়ির ভেতর ঢুকে পরের কথা কান পেতে শুনতে আপনার লজ্জা করে না ?

বললাম, আমি তো জানতাম না—আমি না-জেনে এখানে ঢুকে পড়েছিলাম।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু আপনি সাড়া দেন নি কেন ?

বললাম, আমি তো আপনাদের কাউকেই চিনি না, কাকে ডাকব বুঝতে পারছিলাম না।

মেয়েটি বললে, দরোয়ানকে ডাকলেন না কেন ? দরোয়ান তো নিচেই ছিল!

বললাম একবার ভেবেছিলাম ডাকব—কিন্তু—

মেয়েটি বললে, কেন ডাকেন নি তা হলে ?

বললাম, রাস্তা ভুলে গিয়েছিলাম। নিচে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, অনেক ঘুরলাম, ঘুরে ঘুরে শেষে আবার এই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

মেয়েটি বললে, আবার এই ঘরে ঢুকতে আপনার ভয় করল না ?

বললাম, কিন্তু কী করব বলুন, আমার যে আর কোনও উপায় ছিল না। এই একটা ঘরেই শুধু আলো জলছিল, এই একটা ঘরেই শুধু লোকের কথাবার্তা চলছিল।

মেয়েটি বললে, আমাদের কথাবার্তা কতটা শুনেছেন ?

বললাম, যতটা কানে এসেছিল সবই শুনতে পেয়েছি, মনে হল কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যেত খুব ভাল হত, আমি দেখা করবার জন্যে ছটফট করছিলাম মনে মনে।

মেয়েটি আবার বললে, কিন্তু ডাকেন নি কেন কাউকে ?

আমি বললাম, ডাকবার যে সাহস হচ্ছিল না। আর, কাকে ডাকব, কাউকে যে চিনি না।

মেয়েটি বললে, যদি আমি বলি, ইচ্ছে করে আপনি ঢুকেছিলেন এই ঘরে !

বললাম, ইচ্ছে করে ঢুকব অত সাহস আমার কী করে হবে ! আমি সামান্য মাইনের চাকরি করি ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়িতে। সাত টাকা মাইনে পাই, আমার বাড়িতে অনেকগুলো লোক, দাদার আর আমার মাইনেতে সংসার চলে।

বলতে বলতে বোধ হয় আমার কান্না বেরিয়ে গিয়েছিল চোখ দিয়ে। শুধু চাকরির ভয় নয়, শুধু সংসার অচল হওয়ার আশঙ্কা নয়, অন্য ভয়ও ছিল। মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল—খুব তেজ যেন চেহারায়। এতক্ষণ এই মেয়েটির গলাতেই তেজ ফুটে উঠছিল। সরযূপ্রসাদকে এই মেয়েটিই তেজের সঙ্গে বকাবকি করছিল। যার এত তেজ সে-মেয়ে সব করতে পারে। আমাকে পুলিসের হাতেও দিতে পারে।

বললাম, এবার দয়া করে আমাকে যেতে দিন।

মেয়েটির চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল।

বললে, না।

আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম।

মেয়েটি বললে, আপনি কোথায় থাকেন ?

বললাম, ভবানীপুরে, চাউলপটিতে—এখান থেকে অনেক দূরে। আমাকে আবার হেঁটে যেতে হবে।

মেয়েটি বললে, কেন ? হেঁটে কেন ?

বললাম, ট্রামে যেতে গেলে অনেক পয়সা লাগে।

মেয়েটি বললে, পয়সা নেই কিন্তু সাহস তো খুব আছে!

একটা কড়া বিদ্রূপ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল।

মেয়েটি বকতে লাগল, এত বড় বিরাট বাড়ির ভেতরে, লোকজন গম্ গম্ করছে, একেবারে বলা-কওয়া নেই, ভেতরে ঢুকে পড়েছ? বেয়াদব, বেতমিজ, বেওকুফ্ কোথাকার!

মেয়েটির সমস্ত গালাগালি মাথা পেতে সহ্য করতে লাগলাম। আমি এর কী প্রতিবাদ করব। আমি এর উত্তরেই বা কী বলব! আমাকে তখন দু'ঘা জুতো মারলেও আমার কিছু বলবার ছিল না। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু।

মেয়েটি আবার বলে যেতে লাগল, লজ্জা করে না পরের বাড়ির অন্দর-মহলে ঢুকতে! লজ্জা করে না পরের বাড়ির মেয়েদের মহলে ঢুকে ঘরের কথা শুনতে!

বললাম, আমাকে আপনি যেতে দিন দয়া করে। আমি না-জেনে ঢুকেছি, বলছি তো।

মেয়েটি বললে, কখ্খনো যেতে দেব না।

বললাম, আমি তো বলছি, আমি না জেনে ঢুকে পড়েছি।

মেয়েটি শাসিয়ে উঠল। বললে, আবার?

বললাম, কেন, গালাগালি দিচ্ছেন কেন, ডাকুন কাকে ডাকবেন। আমি সব কথা খুলে বলব।

আমার যেন তখন মরীয়া অবস্থা হয়েছিল।

বললাম, আমি কিছু অন্যায় করি নি। কী করবেন করুন আমাকে।

মেয়েটি বললে, অন্যায় করে আবার কথা! আবার জোর করছে!

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর কাছে আমাকে যেতেই হবে, দেখা করতেই হবে আজ।

মেয়েটি বললে, ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি এটা নয়।

বললাম, তা হলে আমি সেখানেই যাচ্ছি, আমায় চলে যেতে দিন।

মেয়েটি আমার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

বললে, কী করে যাবে দেখি তুমি—যাও—

বললাম, কেন আমাকে এমন করছেন, আমি কী করেছি আপনার? আমি তো কিছু বলি নি—আমি তো কোনও অপরাধ করি নি! আমাকে কেন অমন করছেন আপনি?

মেয়েটি তখনও পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে, খুব তো কথা! দোষ করে আবার কথা বলা হচ্ছে!

আমি বললাম, আমি আর আপনার কথা শুনতে চাই না, আমায় আপনি ছেড়ে দিন। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না।

কী জানি কী হল। হঠাৎ মেয়েটি ক্ষেপে গেল যেন। আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মারলে। চড়টা আমার গালে পড়ে কেটে একেবার চৌচির হয়ে গেল। আমি বিস্ময়ে ভয়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

মেয়েটি তখনও রাগে ফুলছে। গাল দুটো লাল হয়ে উঠল আরও।

বললে, আমার মুখের ওপর কথা, বোস ওখানে, চুপ করে বোস।

আমি বসে পড়লাম চেয়ারটার ওপর। আমার চোখ দিয়ে এবার অঝোর-ধারায় কান্না ঝরে পড়তে লাগল। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। কী করব আমি, কাকে ডাকব? কে এসে আমার এ অবস্থা থেকে আমায় বাঁচাবে?

বসবার পরেই মেয়েটি আবার একটা চড় মারলে আর একটা গালে।

আমি টলে টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। হয়ত পড়েই যাচ্ছিলাম। পড়ে গেলে আমার চশমাটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই মেয়েটি আমায় ধরে ফেলেছে।

বললে, ঠিক হয়ে বোস।

কথা বলতে গেলাম। কিন্তু মনে হল মুখ যেন আমার ভেঙে গেছে। সমস্ত মুখে অসহ্য ব্যথা। সমস্ত শরীর টলছিল। টনটন করছিল ব্যথায়। আমার মাথা সোজা রাখতে পারছিলাম না। আমার মাথা ঘুরছিল।

ভাবলাম মেয়েটি বোধ হয় এবার কাউকে ডাকবে। ডেকে আমাকে পুলিসের হাতে দেবে। পুলিসের হাতে দিলেই যেন আমি বেঁচে যাই। রাত অনেক হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। বাড়ির বাইরে সদরে পুজোর কাঁসরঘণ্টা বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। এত রাত্রে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আশা আর নেই। হয়ত তিনি টেলিফোন করেছেন আপিসে। সেখানে লোকজন থাকে সারারাত। তারা হয়ত বলবে, গদি বন্ধ করে বাবুরা চলে গেছে সব। কেউ নেই সেখানে। ঘনশ্যামবাবু খুব রেগে যাবেন। কিন্তু কী করা যাবে!

এতক্ষণ বাড়িতেও সবাই ভাবছে। অন্য দিন এই সময়েই হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। দাদা বোধ হয় এতক্ষণ এসে গেছে। ভাবছে,

এখনও এল না কেন তিনকড়ি। আমি গেলে তবে একসঙ্গে খেতে বসি। বরাবরের তাই নিয়ম। আজ দাদা বসে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে। তারপর বাইরের চাউলপটি লেনের গলির মুখটা দেখবে। তারপর হয়ত দিদিকে জিজ্ঞেস করবে, বউমাকে জিজ্ঞেস কর তো রে, তিনকড়ির আজ দেরি হচ্ছে কেন এত ?

আমার স্ত্রী ভাবছে এখন। বাইরে কিছু প্রকাশ করবে না সে। বাইরে থেকে কেউ তার মনের কথা জানতে পারবে না। বড় চাপা, বড় স্বল্পভাষী আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রী কোন কথাই বলবে না। জানবেই বা কী করে যে আমি এই বিপদের মধ্যে পড়েছি। আমার তো জানা ছিল না যে এখানে আমাকে আসতে হবে আজ। রোজকার মত ঠিক সময় বাড়ি যাব, এইটেই আমি জানতাম।

মেয়েটি বললে, বাড়িতে তোমার কে কে আছে ?

বললাম, সবাই আছে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, বউ আছে ?

বললাম, আছে।

—ছেলে-মেয়ে ?

বললাম, এখনও হয় নি।

এবার বললে, বাবা ?

বললাম, না। কিন্তু বিয়ে দেবার মত বোন আছে দুজন, দাদা আছে, বউদি আছে, তারা খুব ভাবছে এখন। আপনি ছেড়ে দিন আমাকে, আমি চলে যাই, দয়া করে ছেড়ে দিন।

মেয়েটির দিকে চেয়েই কথাগুলো বললাম। দেখলাম ভাল করে। বড়লোকের মেয়ে। সারা গায়েই গয়না। পিঠের দিকে বেণীটা দুলছে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে রাগে। রাগে যেন ফুলছে।

হঠাৎ বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ হল।

মেয়েটি চমকে উঠল এক নিমিষে। হঠাৎ তার চোখ-মুখের চেহারাটা যেন একেবারে বদলে গেল। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে খিল দিয়ে দিলে নিঃশব্দে। তারপর খানিকক্ষণ কী যেন কান পেতে শুনতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগল।

তারপর দরজাটা কে যেন ঠক্ ঠক্ করে নাড়তে লাগল। তারপর কড়া নাড়তে লাগল।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে দেখলাম। ভয়ে যেন তার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে পেছন ফিরে দরজার দিকে মুখ করে কী যেন শুনতে লাগল। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালে।

কথা বলতে গেলাম। ভাবলাম বলব, কে ডাকছে বাইরে।

মেয়েটি হঠাৎ নিজের হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরলে।

ইঙ্গিতে বললে, চুপ।

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার কাছে গোড়া থেকে সমস্তটাই রহস্য মনে হচ্ছিল। কে এ মেয়েটা! নাম তো ভেতরের কথা থেকে বুঝেছিলাম—জয়ন্তীয়া। কিন্তু জয়ন্তীয়া এ বাড়ির কে? কেনই বা এতক্ষণ সরযূপ্রসাদের সঙ্গে ঝগড়া করছিল। আর যদি ঝগড়াই করছিল তো এখন হঠাৎ ঝগড়া থেমেই বা গেল কেন? আর সেই সরযূপ্রসাদ? এতক্ষণ যে কথা বলছিল, ঝগড়া করছিল, সেই বা কোথায়? ঘরের ভেতরে সে লোকটা একলা চুপ করে রয়েছে কেন? সে ঘরের ভেতরে একলা কী করছে? সে-ই বা একবার বাইরে আসছে না কেন? সে কি শুনতে পাচ্ছে, এই এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো হল!

বাইরে তখনও কড়া নাড়ছে।

মেয়েটি আমার মুখ চেপে রয়েছে জোরে। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে মেয়েটা। জোরে হাতের পাতা দিয়ে ধরেছে আমার মুখটা, যাতে আমি কথা না বলতে পারি। মেয়েটি যেন আতর মেখেছিল, তার গন্ধে যেন আমার নেশা লেগে গেল। আমার মনে হল আরও অনেকক্ষণ মেয়েটি মুখটা ধরে থাকুক। এ এক অনুভূতি আমার। আমার সমস্ত ভয় চলে গেল। তখন আর আমার বিপদের কথা মনে নেই। ঘনশ্যামবাবুর কাছে খাতাতে সই নেবার কথাও মনে নেই। বাড়িতে কারা আমার জন্যে বসে বসে ভাবছে সে কথাও মনে নেই, শুধু মনে হচ্ছিল সেই অস্বাভাবিক অবস্থার কথা। হাতে বোধ হয় তার আলতা মাখানো ছিল, কিম্বা মেহেদী পাতার রঙ। রক্তের মত লাল। তার হাতের রঙ আমার মুখে গলায় হাতে লেগে গিয়েছিল। আমি হাত দিয়ে মুখটা ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। জয়ন্তীয়া আরও জোরে টিপে ধরেছে। এত জোর তার গায়ে, মনে হল আমার দম আটকে আসবে যেন। বলতে গেলাম—ছাড়ুন। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দই বেরোল না।

মনে হল দরজার বাইরে যে এতক্ষণ কড়া নাড়ছিল সে বোধ হয় চলে গেল। আর শব্দ হচ্ছে না।

জয়ন্তীয়া অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলে। তার পর আস্তে আস্তে আমার মুখটা ছেড়ে দিলে।

ইঙ্গিতে আবার মুখে হাত দিয়ে বললে, চুপ।

আমিও কথা বলতে সাহস পেলাম না।

জয়ন্তীয়া যেন অনেকক্ষণ বাইরের দিকে কান পেতে রইল। কোনও সাড়া-শব্দই আর নেই কোথাও।

তারপর আমার কাছে এসে মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললে, চুপ করে বসে থাক। আমি এখুনি আসছি।

বলে দরজার কাছে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়াল। কী যেন শুনতে লাগল। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

আমারও কী মতিচ্ছন্ন হল। আমি দরজাটা খিল দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে আবার চেয়ারটায় এসে বসলাম।

অনেকক্ষণ নিজের মনেই বসে ছিলাম। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আবার আসবে জয়ন্তীয়া। যতক্ষণ না আসবে, ততক্ষণই বসে থাকতে হবে। কিন্তু খানিক পরেই মনে হল যেন মেয়েটা আসতে অনেক দেরি করছে। যেন কল্পান্তকাল বসে আছি তার অপেক্ষায়। যেন সময়ের আর শেষ নেই। যেন নিরবধি কাল ধরে বসে আছি এক জায়গায়।

খানিক পরেই অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হল যেন অনেক রাত হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমি উঠলাম।

উঠে কী করব ভাবলাম। দরজার খিলটা খুলব?

ভেতরের দিকের দরজাটা তখনও ভেজানো ছিল। মনে হল ভেতরে সেই লোকটা কী করছে? সেই সরযূপ্রসাদ! সে লোকটা এতক্ষণ চুপ-চাপ বসে আছে নাকি! সে তো কিছুই কথা বলছে না!

হঠাৎ যেন বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল আবার।

জয়ন্তীয়া এসেছে!

খিলটা খুলতেই কিন্তু চমকে উঠলাম। জয়ন্তীয়া নয়, অন্য লোক। লম্বা-চওড়া চেহারা।

আমাকে দেখে সে-ও যেন অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে, কে আপনি?

বললাম, আমি ঘনশ্যামবাবুর গদিবাড়ির লোক।

লোকটা বললে, ঘনশ্যামবাবু! তিনি তো পাশের বাড়িতে থাকেন। এ বাড়ি নয়।

বললাম, আমি সেখানেই যাব, ভুল করে এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। আমি আগে কখনও আসি নি। নতুন লোক আমি।

লোকটা আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগল।

বললে, কে নিয়ে এল আপনাকে এ ঘরে?

বললাম, আমি নিজেই এসেছি। সদরে যাকে জিজ্ঞেস করলাম সে-ই বললে ভেতরে আসতে।

আবার সেই একই ধরনের প্রশ্ন, একই ধরনের উত্তর। জয়ন্তীয়াকে একবার অনেকক্ষণ ধরে এই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম। তবু কিছুতেই তার শান্তি হয় নি। এই লোকটাকেও সেই সব জবাব দিতে হল।

বললাম, লাল রং-এর বাড়ি দেখে ঢুকেছিলাম, ভেবেছিলাম এইটেই ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি।

লোকটা হিন্দুস্থানী। দরোয়ান শ্রেণীর লোক। আগে এসে পড়লে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু কপালের গ্রহ থাকলে আমি আর কী করব।

দরোয়ানটা বললে, এ কোঠিতে তো কেউ নেই এখন, সব সাদি-বাড়ি গেছে।

বললাম, কেউ নেই?

দরোয়ান বললে, না বাবুজী।

আমি যেন কেমন অবাক হয়ে গেলাম। তবে এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলেছি! কে সেই জয়ন্তীয়া? সে যে আমার মুখ চেপে ধরেছিল! এখনও যে ঘরে তার আতরের গন্ধ লেগে রয়েছে। এখনও যে স্পষ্ট তার চেহারাটা মনে পড়ছে! আর সেই লোকটা? সেই সরযূপ্রসাদ! তার গলাও যে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি নিজের কানে। দুজনে ঝগড়া করেছে। তাহলে সব কি স্বপ্ন!

বললাম, আর সেই তোমার দিদিমণি?

লোকটা বললে, কোন্ দিদিমণি?

বললাম, জয়ন্তীয়া নামে কোনও কেউ নেই বাড়িতে?

লোকটা বললে, সবাই গেছে সাদি-বাড়িতে। কেউ নেই বাবুজী।

বললাম, আমাকে যে এখানে বসে থাকতে বলে গেল এখনি !

লোকটা সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললে, আপনি এ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন কেন ?

আমি বললাম, পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এই একটা ঘরে দেখলাম আলো জ্বলছে তাই এখানে ঢুকেছিলাম।

দরোয়ানটা বললে, কিন্তু খিল বন্ধ করে বসেছিলেন কেন ?

বললাম, তোমার দিদিমণি যে খিল বন্ধ করে বসে থাকতে বলল।

দরোয়ানটা হাসল।

বললে, ঝুট্‌ বাবুজী! ঝুট্‌ বাবুজী! ঝুট্‌! কেউ নেই বাড়িতে। দিদিমণিরা ভি চলে গেছে সাদি-বাড়িতে, এখানে কোই নেহি আছে। আমি একলা তদারক করছি।

বললাম, তাহলে এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমি যখন ঢুকলাম বাড়িতে, তখন সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম ঘনশ্যামবাবু কোথায়, তা সবাই যে বললে ভেতরে আসতে।

দরোয়ানটা বললে, ঝুট বাত বাবুজী, ঘনশ্যামবাবুর কোঠি তো এর পাশে।

বললাম, পঁচাত্তরের দুই নম্বর লাল রং-এর বাড়ি।

দরোয়ান বললে, দুটো বাড়িই লাল রং-এর বাবুজী, আপনি ভুল করিয়েছেন।

আশ্চর্য ভুল তো! এমন ভুলও মানুষের হয়! এই ভুলটুকুর জন্যেই কী দুর্ভোগ পোয়াতে হল। কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু ক্ষোভ রয়ে গেল। আমি গরীব বটে। কিন্তু যত সামান্য সময়ের জন্যেই হোক, একটু স্পর্শ পেয়েছিলাম এক সুন্দরীর। সে কথা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল অনেকক্ষণ। আমি যেন আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার আতরের গন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করতে লাগলাম আমার বুকের ভেতরে। সে বলেছিল, সে আসবে। সে বলেছিল, দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকতে। কেন অপেক্ষা করলাম না? কেন তবে দরজার খিল খুলে দিলাম? এমন ভুল যেন বার বার করতেও ভাল লাগে। মনে হল কালও যেন এমনি ভুল করে এখানে চলে আসি।

সারাজীবন শুধু অভাবের আর অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। চোখ তুলে আকাশের দিকে কখনও চাইবার সময় পাই নি। মনে হয়েছে সে শুধু সময় নষ্ট। মনে হয়েছে আকাশ আমাদের কাম্য নয় বিলাস আমাদের জন্যে

নয়। আমাদের জন্যে শুধু জীবিকার তাড়না। আমাদের জন্যে শুধু জীবন-সংগ্রাম। গাড়িতে, বড়লোকের বাড়ির অন্দরমহলে, দূর থেকে যেটুকু নজরে পড়েছে, তার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি অবশ্য কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা মন থেকে দূর করবার চেষ্টা করেছি প্রাণপণে।

কিন্তু সেদিন মনে হল আমারও জীবন যেন সার্থক হয়েছে। হোক এক মুহূর্তের, কিন্তু স্বর্গের ইশারা যেন পেয়েছি আমি। আকাশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ভেতরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি। আর কী চাই! আর কী চেয়েছিলাম আমি জীবনে!

সমস্ত শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

চোখ বুজে সমস্ত অবস্থাটা আবার যেন গোড়া থেকে কল্পনা করতে ভাল লাগল।

খানিক পরে বললাম, এই দেখ দরোয়ানজী, এই খাতা নিয়ে যাচ্ছিলাম ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি, সই করাবার জন্যে, তাঁর গদিতে আমি কাজ করি কিনা।

দরোয়ানজী বুঝল।

বললে, ঠিক বাত বাবুজী।

বললাম, আমি তাহলে যাচ্ছি, আমাকে বেরোবার রাস্তাটা একবার দেখিয়ে দাও তো।

দরোয়ানজী আমায় ঘর থেকে বার করে আগে আগে চলতে লাগল। চারিদিকে আবার চেয়ে দেখলাম। সেই তেমনি টিম্-টিমে আলো জ্বলছে মাঝে মাঝে। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম। এখনও কেউ ফেরে নি। আমি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম, কোথাও সেই জয়ন্তীয়াকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। কোথাও দাঁড়িয়ে হয়ত উঁকি মেরে দেখছে আমাকে। আমাকে তো তার জন্যে অপেক্ষা করতেই বলেছিল। কেন আমি তবে চলে এলাম! কেন আমি বসে থাকলাম না!

মনে হল পেছনে যদি আবার এসে সে ডাকে!

মনে হল আমাকে আবার গালাগালি দিলেও যেন আমি তৃপ্তি পাই।

আবার সেই সদর-গেট। একেবারে সদর-গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলে দরোয়ানজী। তারপর বাড়িটার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। লাল রঙ-এর বাড়িটাই বটে! সাদা-সবুজ রেলিং ঘেরা বারান্দা; শুধু এই বাড়িটাই নয়। পাশের বাড়িটাও তাই। প্রায় এক-রকমই দেখতে।

কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখলাম। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। অনেক রাত হয়েছে বোধ হয়। ছ'চারটে বিরাট-বিরাট ষাঁড় ফুটপাথের ওপর বসে আছে নিশ্চিন্তে।

ঘনশ্যামবাবুর বাড়িটায় ঢুকতে গেলাম। কিন্তু সামনে তখন তার অন্ধকার। ওপরের দিকেও চেয়ে দেখলাম। কোথাও আলোর কোনও চিহ্ন নেই। বোধ হয় সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভয় হল খুব। হয়ত খুব বকুনি খেতে হবে ঘনশ্যামবাবুর কাছে। পণ্ডিতজী বকবে খুব, কাল যখন শুনবে খাতা নিয়ে আমি যাই নি তাঁর বাড়িতে।

বলবে, তোমার ভালর জন্যেই বাবুর কোঠিতে ভেজেছিলাম তোমাকে, জান্-পছান্ হলে তোমার মাইনে বাড়তে পারে।

আমি বলব, কিন্তু চিনতে পারলাম না যে বাড়িটা ঠিক।

পণ্ডিতজী বলবে, না, বাঙালীবাবুকে দিয়ে হবে না, চতুরাননজী যাবে কাল।

আমি বলব, না পণ্ডিতজী, এবার আমাকেই পাঠান, এবার ঠিক জায়গায় যাব, কাল রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, তাই বুঝতে পারি নি।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। দাদা তখনও খায় নি। অন্ধকার রাস্তার সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে যেন হাতে প্রাণ পেলে দাদা।

বললে, এই যে, তোমার এত দেরি হল যে? আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, পুলিসে খবর দেব নাকি!

বললাম, গদির কাজে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।

দাদা বললে, কেন? ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল কেন?

বললাম, ঘনশ্যামবাবুর অসুখ হয়েছে। তিনি আসতেই পারেন নি গদিতে।

ভেতরে শোবার ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলালাম।

আমার স্ত্রীও এতক্ষণ আমার জন্যে জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দেখলাম তার চোখ ছল্ ছল্ করছে।

বললে, বড় ভাবনা হচ্ছিল তোমার জন্যে, এত দেরি করতে হয়?

বললাম, দেরি কি সাধ করে করি! গদিতে কাজ পড়লে কী করা যাবে? বলে কলতলায় যাচ্ছিলাম।

আমার স্ত্রী বললে, তোমার মুখে গলায় ও কীসের দাগ? রক্ত কোথেকে এল?

বললাম, কই ?

বলে আয়নায় মুখটা দেখলাম হারিকেনের আলোয়।

বললাম, ও কিছু নয়।

বলে কলতলার দিকে চলে গেলাম। মেয়েটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল নিজের হাত দিয়ে, তাই হয়ত তার হাতের মেহেদী রঙ আমার মুখে লেগে গেছে।

সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে মুখের রঙটা পরিষ্কার করে তুলে ফেললাম। তারপর জামা-কাপড় বদলে দাদার সঙ্গে খেতে বসলাম।

পরের দিন সকাল বেলা যথারীতি ছাতা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে যাচ্ছি, আমার স্ত্রী বললে, আজকেও তোমার দেরি হবে নাকি ?

বললাম, এখন থেকে কিছু বলতে পারছি না, আজকে বোধ হয় দেরি হবে না।

বাইরে দাদার সঙ্গে দেখা হল।

দাদাও জিজ্ঞেস করলে, আজকে তোমার দেরি হবে নাকি তিনকড়ি ?

বললাম, আজকে বোধ হয় দেরি হবে না, আজ বোধ হয় পণ্ডিতজী চতুরাননকে পাঠাবে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই বড়বাজারে চললাম। চারিদিকে লোকজন, জনতা, গাড়ি, ঘোড়া সব চলেছে। রাস্তার একপাশ দিয়ে নিজের মনেই ছাতা মাথায় দিয়ে চলছিলাম। আগের দিনের মোহটা তখনও মাথার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। আবার যদি ঘনশ্যামবাবুর বাড়ির নাম করে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ি! আবার যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়! আবার যদি সেই ভুল হয়! আবার যদি সেই ঘটনা ঘটে!

গদিবাড়িতে যেতেই দেখি হৈ-চৈ পড়ে গেছে খুব।

পণ্ডিতজী আমায় দেখেই বলে উঠলেন, কাল ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে যাও নি বাঙালীবাবু ?

চতুরাননজী আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছিল।

বললে, বাঙালীবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিল রাস্তায়, ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিলকুল।

তিলকচাঁদ বললে, বাঙালী-লোক রোটি খায় না, খালি ভাত খায়।

পণ্ডিতজী বললেন, কী হয়েছিল তোমার বাঙালীবাবু ? যাও নি কেন ?

বললাম, বাড়ি চিনতে পারি নি পণ্ডিতজী, গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

পণ্ডিতজী বললেন, কেন ? গোলমাল হল কেন ?

বললাম, পঁচাত্তরের তুই অন্ধকারে খুঁজে পেলাম না, সব এক রকম দেখতে, সব লাল রঙ-এর বাড়ি।

পণ্ডিতজী বললেন, তাজ্জব কি বাত্, একটা কাজ করতে পারলে না। বাবুজী খুব গোসা করেছে, সকালবেলাই টেলিফোন করেছিল।

বললাম, আজ যাব ঠিক পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী বললেন, আজ আর তোমাকে যেতে হবে না বাঙালীবাবু, আজ চতুরাননজীকে পাঠাব।

বললাম, কসুর মাপ করবেন পণ্ডিতজী, আজ আমি ঠিক যাব, আর কাউকে যেতে হবে না।

পণ্ডিতজী খুব রাগ করেছেন মনে হল। মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর।

বললেন, কাম ঠিক মত না করলে বাবুজী আমার ওপর গোসা করে, জরুরী সই নেবার ছিল, সেই সই নেওয়া হল না, এ-রকম করলে কাজ কী রকম করে চলবে গদিবাড়ির ?

মুখে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন অনেকক্ষণ। বুঝলাম খুব ক্ষতি হয়ে গেছে। মুখ বুজে কাজ করতে লাগলাম একমনে। তুপুর বারোটার সময় চা-ওয়ালা এল। সবাই চা খেতে লাগল। আমি চা খাই না। সুতরাং আমি মাথা নিচু করে কাজই করতে লাগলাম। ভাবলাম, আমার আর যাওয়া হবে না সেখানে। কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলাম। আবার যদি সেখানে যেতে পারতাম, অন্তত জানতে চেষ্টা করতাম আগের দিন কে আমার মুখ টিপে ধরেছিল। আগের দিন কার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। জানবার অবশ্য উপায় নেই কোনও। কিন্তু তবু সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে দেখতাম। বাড়িটার চারপাশে ভাল করে পরীক্ষা করতাম। আর সুযোগ পেলে আর একবার ভেতরে ঢুকতাম।

পণ্ডিতজী বোধ হয় অনেকক্ষণ আমার দিকে লক্ষ্য করছিলেন।

বললেন, বাঙালীবাবু!

মুখ তুলে চাইলাম।

বললাম, আজ্ঞে—

পণ্ডিতজী বললেন, আজ ঠিক যেতে পারবে তো বাঙালীবাবু? আজ কোনও কসুর হবে না তো ?

আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম যেন।

বললাম, আজ কোনও গাফিলতি হবে না পণ্ডিতজী, দেখবেন, আজ ঠিক ঠিক যাব।

পণ্ডিতজী বললেন, তাহলে তৈরী হয়ে নাও, পাঁচটার পর সোজা চলে যাবে কটন্ স্ট্রীটে।

সমস্ত শরীরে কেমন অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল আমার। এবার আর ভয় করবে না। এবার সোজা জিজ্ঞেস করব, কাল যে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলে, ও লোকটা কে? কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে? সরযুপ্রসাদ কে? ও কেন আসে? কেন তাকে তুমি টাকা দিয়ে সাহায্য করেছ? তোমার স্বার্থ কী? লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কীসের? লোকটা যদি আসতে না চায় তোমাদের বাড়িতে, কেন তাকে ডেকে আন? লোকটা কীসের জন্যে আসে? তুমিই বা কী চাও আর লোকটাই বা কী চায়?

সমস্ত দুপুরটা যেন একটা চাপা অস্বস্তিতে কাটল আমার। আমি মুখ নিচু করে খাতা লিখতে লাগলাম, কিন্তু মনটা আমার সব সময় অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

চতুরাননজী একবার পাশ থেকে বললে, কী ভাবছ বাঙালীবাবু?

এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছি।

তারপর তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেবার জন্যে আরও দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে খাতা লিখতে লাগলাম। যেন দেরি না হয়। যেন পাঁচটার পর আর বেশিক্ষণ গদিতে না থাকতে হয়।

কিন্তু হঠাৎ একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল।

কয়েকজন পুলিস আর একজন দারোগা সোজা ঢুকে পড়েছে দোকানে। ঘনশ্যামবাবু নেই, তাই সোজা একেবারে পণ্ডিতজীর সামনে এসে হাজির হল।

পণ্ডিতজী, চতুরাননজী, তিলকচাঁদজী, আমি, সবাই অবাক হয়ে গেছি।

পণ্ডিতজীর সামনে এসে দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলে, ঘনশ্যামবাবু কোথায়?

পণ্ডিতজী বললেন, তাঁর অসুখ, তিনি গদিতে আসেন নি কাল থেকে। কী দরকার বলুন, আমি গদির হেড্ মুন্সী।

দারোগা সাহেব সোজা জিজ্ঞেস করলে, তিনকড়ি ভঞ্জ কার নাম?

সামনে আমার দিকে দেখিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, ওই যে—

আমি তখন আকাশ থেকে পড়েছি।

বললাম, আমি।

পুলিস পণ্ডিতজীর দিকে চেয়ে বললে, আমি ওঁকে গ্রেপ্তার করছি।

বলে আমার দিকে এগিয়ে এল সবাই।

পণ্ডিতজী অবাক, চতুরাননজী, তিলকচাঁদজী সবাই-ই অবাক। আমিও যেন হতবাক হয়ে গেছি। মাথার ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়েছে আমার। আমার কোনও জ্ঞান নেই যেন। আমি যেন মাটির তলায় তলিয়ে যাচ্ছি। হাতের কাছে আমার কোনও অবলম্বন নেই যে ধরব। আমি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সব অদৃশ্য হয়ে গেছে আমার চোখের সামনে।

শুধু কানে গেল পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলে একবার, কেন?

পুলিস শুধু বললে, কাল পঁচাত্তরের তিন কটন্ স্ট্রীটের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গেছে।

তিনকড়িবাবু একটু থেমে বললেন, আপনাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছি কবিরাজ মশাই।

বাবা বললেন, না না, আপনি বলুন—তারপর? আপনি কি জেল খাটলেন নাকি?

তিনকড়িবাবু বললেন, বলছি সব, আপনাকে যখন পেয়েছি এখানে, সবই বলব বই কি! সাধে কি বলছিলাম আপনাকে যে আপনি চৌধুরী সাহেবের অসুখ সারিয়েছেন শুনেছি, কিন্তু সারাবার মালিক কি আপনি? ঠিক করে বলুন তো! আমিও তো একদিন এখানে এসেছিলাম, এসেছিলাম ডাক্তারি করব বলে। কিন্তু ডাক্তারির কী জানি যে করব! একটা হোমিওপ্যাথিক বই-ই ছিল কেবল ভরসা।

তবে গোড়া থেকেই বলি শুনুন।

দেওঘরে তখন সস্তা সব জিনিসপত্র। জেল থেকে যেদিন ছাড়া পেলাম কারোর সামনে আর মুখ দেখাবার অবস্থা রইল না আমার।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ক'বছর জেল হলো?

তিনকড়িবাবু বললেন, মানুষ খুন করার অপরাধে আমার ফাঁসিই হবার কথা। অর্থাৎ তিনশো দুই ধারার মতেই আমার বিচার হবার কথা। আমি নাকি সরযুপ্রসাদকে খুন করেছিলাম। আমি নাকি টাকা ধার করেছিলাম সরযু-প্রসাদের কাছে। কে যে সরযুপ্রসাদ, তাকে আমি চোখেও দেখলাম না। আর

কবে যে আমি টাকা ধার করলাম, কত টাকা ধার করলাম তা-ও জানি না। কিন্তু সাক্ষীরা সবাই প্রমাণ করে দিলে আমি গরীব লোক, সাত টাকা মাইনে পাই, আমি সংসার চালাতে পারি না, তাই সরযূপ্রসাদের কাছে আমি টাকা ধার করতাম মাঝে মাঝে। সেই টাকা বেড়ে বেড়ে অনেক টাকা যখন হলো তখন অন্য কোনও উপায় না দেখে আমি সরযূপ্রসাদকে খুন করেছি। সরযূপ্রসাদ তার আত্মীয় বাঁকেবিহারীর বাড়িতে প্রায়ই যেত, আমি তার পেছনে পেছনে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে খুন করেছি।

আমাকে উকিল জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি সরযূপ্রসাদকে খুন করবার জন্যে বহু দিন ধরেই ওর পেছনে পেছনে ঘুরছ ?

আমি বললাম, আমি সরযূপ্রসাদকে কখনও চোখেই দেখি নি।

উকিল বললে, চোখে দেখ নি অথচ ঠিক লোককে খুন করতে তো তোমার ভুল হয় নি ? সরযূপ্রসাদ যে বাঁকেবিহারীবাবুর বাড়ি যায়, এটা তুমি কি করে জানলে ? নিশ্চয়ই কয়েকদিন ধরে ওর পেছনে পেছনে ঘুরেছ ?

উকিল আবার জিজ্ঞেস করলে, তুমি কী করে জানলে যে বাঁকেবিহারীবাবুর বাড়ির সবাই সেদিন আত্মীয়ের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে যাবে ?

আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন সব সাক্ষী এসে বললে, সেদিন বাড়িতে চাকর-দরোয়ান ছাড়া আর কেউই ছিল না।

আমার উকিল বললে, জয়ন্তীয়া বলে একটা মেয়ে সেদিন বাড়িতে ছিল।

কিন্তু সাক্ষীরা বললে, জয়ন্তীয়া দলের সঙ্গে সাদিবাড়িতে গিয়েছিল।

শেষে জয়ন্তীয়াও এল সাক্ষী দিতে। আমি চোখ তুলে চেহারাটা দেখলাম। মস্ত বড় ঘোমটা দিয়ে সেই সেদিনকার মেয়েটিই বললে, সেদিন সে সে-সময়ে বাড়ি ছিল না। আমাকে সে কখনও দেখে নি, আমাকে সে চেনে না। সে অনেক রাত্রে সকলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এসে দেখল তাদের আত্মীয় সরযূপ্রসাদ খুন হয়ে পড়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে তার ঘোমটা-ঢাকা মুখখানার দিকে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভাল করে দেখা গেল না। তবু সেই একই গলার স্বর, সেই একই চেহারা। কোনও তফাৎ নেই।

আমার উকিল জিজ্ঞেস করলে, আপনি সরযূপ্রসাদকে সেদিন বাড়িতে আসতে চিঠি লিখেছিলেন ?

জয়ন্তীয়া উত্তর দিলে, না।

—আপনি সরযূপ্রসাদের কারবারে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ?

জয়ন্তীয়া উত্তর দিল, না।

—সরযূপ্রসাদের ওপর আপনার খুব রাগ ছিল, না ?

জয়ন্তীয়া বললে, রাগ থাকবে কেন ? সে তো কোন অপরাধ করে নি ?

আমার উকিল বললে, কিন্তু সে অন্য একটা মেয়েমানুষকে রক্ষিতা হিসেবে রাখার জন্যে আপনি তাকে খুব গালাগালি দিয়েছিলেন, না ?

জয়ন্তীয়া কোনও উত্তর দিল না।

আমার উকিল আবার বললে, আপনি তাকে অনেকবার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সে তার রক্ষিতার কাছে যেত। আপনার কাছে আসা বন্ধ করেছিল সে। এ-কথা কি সত্যি ?

জয়ন্তীয়া উত্তর দিল না।

—শেষে যেদিন সবাই বাড়িতে অনুপস্থিত, সেইদিন তাকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে শেষে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করেন ?

যে-ক'দিন মামলা চলল সে ক'দিন কোর্টে কী ভিড়! আমার দাদা আমাদের বাড়ি বিক্রী করে উকিলের টাকা যোগাড় করতে লাগল। দাদার দিকে চেয়ে দেখতাম—তার চেহারা যেন শুকিয়ে গেল দিন দিন। আমার জামিন হয় নি। হাজতের মধ্যে দিনের পর দিন আমি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলাম। মনে হলো আর সহ্য হয় না। যাহোক একটা কিছু হয়ে গেলে যেন বাঁচি।

শেষে রায় বেরোল।

বাড়িতে কী অবস্থা হলো তা দেখবার দুর্ভোগ আমাকে ভুগতে হয় নি। দাদা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কোর্টের মধ্যে। আমি গিয়ে পুলিসের ভ্যানের মধ্যে উঠলাম। ভালই হলো। ফাঁসি আমার হলো না—তার জন্যে ধন্যবাদ দিলাম ঈশ্বরকে। তিনশো দুই ধারার বদলে তিনশো তিন ধারার সুবিধে পেলাম। আমার জীবনে অন্য এক পরিচ্ছেদ শুরু হলো।'

জেলের ভেতরের দীর্ঘ দিনের ইতিহাস আপনাকে বলব না। তাতে কোনও নতুনত্ব নেই। একটানা কষ্টভোগের সে জীবন। কোথা দিয়ে দিন হত আর দিন চলে যেত তার বর্ণনা দেবার দরকার নেই। কিন্তু যখন বহুদিন পরে জেল থেকে বেরোলাম, বাড়িতে গিয়ে দেখি একমাত্র দাদা ছাড়া সবাই বেঁচে আছে। বাড়িটা দাদা বিক্রী করেনি, বন্ধক রেখেছিল। সেটা আবার ছাড়ানো হয়েছে। এক বোনের বিয়ে দিয়েছিল দাদা মৃত্যুর আগে, সেই ভগ্নিপতি দেখাশোনা করছে সবাইকে।

দু'একদিন পরেই বুঝলাম, সংসারে আমার আবির্ভাব সকলে সুস্থমনে গ্রহণ করতে পারে নি।

একে চাকরি নেই, তার ওপর খুনের অপরাধের আসামী। সমস্ত মানুষ-সমাজের ওপর তখন আমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। কারো সঙ্গে কথা বলি না, কারো সঙ্গে দেখা করি না। আমি যেন সংসারে অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছি।

আর বেশিদিন সহ্য করতে পারলাম না সেই অবস্থা।

আমার স্ত্রীর কাছে তখন পঁচিশটা টাকা ছিল। আর ছিল হাতের দু'গাছা সোনার চুড়ি। সেইটুকু সম্বল করে একদিন এখানে চলে এলাম। ভাবলাম যত কষ্টই হোক কলকাতায় আর নয়। বৈদ্যনাথের পায়ের কাছে থেকে উপোস করব দু'জনে কিন্তু কলকাতার মানুষ আর নয়। ঘর পর তখন সব একাকার হয়ে গেছে। কলকাতায় আর বেশি দিন থাকলে আমি বাঁচব না।

সেই পঁচিশটা টাকা নিলাম পকেটে। গয়না দু'টো বেচে আশী টাকা হলো। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। আসবার আগে দোকান থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স আর একখানা বই কিনে নিলাম। অথচ ডাক্তারির তখন আমি কিছুই জানি না।

স্ত্রীকে বললাম, বিদেশে গিয়ে থাকবে, তোমার কষ্ট হবে না তো ?

আমার স্ত্রী বরাবরই চাপা-প্রকৃতির মানুষ। শত দুঃখ-কষ্টেও তার মুখে কোনও দিন বিরক্তির ছাপ দেখি নি। মাথা নেড়ে বললে, না।

ট্রেনে উঠে তো বসলাম। - বতে লাগলাম ভাসতে ভাসতে কোথায় যাব জানি না। যে আমাকে অকারণে খুনের অপরাধে জেলে পাঠিয়েছে সে-ই আবার বাবা বৈদ্যনাথের কাছে ঠেলে দিলে। আমার আর কী করবার ছিল। আমার অভিযোগ করবার কী-ই বা আছে। আমি স্রোতের মুখে ভেসে পড়লাম। চাউলপটির ভঞ্জ-বংশের শেষ বংশধর আমি পাড়ার লোকের কলকাতার লোকের চোখের আড়ালে চলে গেলাম। কেউ আমাকে স্টেশনে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এল না। কেউ শুভেচ্ছা জানালে না আমার যাত্রারম্ভে। পাড়ার লোক সংসারের লোক সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আমি তাদের কলঙ্কের হাত থেকে যথাসাধ্য মুক্তি দিলাম। আমি আমার সংসারের লোকদের অসম্মান থেকে বাঁচালাম। তখনও আমার এক বোনের বিয়ে হয় নি। তার বিয়ে হওয়ার পথে আমি কেন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব। আমি কাউকে সাহায্য না করতে পারি, কিন্তু কারো প্রতিবন্ধক হব না জীবনে। আমি চোখের জল ফেললাম। সে-চোখের জলে কারো

মনের ক্ষেত্র সরস হবে না জানতাম—তবু চোখের জল ফেললাম। দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে ততটা নয়, যতটা আমার কাছে কেউ রইল না বলেই চোখের জল ফেললাম।

আমার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। আশ্চর্য! দেখলাম সে-চোখ শুক্‌নো!

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কষ্ট হচ্ছে না কলকাতা ছাড়তে?

আমার স্ত্রী মাথা নেড়ে বললে, না।

দেওঘরে তো এলাম। এই দেওঘর। আপনাকে তো বলেছি তখনকার দিনের দেওঘরের কথা। অন্ধকার রাস্তাগুলো। এখনকার মত তখন এত ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। বাজারের কাছে একটা ঘর ভাড়া করলাম। ঘর মানে ঘর ঠিক নয় সেটা। থাকবার একটা আশ্রয়। কোনও রকমে মাথা গুঁজে থাকা যায়। মাসে এক টাকা ভাড়া। আর রাস্তার ধারে এইখানে একটা দোকান ভাড়া করলাম। এই এখন যেখানে বসে আছেন, এইখানেই ছিল সেই ঘরটা। মাসে দু'টাকা ভাড়া। এইটেই হলো আমার ডাক্তারখানা।

পকেটে আমার মাত্র তখন একত্রিশটা টাকা। আর সব জিনিসপত্র কিনতে খরচ হয়ে গিয়েছে। সেই একত্রিশটা টাকার ওপর ভরসা করে আমি এক শুভ-দিন দেখে ডাক্তারি করতে শুরু করলাম।

ডাক্তারির তখন কিছুই জানি না। কাকে বলে অ্যানাটমি, কাকে বলে ফিজিওলজি, কাকে বলে মেটিরিয়া মেডিকা, কিছুই জানি না। সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এসে বসি। বইটা নিয়ে মন দিয়ে পড়ি। আর রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি।

বাইরে সাইনবোর্ড একটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। 'দি গ্রেট হোমিও হল্' লেখা। তীর্থযাত্রীরা সেদিকে তাকিয়ে দেখত। মাটির বাড়ি, টিনের চাল।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে তারা হেসে ফেলত। বলত, দেখ, দেখ হে, 'দি গ্রেট হোমিও হল্' দেখ!

সামনে আলকাতরা মাখানো একটা দরজা। ঘরের ভেতরে ঢুকতে গেলে মাথা নিচু করতে হয়। মনে হত একটা ঝড়ের ঝাপটা এলেই ঘরটার বুঝি আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। একেবারে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। আর আরও ভেতরের দিকে যারা চাইত তারা আরও হাসত। হেসে গড়িয়ে পড়ত। রোগী নেই, পত্র নেই, একজন কমবয়সী লোক রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে আছে। রোগীর আশাতেই বসে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে

পর্যন্ত বসে বসে যখন একটা রোগীরও দেখা মিলত না, তখন দরজায় তালা লাগিয়ে আমি চলে যেতাম বাড়িতে। তারপর সন্ধ্যাবেলা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যেতাম মন্দিরে। বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে গিয়ে বসতাম খানিক।

মনে মনে বলতাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

তারপর মন্দির থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে আসতাম।

আর উল্টো দিকে—আমার ডাক্তারখানার ঠিক উল্টোদিকে ছিল মস্ত একটা বাড়ি। ওই দেখুন। ওই বাড়িটা তখনও ছিল। শুনতাম পঞ্চকোট না কোথাকার এক রাজার বাড়ি। লাল ইঁটের সুন্দর বাড়িটা। তখন বাড়িটা ছিল নতুন। বছরে একবার পূজোর সময় রাজাসাহেব আসত। তখন বাড়িটার সদর দরজায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত দরোয়ান। আর এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত বাড়ির সবগুলো জানালা দরজা কিন্তু সমস্ত দিন বন্ধ থাকত। নতুন বাড়ি। অন্তত জানালা দরজা ইঁট কাঠ সমস্ত রঙ করা হয়েছিল নতুন করে। ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করত বাড়িখানা। আর মাঝে মাঝে একটা বিরাট মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াত সামনে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খাটানো হয়ে যেত সামনে। কে নামত কে উঠত বোঝা যেত না। তবু আমি হাঁ করে চেয়ে থাকতাম সেই দিকে।

কিন্তু ওইটুকুই ছিল আমার সারাদিনের বিলাস।

কিছুদিন পরেই আমার বড় ছেলে হয়েছে, তার খাওয়া খরচ আছে। আমার একত্রিশটা টাকা তখন কমে কমে শূন্যতে আসবার দাখিল।

মন্দিরে গিয়ে বাবাকে মনে মনে বলি, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

তা পাথরের ঠাকুর তো আমাদের জন্যে নয়। আমাদের ঠাকুর হলো রোগী। সেই রোগীর কৃপাকণা যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ কোনও ভরসাই নেই। রোগী একটা-দুটো যে না আসে তা নয়। রোগীরা আসে। আমিও ওষুধ দিই। কিন্তু যে একবার আসে সে আর দু'বার আসে না। দু'বার এলেও তিন বারের বার কখনও আসতে দেখি নি। অথচ টাকার দরকার। টাকা না এলে আর সংসার চালানো যাবে না। টাকার জন্যে একমাত্র প্রয়োজন রোগীর। সেই রোগীই আর আসে না।

পরের বছর আমার ছোট ছেলেটি হলো। তখন আরও দুর্ভাবনায় পড়লাম।

মন্দিরে গেলাম। ঠাকুরকে আবার বললাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

সেবার পুজোর সময় সামনের বাড়িতে আবার সেই রাজারা এল। একলা টিনের চালের তলায় বসে দেখতে লাগলাম—আবার বন্দুক কাঁধে পাহারা বসে গেছে সদর দরজায়। বাড়িটা নতুন রঙ করা হয়ে গেছে। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটার জানালা-দরজা বন্ধ। আবার একটা মোটরগাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খাটানো হয়ে গেল গাড়ি থেকে শুরু করে সদর দরজা পর্যন্ত। কে নামল, কে-ই বা উঠল বুঝতে পারলাম না। দরোয়ানটা একবার বন্দুক নামিয়ে সেলাম করল। তারপর আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম, রাজারা এল। কিন্তু তাতে আমার কী এসে যায়। আমি জন্মেছি দুঃখ-কষ্ট করতে, সুতরাং আমার জীবন এমনিই কাটবে।

সেদিন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে ক'টা টাকা আছে?

স্ত্রী বললে, তিনটে।

সমস্ত রাত ঘুম এল না। এমন করে আর কতদিন চলবে। তক্তপোশের ওপর দুটো ছেলে শুয়ে ছিল, তাদের দিকেও তাকালাম। খেতে না পেয়ে তাদের চেহারাও শুকিয়ে আসছে। স্ত্রীর দিকেও চেয়ে দেখলাম। তার দিকে আর চেয়ে দেখা যায় না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম, শুয়ে শুয়েই। বললাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। ভাবতে ভাবতে বোধ হয় দুর্ভাবনায় একটু আচ্ছন্ন ভাব এসেছিল।

হঠাৎ বাইরে যেন কার গলা শোনা গেল।

—ডাক্তার সা'ব! ডাক্তার সা'ব!

চমকে উঠলাম।

কখনও তো এমন করে রাত জেগে কোনও রোগী ডাকতে আসে না আমাকে। ভুল শুনি নি তো? স্বপ্ন দেখি নি তো? ঠিক শুনেছি তো? জেগে আছি তো?

আবার ডাক এল।

—ডাক্তার সা'ব? ডাক্তার সা'ব?

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। আমার স্ত্রীও শুনতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি হারিকেনটা জেলে দিলে আমার স্ত্রী। আমার ছেঁড়া কাপড়। খালি পা। তাড়াতাড়ি কাপড়টা বদলালাম। বদলে দরজাটা খুলে বাইরে এলাম।

বললাম, কে ?

বাইরে তখন অনেক লোক। সঙ্গে একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি। সমস্ত বস্তিটা একেবারে দিন হয়ে গেছে সে আলোয়।

সামনে একজন ভদ্রলোক। হিন্দুস্থানী।

আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে, আপনিই ডাক্তার সাহেব ?

বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি বললে, স্টেশন রোডেই আপনার 'দি গ্রেট হোমিও হল' ডাক্তারখানা ?

আমি আবার বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি বললে, আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে, একটি ছেলের খুব অসুখ, ছটফট্ করছে। এই রাত্রেই যেতে হবে দেখতে।

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি যেন খানিকক্ষণের জন্যে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার যেন বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল। এ কী আশার বাণী শোনালে ঠাকুর! এতদিন তোমার চরণে এসে উঠেছি, এমন অপ্রত্যাশিত ডাক তো কখনও শুনি নি!

লোকটি যেন আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললে, আপনি যত টাকা ভিজিট চান সব দেওয়া হবে। আপনি সে-সব ভাববেন না—আপনার জন্যে গাড়ি এনেছি।

তবু যেন কেমন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার জন্যে গাড়ি! আমি ডাক্তারির কী জানি! কী অসুখ! কী ওষুধ দেব! আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

লোকটি বললে, পাঁচশো টাকা চান তো তা-ই দেওয়া হবে। আপনি এখনি চলুন।

বললাম, এখন রাত ক'টা ?

লোকটির হাতে ঘড়ি ছিল।

দেখে বললে, দুটো।

বললাম, তাহলে জামা-কাপড়টা পরে নিই ?

লোকজন সেখানেই সব দাঁড়িয়ে রইল। আমার তো বসবার ঘর নেই। একটাই মাত্র ঘর, আর সেটা আমার শোবার ঘর। সেই ঘরটাই আমার সব।

ঘরের ভেতর যেতেই স্ত্রী আমার দিকে ভয়ে ভয়ে চাইলে।

বললাম, ফরসা কাপড় আছে একটা ?

স্ত্রী কাপড় বার করে দিলে, জামা বার করে দিলে। স্টেথিস্‌কোপ্‌টা নিলাম। ওর ব্যবহার জানি না। কিন্তু নিতে হয় ওটা। ওটা ডাক্তারের অঙ্গ। কিন্তু যেতে যেন মন সরছিল না। যত টাকা চাই তত দেবে! পাঁচশো টাকা!

দেখলাম, দেয়ালে টাঙানো বাবা বৈদ্যনাথের ছবিখানার দিকে চেয়ে আমার স্ত্রী গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে।

আমিও একবার প্রণাম করলাম। মনে মনে বললাম, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর, আমাদের দেখো তুমি।

স্ত্রীকে বললাম, তুমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়, আমি আসবো'খন।

বাড়ির সামনে অনেকখানি হেঁটে তবে বড় রাস্তায় আসতে হয়। সবাই সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চললাম।

ভদ্রলোক বললে, অনেক তক্‌লিফ্‌ করে আপনার কোঠির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে ডাক্তার সা'ব্‌।

বড় রাস্তার ওপর বিরাট একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। এত বড় গাড়ি! মনে হলো গাড়িটা যেন আমার চেনা-চেনা। অনেকবার দেখেছি।

আমরা উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। খানিক পরেই গাড়িটা যেখানে এসে থামল, আশ্চর্য, সেটা আমারই ডাক্তারখানার সামনে—মহারাজার বাড়ির সামনে।

সদর দরজার সামনে গাড়ি থামতেই দরোয়ান দরজা খুলে দিলে।

গাড়িটা সোজা ভেতরে গিয়ে থামল।

ভদ্রলোক আগে নামল।

বললে, আসুন ডাক্তারবাবু।

আমি নামলাম। আর ভয়ে ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল। শেষে কিনা এই বাড়ি থেকেই আমার ডাক এল! শুনেছিলাম পঞ্চকোট না কোথাকার রাজা। কিম্বা মহারাজা হবে হয়ত। কতদিন চুপচাপ ডাক্তারখানায় বসে এ বাড়ির ঐশ্বর্য বৈভব বিলাস সব লক্ষ্য করেছি। আজ এখান থেকেই আমার ডাক এল।

সামনে পেট্রোম্যাক্স বাতিটার আলোয় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম আমি। বাইরে থেকেই বাড়িটাকে চিনতাম আগে। এবার ভেতরে আসবারও সুযোগ পেলাম। যত বিরাট ভেবেছিলাম, বাড়িটা তার চেয়েও বিরাট দেখলাম। অত রাত্রেও সমস্ত বাড়িতে সবাই জেগে রয়েছে। অসংখ্য চাকর-

বাকর সব সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। মহারাজার ছেলের অসুখ, সুতরাং কারো বিশ্রাম করবার অবকাশ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিরাট হলঘর।

সেখানেই আমাকে বসিয়ে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেল।

আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম। চারপাশে ছোট ছোট ঘর। একটা ঘরের দরজা খোলা। সেটা কাছারি-ঘর মনে হলো। ভেতরে অনেক খাতা-পত্র টেবিল চেয়ার রয়েছে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে।

ভদ্রলোক আবার ফিরে এল।

বললে, চলুন ডাক্তার সা'ব।

এবার অন্দরমহল।

অন্দরমহলে কারোর সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না। অনেক বারান্দা, দালান, ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে দেখলাম বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারা। ফরসা ধপ ধপ্ করছে রং। মাথার সামনের দিকে চুলটা একটু পাতলা হয়ে গেছে মনে হলো। আমার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বললে, ডাক্তার সা'ব এসেছেন মহারাজজী।

বুঝলাম উনিই মহারাজা।

মহারাজা বললেন, আসুন আ- নি।

বলে আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। একটা পালঙ্কের ওপর সাত-আট বছর বয়সের একটা ছেলে যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। মাথার বালিশ ছিটকে পড়েছে দূরে। অস্থির চেহারা। চোখ বোজা।

বললাম, কী হয়েছে এর ?

মহারাজ বললেন, আজ ভোর রাত থেকে শরীরটা খারাপ, কিচ্ছু খাওয়া-দাওয়া করছে না, কেবল কাঁদছিল, যত রাত্ত বাড়ছে তত বেশি ছটফট্ করছে।

মাথায় হাত দিলাম। খুব জ্বর।

বললাম, জ্বর কত, দেখা হয়েছে ?

মহারাজ বললেন, না।

বুকে একবার স্টেথিস্কোপ্টা বসিয়ে দেখলাম অতি কষ্টে। বুকে সর্দি কাশি রয়েছে মনে হলো।

এবার জ্বরটা নেবার ব্যবস্থা করলাম। অনেক কষ্টে হাতটা চেপে ধরে জ্বর নিলাম। দেখলাম একশো তিন ডিগ্রী।

কী যে ভাবলাম, কী যে দেখছি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাজার ছেলের চিকিৎসা। সাধারণ বস্তির লোক হলেও কথা ছিল। এ কী পরীক্ষায় ফেললে ঠাকুর! আমি তো অনেক পরীক্ষা দিয়েছি আগে! জীবনে অকারণে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছে আমাকে! কিন্তু এখনও কি পরীক্ষা শেষ হয় নি! এতদিন রোগীর আশায় পথ চেয়ে বসে থেকেছি দিনের পর দিন। ডাক্তারখানার টিনের চালের তলায় অন্ধকার নির্জন ঘরে রাস্তার তীর্থযাত্রীদের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কেটেছে। কোনও দিন ভুলেও একটা রোগী আসে নি। একেবারে যে আসে নি তা নয়। কিন্তু সে না-আসারই সমান। যে একবার এসেছে সে দ্বিতীয়বার আর আসে নি। কিন্তু এবার এত করুণা তোমার কেমন করে সইব!

মহারাজ আর সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে ছিলেন।

আমি হাতটা রোগীর গা থেকে তুলে নিতেই বললেন, কী দেখলেন?

বললাম, দেখি, কী করতে পারি!

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

বললাম, বিশেষ কিছু নয়, এক দাগ ওষুধ আমি দিচ্ছি।

মহারাজ বললেন, কলকাতার সব ডাক্তারদের আজ সকালেই টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তো কাল ভোরের আগে কেউ আসতে পারছেন না, তাই ততক্ষণ আপনি দেখুন।

সত্যি বলছি কবিরাজ মশাই, মাথার ওপর আমার যেন বাজ ভেঙে পড়ল। কলকাতার সেরা সেরা সব ডাক্তার, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে আমাকে!

রোগীকে রেখে আমি হলঘরে এলাম। আমার ওষুধের বাক্সটা আর বইখানা ছিল সেখানে। বইটা একবার খোলবার চেষ্টা করলাম। কোন্ পাতায় খুঁজব! কী লক্ষণ মেলাব! কিছুই যে আমি জানি না! মোটা বইখানার পাতার মধ্যে যেন আমি হারিয়ে গেলাম। চোখের সামনে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। সমস্ত অক্ষরগুলো যেন সচল হয়ে আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল।

তারপর ওষুধের বাক্সটা খুললাম।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তার সামনে

নিজেকে যেন বড় ছোট মনে হলো। যদি আমার অজ্ঞতা ধরা পড়ে যায়! কোন্ ওষুধটা নেব তা-ও ঠিক করতে পারলাম না। সাধারণ রোগী নয়—রাজার ছেলে, পরের দিন কলকাতার সেরা সেরা ডাক্তার আসবে দেখতে। তখন পরীক্ষা হবে। অযত্ন করে, তাচ্ছিল্য করে যা তা ওষুধ দেওয়া যায় না। ওষুধের ছিপিগুলোর ওপর প্রত্যেকটার নাম লেখা ছিল। কিন্তু মনে হলো কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছি না। যেটুকু এতদিনে শিখেছিলাম, তা-ও যেন ভুলে গেলাম।

শেষকালে হাতের কাছাকাছি একটা ওষুধের শিশি বার করে চারটে পুরিয়া তৈরি করলাম।

ভদ্রলোককে বললাম, একটা পুরিয়া এখুনি খাইয়ে দিন। আর আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর আরও তিনটে পুরিয়া খাওয়াতে হবে।

ওষুধটা আমার সামনেই খাইয়ে দেওয়া হলো।

আজও মনে আছে সেদিন সকলের অলক্ষ্যে কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রার্থনা করে জানিয়েছিলাম যেন রাজার ছেলের আরোগ্যলাভ হয়। যেন আমার মানসম্মান বজায় থাকে। রাজার ছেলের জীবনের চেয়ে সেদিন আমার সম্মান প্রতিষ্ঠার কথাই বেশী করে ভেবেছিলাম মনে আছে। কলকাতায় আমার সম্মান ধূলিসাৎ হয়েছিল একদিন। কিন্তু সে তো আমার জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদের ব্যাপার। সে-জীবন তো কবে ত্যাগ করেছি। সে-জীবন থেকে কবে সরে এসেছি। এ আমার জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। এখানে যেন নতুন করে আবার জীবন আরম্ভ করেছি। এখানে যেন সম্মানহানি না হয়। আমার মাথা যেন উঁচু থাকে।

মহারাজ বললেন, আপনার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে পাশের ঘরে। আপনি রাতটা এখানেই থাকুন, আপনার বাড়িতে খবর দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দেখলাম, চমৎকার একটা বিছানার আয়োজন রয়েছে হলঘরের পাশে।

আমি বললাম, আধঘণ্টা পরে পরে যেন ওষুধটা ঠিক খাওয়ানো হয়, আর আমাকে খবর দেওয়া হয়।

বিছানার ওপর গিয়ে বসলাম। আলোটা জ্বলছিল। সেটাও নিবিয়ে দিলাম। রোগীর কাত্‌রানির শব্দ ওখান থেকেও শোনা যাচ্ছিল। কী জানি ভুল ওষুধ দিয়েছি কি ঠিক ওষুধ দিয়েছি! কী ওষুধ দিয়েছি, নিজেই কি জানি! হাতের কাছাকাছি যেটা পেয়েছিলাম সেটাই দিয়েছি।

বলে রেখে দিলাম, যদি রোগটা বেড়ে চলে তাহলে যেন আমাকে ডাকা হয়।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জ্ঞান নেই।

হঠাৎ ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। দেখলাম সকাল হয়ে গেছে।

উঠে বসলাম। দেখি সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে।

বললাম, কেমন আছে রোগী?

ভদ্রলোক বললে, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, মহারাজ কোথায়?

—তিনিও শেষরাত্রের দিকে ঘুমোতে গেছেন।

বললাম, ওষুধের সব পুরিয়াগুলো খাওয়ানো হয়েছে?

ভদ্রলোক বললে, হ্যাঁ।

বললাম, এখন যখন ঘুমোচ্ছে রোগী, তখন আর ওষুধের দরকার নেই।

খানিক পরেই মুখ হাতপা ধোবার জল এল। সাবান তোয়ালে এল। চা জলখাবার এল। সমস্ত বাড়ি আবার কলমুখর হয়ে উঠল।

মহারাজ এলেন।

বললেন, এই ভোরের গাড়িতেই কলকাতার ডাক্তাররা আসছেন, আমার ইচ্ছে তাঁদের কাছে আপনিও থাকেন। আপনার বাড়িতে আমি কাল রাত্রেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভোরবেলাই ডাক্তারেরা এসে হাজির হলেন। বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তার সব। কবিরাজ, অ্যালোপ্যাথ্ হোমিওপ্যাথ, কেউ বাকি নেই। গাড়ি গিয়েছিল স্টেশনে তাঁদের আনতে। গাড়ি এসে পৌঁছতেই সবাই নেমে দাঁড়ালেন। আমি দেখলাম তাঁদের। তাঁদের নাম শুনেছিলাম এতদিন। এবার স্বচক্ষে দেখলাম। প্রত্যেককে রোজ হাজার টাকা হিসেবে ফিস্ দিয়ে আনানো হয়েছে।

সবাই রোগীকে দেখলেন।

রোগী তখন ঘুমোচ্ছে।

কী লক্ষণ, কী হয়েছিল, তারপর কেমন যন্ত্রণা হচ্ছিল, সব জিজ্ঞেস করলেন।

সাহেব ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কে দেখছিলেন?

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, উনি, এখানকার ডাক্তার সাহেব।

কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ইউনান্ সাহেব এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ও ছিল।

আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন সমস্ত। জ্বর কত ছিল তখন, ঘাম হচ্ছিল কিনা। আরও অনেক অনেক তথ্য নিলেন আমার কাছ থেকে।

মনে আছে সকালবেলা আমি দেখেছিলাম কী ওষুধটা আসলে আমি দিয়েছি। কিন্তু আমার কী তখন কিছু খেয়াল ছিল! অত বড় বড় ডাক্তার সব! তাঁদের মধ্যে বসে থাকতেও আমার লজ্জা হচ্ছিল। তাঁদের আর আমার জামা-কাপড়ের তফাৎটাও যেন বড় বিসদৃশ হয়ে চোখে ঠেকছিল আমার কাছে।

মনে আছে ইউনান্ সাহেব শুধু বলেছিলেন, মার্ভেলাস সিলেকশান্।

তারপর সব ডাক্তারই একমত হয়ে বললেন যে, যখন রোগী ভাল রয়েছে, তখন আর নতুন কোনও ওষুধ দেওয়া নিরর্থক। যেমন চিকিৎসা চলছে তেমনি চলুক।

বিকেল বেলা রোগীর অবস্থা আরও ভালো দেখা গেল। ডাক্তারেরা প্রত্যেকে হাজার টাকা করে নিয়ে সন্ধ্যের গাড়িতে কলকাতায় চলে গেলেন। তারপর আমাকেও গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মহারাজা বললেন, আপনি এ ক'দিন একবার করে রোজ আসবেন।

ক'দিন পরেই বোধ হয় রোগী ভাল হয়ে উঠল। তখন মহারাজার দেশে ফিরে যাবার পালা।

আমার ডাক পড়ল রাজবাড়িতে।

হলঘরের মধ্য দিয়ে পাশের কাছারি ঘরে যেতেই দেখি হিন্দুস্থানী সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজও বোধ হয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ভদ্রলোকটি বললে, ডাক্তার সাহেব, আপনি মহারাজের ছেলের চিকিৎসা করেছেন, অনেক তকলিফ্ নিয়েছেন, মহারাজ খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন আপনার ওপর।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কতদিনের প্র্যাকটিস্ আমার ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাজাঞ্চিকে বললেন, ডাক্তার সাহেবকে এক হাজার রূপেয়া দিয়ে দাও মুন্সী।

মুন্সী খাতায় লিখলে খরচটা। তারপর একটা পাশে রাখা লোহার সিন্দুক থেকে গুণে গুণে একশো টাকার নোট বার করতে লাগল।

আমি তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারি নি। এতগুলো টাকা একসঙ্গে পাওয়া দূরে থাক, চোখেও কখনও দেখি নি এত কাছ থেকে।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক টাকাগুলো গুণে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, লিজিয়ে ডাক্তার সাব্!

হঠাৎ মনে হলো ঘরের পেছনে কোথায় ঝন্ ঝন্ করে কাসের আওয়াজ হলো। সেই আওয়াজ শুনেই মহারাজ উঠলেন।

বললেন, থোড়া ঠায়্রো।

বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার দিকে টাকাটা এগিয়ে দিয়েছিল, সে-ও হাতটা টেনে নিলে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। আবার বাধা পড়ল কেন?

ভেতরে যেন কার গলার শব্দ পেলাম।

মুন্সী সভয়ে জিব কাটলে। খাজাঞ্চিকে বললে, রাণীসাহেবা!

হিন্দী কথাবার্তা। তবু কিছু কিছু শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে। কিছু কিছু অস্পষ্ট বোঝাও যাচ্ছিল।

রাণীসাহেবা বলছিলেন, কেন? এক হাজার টাকা কেন? বাইরে কলকাতার ডাক্তাররা এসে কিছু না করে হাজার হাজার রূপেয়া নিয়ে গেল, আর এ ডাক্তার এতদিন দেখলে, তাকে খালি হাজার রূপেয়া?

মহারাজা বললেন, আচ্ছা দু'হাজার দিতে বলছি আমি, ঠিক বাত।

—কেন? দু'হাজার কেন? আমার ছেলের জীবনের চেয়ে কি টাকার দাম বেশি? ছেলেকে তো এই ডাক্তার সাহেবই বাঁচিয়েছে।

মহারাজ বললেন, তাহলে কত দেব?

রাণীসাহেবা বললেন, পঞ্চাশ হাজার তো দাও।

তারপর আরও সব কী কী কথা হলো। সব বুঝলাম না। মহারাজ বাইরে এলেন।

বললেন, মুন্সী, এক হাজার নয়, ডাক্তার সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া দাও।

তিনকড়িবাবু বলতে লাগলেন, সেই পঞ্চাশ হাজার টাকাই শুধু নয়, তারপর থেকে ঠিক হলো যতদিন বেঁচে থাকব আমি ততদিন আমার বাড়িতে রাজ-এস্টেট্ থেকে সিধে আসবে। চাল ডাল তেল ঘি মশলা। সে তো আপনাকে বলেছি আগেই।

তারপর দিনই রাজাসাহেব রাণীসাহেবা চলে গেলেন সেবারের মত।

আমি সেই জমির ওপরই এই বাড়ি করলাম পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে। আর পঁচিশ হাজার টাকা রইল আমার ব্যাঙ্কে। তারপর প্রতি বছরই এসেছেন মহারাজা। প্রতি বছরই আমাকে কত ভেট পাঠিয়েছেন। আমার কাপড়, স্ত্রীর গয়না শাড়ি, ছেলেদের ধুতি।

তারপর বড় ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন মহারাজা। সে পায় সাতশো টাকা। ছোট ছেলে ম্যাট্রিক পাস করেছিল, তাকেও চাকরি দিয়েছেন তিনশো টাকার। আমার ভাবনা কী বলুন, ছেলেদের চাকরি হলো, আমার সারা জীবনের মত সঞ্চয়।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আর প্র্যাকটিস?

তিনকড়িবাবু বললেন, আর প্র্যাকটিস জমে নি। আরও অনেক রোগী পরে আসত আমার কাছে, কিন্তু কাউকে সারাতে পারি নি আর।

গল্পের পর আমরা উঠেছিলাম, অনেক রাত হয়ে এসেছিল।

তিনকড়িবাবুও বিদায় দিতে উঠলেন।

বললেন, একটা ঘটনা আপনাদের বলি নি। বছর দশেক আগে একদিন শীতকালে পণ্ডিতজীর সঙ্গে হঠাৎ এখানে দেখা। আমার বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। খুব খুশীও হলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় উঠেছেন পণ্ডিতজী?

পণ্ডিতজী সামনে পঞ্চকোটের রাজবাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওই বাড়িতে দু'টো ঘর খুলে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদের সঙ্গে আপনার জানা-শোনা হলো কী করে?

পণ্ডিতজী বললেন, কটন্ স্ট্রীটের বাঁকেবিহারীবাবুকে তো জানেন? অত মামলা হলো—সেই কত কাণ্ড! মিছিমিছি আপনার ওপর খুনের দায় চাপল! সেই বাঁকেবিহারীবাবুর বড় মেয়ে জয়ন্তীয়ার সঙ্গে যে পঞ্চকোটের মহারাজকুমারের সাদি হয়েছিল। আপনি তখন জেলে।

পণ্ডিতজী সেই সূত্রেই কোনও চিঠি নিয়ে এখানে রাজবাড়িতে উঠেছিলেন। তাঁর কথা শুনেই প্রথম বুঝতে পারলাম যে, আমার এই বাড়ি, এই ঐশ্বর্য, এই ছেলেদের চাকরি, এর মূলে কে। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই—অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। জয়ন্তীয়ারও অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, আমিও বুড়ো হয়ে গেছি।

আর এক রকম

কয়েক বছর সরকারী চাকরি করেছি। চাকরির সুবিধেও বুঝেছি, জ্বালাটাও বুঝেছি তখন। জেনেছি, চাকরি করতে গেলে আর সব রাখা চলে, মনুষ্যত্ব বজায় রাখা চলে না। বিশেষ করে সরকারী। মাইনেটা নিয়ম করে পয়লা তারিখে পাওয়া যায় বটে। সময়ে-অসময়ে কামাই করাও চলে। কামাই করলে মাইনেও কাটা যায় না। কিন্তু সময় বড় নষ্ট হয়। মনে হয় ক'টা টাকার জন্য জীবন-যৌবন সব বুঝি জলাঞ্জলি দিয়ে দিচ্ছি। তাই যে কবছর চাকরি করেছি সে ক'বছর মানসিক শান্তি পাই নি, স্বাধীনতাও পাই নি। এক কথায় আমি আর আমি ছিলাম না সে ক'বছর।

কিন্তু লাভ কি কিছুই হয় নি ?

আজ এতদূর থেকে, আজ এতদিন পরে ভাবছি খতিয়ে দেখলে কেমন হয়! চাকরি-জীবনের একেবারে শেষের দিকের তিনটে বছর। সমস্ত জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, ওই শেষ তিনটে বছরেই তার কতগুণ অভিজ্ঞতা জড়ো হয়েছিল! কত বিচিত্র সে চাকরি আর কত বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা! এই কলকাতা শহরেই জন্মেছি, এই কলকাতা শহরেই বড় হয়েছি, আশৈশব আমার এখানেই কেটেছে বরাবর। মাঝে মাঝে কাজের সূত্রে, বিশ্রাম উপলক্ষ্যে বাইরে গিয়েছি—কিন্তু কোথাও গিয়ে মনে শান্তি পাই নি। জানি এখানকার আবহাওয়া খারাপ, এখানকার জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, এখানে একজনের ভালতে আর একজনের চক্ষুশূল হয়। সবই জানি। এখানে একজন আর একজনকে কতক্ষণে অপদস্থ বিপদগ্রস্ত করতে পারবে—তাই-ই তার কেবল চিন্তা। এখানে, এই কলকাতায় স্নেহ-প্রেম-মমতা-পুণ্য, জানি। জানি, দাম দিতে না পারলে সম্মান এখানে মেলে না। জানি, তদ্বির না করতে পারলে সুখ্যাতির দর্শন এখানে দুর্লভ। জানি সবই। এখানে টাকা-আনা-পাই দিয়ে মর্যাদার বিচার হয়। এখানে শুধু মহৎ হলেই চলবে না, প্রচারের মাধ্যমে সে-মহত্ত্ব জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সংবাদপত্রের মালিকদের কাছে এখানে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে—অর্থবানদের কাছে আত্মবিক্রয় করতে

হবে, তবেই তুমি মহৎ, তবেই তুমি গুণী, তবেই তুমি লেখক, তবেই তুমি কবি।

এসব কথাগুলো আমার নয়। এসব কথা আমাকে বলত—সমর।

আমি অবশ্য প্রতিবাদ করতাম। বলতাম, এ তোমার বড় অন্যায়, এমন করে সমস্ত দেশটাকে নস্যাৎ করা তোমার উচিত নয়।

কিন্তু আমি তো জানি, এই অসুস্থতার মধ্যে বাস করেও কেমন যেন শান্তি পাওয়া যায়। অনেকটা নেতি-বাচক শান্তি। এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া থেকে পালিয়ে গিয়েও যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। দার্জিলিং, পুরী, সিমলায় সুস্থতার মধ্যেও যেন কলকাতার জন্যে প্রাণ কেঁদেছে। কলকাতার এই অসুস্থ আবহাওয়ার মধ্যেই যেন শেষ পর্যন্ত খুঁজেছি, তৃপ্তি পেয়েছি।

মনে আছে প্রথম যেদিন নতুন ডিপার্টমেণ্টের অফিসে গিয়ে দেখা করলাম, সেদিন কেমন ভয়-ভয় করছিল। পার : তো!

এ কী ধরনের কাজ! চোর ধরতে হবে, ঘুষখোর ধরতে হবে। সমস্ত সরকারী চাকরির অফিসে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত লোক তাদের ওপর গোপনে খবরদারি করতে হবে। অথচ কতবার অভিজ্ঞতা হয়েছে নিজেরই। কতবার হাওড়া স্টেশনে সামান্য একটা কাজের জন্যে গিয়ে একেবারে ঘুষখোরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। শহরের সর্বত্র দুর্নীতির জাল পাতা। দেখেছি টাকার দৌলতে অন্যায়ও ন্যায় বলে চলেছে এখানে।

অফিসের যিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তিনি আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলেছিলেন, আপনি কি এ কাজ পারবেন?

তাঁকে সেদিন মুখে বলেছিলাম, পারব। কিন্তু মনে আমার ভয় ছিল সত্যিই। আজ অবশ্য আমার কোন খেদ নেই। আমার কর্তব্য আমি সম্পাদন করতে পেরেছি কিনা তার নজির এখনও আছে সেই অফিসের নথিপত্রে। সে-সব কথা এখানে আর উল্লেখ করব না। ক'জন লোক আমারই তৎপরতায় এখনও জেল খাটছে তার হিসেব সেই অফিসের ফাইলের কাগজেই লেখা থাকুক। আমি আজ অন্য গল্প বলতে বসেছি।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, বড় শক্ত কাজ, জানেন তো!

বললাম, জানি।

বললেন, যাঁরা মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায় তারাও ঘুষ খায়, আবার যারা পাঁচ সিকে রোজ পায় তারাও ঘুষ খায়, আমি চাই বড় বড় ঘুষখোর ধরতে,—বলে একটু থেমে বলেছিলেন, এ-কাজে অবশ্য দেখবেন অনেক মজা পাবেন।

আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে।

তিনি বোধ হয় আশ্বাস দেবার জন্যেই বলেছিলেন, হ্যাঁ, সত্যিই মজা পাবেন, অনেক রকম লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, দেখবেন সংসারে কত লোক নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে ব্যস্ত।

সত্যিই সে-রকম লোক যে আছে তার পরিচয় আমি পুরো তিন বছর ধরেই পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম, শ্যামবাজার থেকে গাড়িভাড়া খরচ করে আমার কাছে কেউ এসেছে আর একজনের সর্বনাশ সাধন করতে। অনেক নিরপরাধ লোকের বিরুদ্ধে গাদা-গাদা অভিযোগ এসেছে আমার কাছে। যারা অভিযোগ করেছে, দেখেছি, তারা আরও বড় দরের আসামী। কিন্তু আমার বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে কাউকে-কাউকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছি, আবার কাউকে জেলে পাঠিয়েছি। দুর্দান্ত শ্রেণীর কত লোক ধরা পড়ার পর আমার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চেয়েছে। আমাকে এই বলে কটাক্ষ করেছে, আপনি বাঙালী আমিও বাঙালী—আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীর এই সর্বনাশ করলেন?

কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

আমি সমরের কথা বলব এখানে। সমরচন্দ্র বিশ্বাস। সরকারী একটা অফিসের ক্যাশিয়ার। মাধব সিকদার লেন-এর একটা মেসে সে তখন থাকত।

সমর বলেছিল, বরানগরের সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন, সবাই আমাদের চেনে স্যার।

সত্যিই, খবর নিয়ে জেনেছিলাম সমরের ছেলেবেলাটা কেটেছে ওই বরানগরে। তিন পুরুষের বিরাট বাড়ি ছিল ভৈরব মল্লিক লেনে। বিরাট বাড়িই বটে। শুধু বাড়ি নয় গাড়িও ছিল।

লোকে বলত, বিশ্বাস-বাড়ির ছেলে!

বিশ্বাস-বাড়ির ছেলে বললে আর কিছু বলবার দরকার নেই। এক-ডাকে চেনে সবাই। নতুন কোনও লোক বরানগরে এলে আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞেস করত, কোথায় বাসা পেলে?

বলত, বিশ্বাস-বাড়ির কাছে।

—বিশ্বাস-বাড়ি আবার কোথায়?

অবাক হয়ে যেত সবাই। বিশ্বাস-বাড়ি চেন না? কলকাতা শহরে আছ আর বরানগরের বিশ্বাস-বাড়ির নাম শোন নি? চড়কের গাজনে বিশ্বাসদের সঙ যে বিখ্যাত! এককালে নাকি চিড়িয়াখানা ছিল বিশ্বাস-বাড়িতে। কলকাতায় নতুন লাটসাহেব এলে বিশ্বাস-বাড়িতে একবার

নেমন্তন্ন হবেই। বিশ্বাস-বাড়ির দুর্গাপুজোর জাঁক-জমক দেখবার মতন। ছ'ঘোড়ার গাড়িতে করে দুর্গাপ্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হত গঙ্গায়। বিশ্বাস-বাবুরা বহুকালের আদ্যিকালের বড়লোক। বড়লোক যে তার প্রমাণ এখনও আছে। বাড়ির সামনে মস্ত বড় একটা গেট ছিল। গেটটার বাহার আর তেমন নেই, কিন্তু ভাঙা সিংহ দুটো এখনও আছে। জায়গায় জায়গায় সিংহটার পেটের দিকে বালি খসে গেছে, একটা চোখ ভেঙে ইঁট-চুন-সুরকি বেরিয়ে পড়েছে। দেউড়ির উঠোনে বিরাট একটা তেঁতুল গাছ, সেই গাছের ডাল-পালার মধ্যে দিনের বেলা অসংখ্য পায়রা বক্-বকুম করে। রাত্তির বেলা তারাই আবার বিশ্বাস-বাড়ির আলসের তলায় কোটরে-কোটরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আগে নাকি এক মণ ধান বরাদ্দ ছিল পায়রাগুলোর জন্য রোজ। একটা বন্দুকের আওয়াজ হলেই পায়রাগুলো আচমকা ভয় পেয়ে আকাশে গিয়ে উড়ে পালাত। বরানগরের লোকদের মধ্যে যারা সে-সব দিন দেখেছে তারা জানে সে কী অসংখ্য পায়রা। ভৈরব মল্লিক লেন নামটা পরে হয়েছে। আগে বাড়ির সামনে পুকুর ছিল শুধু। পুকুরে পদ্মফুল ফুটত। সেই পুকুরের দু'পাশ দিয়ে রাস্তা। রাস্তাটা ছিল খোয়া বাঁধানো। রাত্তির বেলা বাড়ির ঘরগুলোর আলো পুকুরের জলে পড়ে ঝক্‌মক্ করত। আগে বাড়ির চারপাশে পাঁচিল দিয়ে রেলিং ঘেরা ছিল। ভেতরে খালি জমিতে ছিল ফুলের বাগান। পরে সে রেলিংও ছিল না, সে বাগানও ছিল না। রেলিং-এর ইঁটগুলো ভেঙে ভেঙে পুকুরে খসে পড়ত। প্রথম প্রথম একটু সারানো হতো। বিশ্বাস-বাড়িরই এক সরিকের ছোট ছেলে একবার বিলেত গিয়ে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এসে বিরাট মাইনের এক চাকরি পেলে। তারপর সেই সরিকরা বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি করে উঠে গেল একদিন। আস্তে আস্তে বেশির ভাগ সরিকরাই সুযোগ পেলেই উঠে যেতে লাগল।

তখন অধর বিশ্বাস, বুড়োমানুষ। কিন্তু তখনও তিনি বিকেল হলেই এঁদো পুকুরটার ঘাটের সামনে এসে বসেন। ঘোলা জলের ওপর হয়ত নিজের ছায়া দেখেন বসে বসে। ওপাশে বড় বড় বাড়ি হয়েছে। পুব দিকে, উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে। ওদিকটায় আগে সবটা মাঠ ছিল। অধর বিশ্বাস যৌবনে ওইখানে বসতেন আর বরানগরের দু'চারজন গণ্যমান্য লোক এসে জুটতেন তখন।

অধর বিশ্বাস বলতেন, শীতটা কেমন পড়ল এবার চাটুজ্জে ?

একজন বলতেন, ফুলকপির সিঙাড়া খেতে ইচ্ছে করছে বিশ্বাস মশাই।

—ফুলকপির সিঙাড়া ?

বেশি বলতে হতো না। সেই বিকেল বেলাই ভেতরে হুকুম পাঠাতেন অধর বিশ্বাস। আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ির ভেতর থেকে কাঁসার থালায় করে শ'খানেক গরম গরম ফুলকপির সিঙাড়া এসে হাজির হতো একেবারে পুকুরের ঘাটে। কে ক'টা খেতে পারে! শুধু সিঙাড়াই নয়। চা আসত, মুখ ধোবার জল আসত—শেষে নতুন গুড়ের সন্দেশ আসত। রাত সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সেই ঠাণ্ডার মধ্যে বসে তাঁদের আড্ডা চলত তখন। এখন আর কেউ আসে না। পানা-পুকুরের ঘোলা-জলের ওপর মাঝে মাঝে একটা বুদ্বুদ ওঠে —পাঁকের ভেতর থেকে কী একটা ওপরে উঠে এসে একটা ফোস্কার মতন হয় জলের ওপর আর ফোস্কাটা নিঃশব্দে ফট্ করে ফেটে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন অধর বিশ্বাস আর শীতটা যখন আরও ঘনিয়ে আসে কম্ফর্টার দিয়ে কানটা মাথাটা ভাল করে ঢেকে নেন। বরানগরে আজকাল ঠাণ্ডাটা যেন বেশি পড়তে শুরু করেছে।

বাগানের গোলাপ গাছগুলোর আর ইদানীং যত্ন নেওয়া হতো না। সেদিকটায় একখানা টিনের চালাঘর বানিয়ে একটা মোটর গাড়ির গ্যারেজ হয়েছিল। গাড়ি কেনবার শখ ছিল না অধর বিশ্বাসের। ও-সব উঠতি বড়-লোকদের জিনিস। ওর ওপর অধর বিশ্বাসের কোনও দুর্বলতা ছিল না। কোনও দিন।

হঠাৎ ঝিক্‌ঝিক্ করে শব্দ করতে করতে পাশ দিয়ে মোটরটা যেতেই অধর বিশ্বাস চম্‌কে উঠলেন।

—কে ?

আসলে গাড়ির শখ হয়েছিল অন্য কারণে। ছোট সরিক বিলেত থেকে ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আসার পর একটা মোটর কিনেছিল। নতুন গাড়ি। অন্য সরিকদের চোখে লাগল।

অধর বিশ্বাস বললেন, ও-গাড়ির কত দাম ?

সরকার বললে, শুনছিলাম সাত হাজারে পাওয়া যায়।

অধর বিশ্বাস বললেন, আমার তো বয়স হয়ে গেছে—ও থাক্।

স্ত্রীরও বয়স হয়েছে। তাঁর বাতের ব্যথা। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারেন না তখন। তিনিও 'না' করেন নি তেমন। কিন্তু এক-বাড়িতে বাস। মেজরা, ছোটরা হুট হুট করে যায়। কেমন একটা ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ হয়।

জিজ্ঞেস করেন, বাইরে কিসের শব্দ রে ? ছোটবাবুর গাড়ি বুঝি ?

ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত বরানগর জলে ভেসে গেছে। অধর বিশ্বাস বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতে পারেন না। কিন্তু ছোট সরিকরা সেই বৃষ্টির মধ্যেও কেমন হুস্‌ হুস্‌ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়ি থাকলে আর এমন হতো না। এমন একখানা গাড়ি থাকলে তিনিও আর বাড়িতে আটকে থাকতেন না। গাড়ি নিয়ে যেখানে খুশী বেরিয়ে পড়তেন। চাই কি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরতে যেতেন কলকাতার দিকে। ওদিকে কত সব নতুন জায়গা হয়েছে। বালিগঞ্জ না লেক। নামগুলো শুনেছেন, যাওয়া কখনও ঘটে ওঠে নি।

আবার বললেন, কে ?

গাড়িটা সামনে দিয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে চলে গেল। শুধু পেছন থেকে দেখা গেল যেন খোকার মাথাটা। খোকাই হয়তো গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছে।

বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, খোকা বুঝি গাড়ি নিয়ে বেরোল ?

নিস্তারিনী শুধু বললেন, হ্যাঁ।

আবার অধর বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় বেরোল ?

নিস্তারিনী বললেন, তা তো বলে যায় নি।

অধর বিশ্বাস একটু চুপ করে রইলেন।

বললেন, বলে যায় না কেন ? কোথায় যায় বলে যাবে তো! চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছে নাকি ?

নিস্তারিনী এ-কথার কোনও জবাব দিলেন না।

অধর বিশ্বাস বললেন, তুমি একটু বোল না ওকে। চাকরি-বাকরি কিছু তো একটা করতে হবে। আমার তো আর সে অবস্থা নেই। জান, মল্লিকদের কাছে অনেক টাকা সুদ জমে গেছে।

নিস্তারিনী এসব কথায় কোনও দিনই উচ্চবাচ্য করেন না। সংসারের আয়ব্যয়ের দিকে তিনি কখনও নজর দেন নি জীবনে। এখন বাতের ব্যথা হয়েছে, এখন তো আরও নীরব হয়ে গেছেন। সমস্ত বাড়িটা যখন পায়রার বক্‌-বকম্‌ শব্দে দুপুরবেলা গম্‌গম্‌ করে, তখন সব কিছু যেন মুখর হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয় যেন বাড়িটা ভেঙে তাঁর মাথার ওপর পড়বে। পাশের ঘরে অধর বিশ্বাস দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়ান।

বলেন, শুনছ!

অধর বিশ্বাসের তখন নাক ডাকছে।

নিস্তারিনী আবার ডাকেন, শুনছ!

অধর বিশ্বাস ঘুমের ঘোরে একবার একটু সাঁড়া দিয়ে ওঠেন, উঁ—

নিস্তারিনী বলেন, বাড়িটা পড়ে যাবে নাকি?

কিন্তু ওদিক থেকে আর কোনও সাড়া-শব্দ আসে না। অধর বিশ্বাসের তখন আবার নাক ডাকতে শুরু করেছে।

বরানগরের লোকেরা কিন্তু সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। পুকুরটার গা ঘেঁষে সুরকির রাস্তাটা দিয়ে আর একখানা মোটর আসতেই দেখেছে সবাই। পান-বিড়ির দোকান থেকে প্রথম দেখলে নিতাই হালদার।

—আরে, ও-গাড়িটা কার রে ভূষণ?

ভূষণ—পান-বিড়িওয়ালা। বললে, আপনি জানেন না, ও-গাড়ি তো অধর বিশ্বাসের!

অধর বিশ্বাসের গাড়ি! তবে লোকটার তো পয়সা আছে! দশ-বারো হাজারের কমে তো আর মোটরগাড়ি হয় না। ভেতরে ভেতরে টাকা তাহলে আছে বুড়োর! সবাই ভেবেছিল বিশ্বাসদের অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে।

ভূষণ বললে, মরা হাতি লাখ টাকা, বুঝলেন নিতাইবাবু, দু'দশখানা গাড়ির জন্যে এখনও বিশ্বাস-বাড়ির আটকায় না।

—কী রকম?

ভূষণ বললে, এখনও ও-বাড়িতে দিনে দু'টাকার খিলি-পান বেচি, তা জানেন!

—দু'টাকার পান?

ভূষণ বললে, হ্যাঁ দু'টাকার পান, চার পয়সার এক-একটা খিলি। রোজ দুপুরে বিশ্বাস-বাড়ির দরোয়ান এসে নিয়ে যায়।

কথাটা উঠেছিল ওই গাড়ি কেনা থেকেই। ওই গাড়ি থেকেই সকলের টনক নড়ল। না, যা ভাবা গিয়েছিল তা সত্যি নয়। সত্যি মরা হাতী লাখ টাকা। ছোট সরিক না হয় বড়লোক হয়েছে ছেলের দৌলতে। ছেলে বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছে। বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে। মেজবাবুও না হয় শ্বশুরের পয়সা পেয়েছে। শ্বশুর বড়লোক শ্যামবাজারের। নিজের কিছু না থাক, শ্বশুরের দৌলতে বাবুয়ানিটা করে যাবেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বড়বাবু? অধর বিশ্বাস? তাঁর যে এখনও দাম আছে এ কথাটা তো কারোর মাথায় আসে নি!

বাজারে চাকরটা এসেছিল মাছ কিনতে।

নিতাই হালদার কাছে গিয়ে ভাব জমালে।

বললে, কী মাছ কিনলি রে—এই ভূতো!

ভূতো দেখালে। একটা দেড় সের ওজনের রুই মাছ কিনেছে।

—কত দাম নিলে?

—সাড়ে চার টাকা।

নিতাই হালদার চমকে উঠল। মাছ সাড়ে চার টাকার! তাহলে তো আলু, বেগুন, পটোল আছে, শাক-সব্জি সবই আছে তার ওপর। খেতে তো মোটে ওই তিনটে লোক। অধর বিশ্বাস, তাঁর বউ আর ওই ছেলেটা। চাকরি-বাকরি করে না ছেলেটা। কিন্তু এত বাজার আসে কোত্থেকে? টাকা নিশ্চয়ই আছে বুড়োর। বুড়ো ওদিকে ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে দিয়ে থাকলে কী হবে, জমানো টাকা আছে নিশ্চয়ই। ছেলেটা কোট-প্যাণ্ট পরে কোথায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, তারপর আসে অনেক রাত্রে। তখন আবার ঝিক্ ঝিক্ শব্দ হয় পুকুরপাড়ের সুরকির রাস্তার ওপর। গ্যারেজের টিনের দরজাটা খোলার শব্দ হয় ঘড় ঘড় করে। বোঝা যায় অধর বিশ্বাসের ছেলে ফিরল।

নিতাই হালদার বলে, তোমরা যা ভাবছ তা নয় হে, বুড়োর টাকা আছে!

কেশব বাঁড়ুজ্জে বলে, টাকা না থাকলে গাড়ি কেনে?

ভূষণ বলে, আজ্ঞে, এখনও নগদ দু'টাকার পান যায় অন্দরে—মাসে ষাট টাকার পান, জানেন?

তা সেই সময় একটা কাণ্ড হলো।

সেদিন সকালবেলা। রবিবার। পাড়ার রোয়াকে রোয়াকে ছুটির দিনের আড্ডা হচ্ছে। বাবুরা বেলা করে খাবে। ফুটবল আর খবরের কাগজের খবর নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন রোয়াকের সামনে। বেশ ফিট-ফাট চেহারা, তেড়ি বাগানো। ধুতির কোঁচাটা হাতের মুঠোয় ধরা। পান খাচ্ছিলেন।

নমস্কার করে সামনে এগিয়ে এসে বললেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

নিতাই হালদার খবরের কাগজটা সরিয়ে বললে, বলুন।

আড্ডা তখন চুপ হয়ে গেছে ভদ্রলোকের আবির্ভাবে। সবাই নড়েচড়ে বসল।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম মধুসূদন সেন, আমরা হলাম দক্ষিণরাঢ়ি

কায়স্থ। আমার বোনের বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে আসছি, আপনারা যদি সাহায্য করেন তো বড় উপকৃত হই—বুঝতেই তো পারছেন।

নিতাই হালদার তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বললে, বসুন স্যার, বসুন আপনি এখানে, বসে কথা বলুন।

মধুসূদনবাবু বসলেন। বললেন, আমি এখানকার ভৈরব মল্লিক লেন-এর বিশ্বাস-বাড়ির সম্বন্ধে খবর নিতে এসেছি, আপনারা হলেন প্রতিবেশী লোক। বোঝেন তো বোনের বিয়ে দিচ্ছি, আমার নিজের বোন বলে বলছি না মশাই, অমন মেয়ে হাজারে একটা পাওয়া যায় না, আমার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমার বাবা মারা যাবার আগে বোনের বিয়ের জন্যে কিছু টাকাও রেখে গেছেন।

নিতাই হালদার বললে, বিশ্বাসবাড়ির কোন্ ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করছেন?

কেশব বাঁড়ুজ্জে বললে, ছোট সরিকের কথা বলছেন তো? তা তাঁরা তো এখানে আর থাকেন না। ছেলে খুব ভাল, ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে এসে মোটা টাকার চাকরি করছে। ছেলে, আমরা বলতে পারি জুয়েল—জুয়েল একেবারে—মানে হীরের টুকরো।

মধুসূদনবাবু বললেন, সে ছেলে নয়, এ হচ্ছে বড় সরিক, অধর বিশ্বাসের ছেলে। এর নাম···

নিতাই হালদার বললে, বুঝেছি, সমর বিশ্বাস—তা—

মধুসূদনবাবু বললেন, এখানেও আমরা খরচপত্তর করব। আমি শুধু জানতে এসেছি এঁদের অবস্থা কেমন। আর কিছু নয়, বুঝতেই তো পারছেন, এত টাকা খরচ করে বোনের বিয়ে দিচ্ছি, শেষকালে যেন—

নিতাই হালদার তো হো হো করে হেসে উঠল।

মধুসূদনবাবু বললেন, হাসছেন যে?

নিতাই হালদার বললে, আপনি হাসালেন মশাই, দেখছেন গাড়ি কিনলে সেদিন বারো হাজার টাকা দিয়ে, এখনও বিশ্বাস-গিন্নীর জন্যে ভূষণের দোকান থেকে রোজ দু'টাকার পানের খিলি যায়, জানেন? রোজ দু'টাকার পান, চারটিখানি কথা নয়। বিশ্বাস না হয় ওই, ওই যে পানের দোকানটা দেখছেন, ওর মালিক ভূষণকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।

মধুসূদনবাবু কিছু বললেন না।

একটু থেমে বললেন, ঘটকও তাই বলছিল বটে, কিন্তু ঘটকের কথা তো সব বিশ্বাস করা যায় না।

নিতাই হালদার বললে, রোজ দশ-টাকার কাঁচা বাজার যায় ওদের বাড়িতে, আমি নিজের চোখে দেখেছি, শোনা কথা নয়। তা ওসব কথা ছেড়ে আর কী জানতে চান বলুন ?

সেদিন আর বেশি কথা হয় নি। ভদ্রলোক সব শুনে-টুনে চলে গিয়েছিলেন। পাত্র কেমন, সে-সব কথা তিনি জানতে চান নি। পাত্রের নাম সমরচন্দ্র বিশ্বাস, বিশ্বাস-বাড়ির অধরচন্দ্র বিশ্বাসের একমাত্র ছেলে। ওর আর পরিচয় কী! কেউটের বাচ্চা—জাতসাপের বাচ্চা। কিছু নেই-নেই করেও এক ঘণ্টার নোটিসে লাখ টাকা বার করে দিতে পারে লোহার সিন্দুক খুলে। কথায় বলে বিশ্বাস-বাড়ি! লাটসাহেব যে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসত এখানে এলে—সেই বংশ!

বরানগরের লোক সবাই একদিন দেখলে বিশ্বাস-বাড়িতে উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। হোগলার ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে বাড়ির ছাদে। বাড়িটার গায়ে কলি ধরানো হয়েছে, পুকুরের পানা সাফ হয়েছে। মোটরগাড়িটা ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে। সরকার মশাই কানে কলম দিয়ে এদিক-ওদিক করছে।

অধর বিশ্বাস রোজকার মত পুকুরঘাটের সামনে এসে বসেন। চার-পাঁচজন লোক হাত-জোড় করে তাঁকে ঘিরে রয়েছে। রাস্তা থেকেই সব দেখা যাচ্ছিল। ঘাটের ওপর ঝুড়ি-ধামা নামিয়েছে। সব ঝাড়া-ধোয়া-মোছা হবে। মাছ আসছে, মিষ্টি আসছে, দই আসছে।

গাড়িটা কেনা হয়েছিল অধর বিশ্বাস নিজে চড়বেন বলেই।

কিন্তু ডাক্তার বারণ করে গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, গাড়ির জার্ক আপনার সহ্য হবে না। ওটা চড়বেন না।

—তা হলে কী করব ? গাড়িটা যে কিনলাম মিছিমিছি !

ডাক্তার বলেছিলেন, তা গাড়ি বড় না জীবনটা বড় ? ভাল হয়ে সেরে উঠুন, তখন গাড়ি চড়বেন।

অধর বিশ্বাস সত্যিই একদিনও গাড়ি চড়তে পান নি। কেনাই তাঁর সার হয়েছিল। ওই পুকুরঘাটের পৈঠেটার সামনে গিয়ে বসতেন আর হাওয়া খেতেন বালাপোষ গায়ে দিয়ে। নিস্তারিনীরও চড়া হয় নি।

সমর বলত, মা বেড়াতে যাবে নাকি কোথাও!

নিস্তারিনী বলতেন, আমি আর কোথায় যাব বাবা। আমার বলে বাতের ব্যথার জ্বালায়—

সমর বলত, বেড়ালে বাত সেরে যেত তোমার।

নিস্তারিনী বলতেন, উনি ভাল হয়ে উঠুন, তখন না হয় যাবো'খন একদিন।

সমর বলত, তাহলে আমিই যাই ?

—যাও।

এই পর্যন্ত। কোথায় সমর যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে প্রশ্ন কেউই করেন নি সমরকে। ছোটবেলা পড়েছে মামার বাড়ি থেকে—তারপর একটু বড় হয়ে বরানগরে এসেছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পর্যন্ত মিশতে দেওয়া হয় নি তাকে। ছোটবেলায় বুড়ো চাকর ছিল একটা—বিধুবদন।

ঝি সাজিয়েগুজিয়ে দিত খোকাকে। ঝিয়ের হাতেই ভার ছিল খোকাবাবুর। খাওয়া থেকে শুরু করে ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত। সমস্ত বাড়িটার ভেতর ছিল সমরের জগৎ। এ-ঘর থেকে ও-ঘর। এ-মহল থেকে ও-মহল। বিধুর সঙ্গে ছাড়া বাইরে বেরোন নিষেধ। বাইরে যাবার দরকারও ছিল না খোকাবাবুর। অত বড় বাড়ি। বাড়িটাই যেন একটা পৃথিবী। তখন অনেক ছেলে ছিল, মেয়ে ছিল বাড়িতে।

বসন্ত ছিল ছোট তরফের।

বসন্ত বলত, এই লুকোচুরি খেলবি ?

সমর বলত, খেলব।

বসন্ত বলত, আমি লুকোব, আর তুই খুঁজবি আমাকে।

তারপর বসন্ত লুকোত গিয়ে কোথায় আর সমর খুঁজত। এ-বাড়ি ও-বাড়ি। সিঁড়ির আর ছাদের ওপরে, উঠোনের কোণে। বিরাট-বিরাট আলমারি, বিরাট-বিরাট লোহার সিন্দুক। পুবদিকের বারান্দার পাশে ছিল বাসন-কোসনের তাক। সেখানে থাকত জলের জালা। মাটির বিঁড়ের ওপর বসানো থাকত জালাগুলো। রাত্তিরবেলা টিম্‌টিমে আলোয় ওগুলোকে দেখলে খুব ভয় হতো। মনে হতো যেন জুজুবুড়িরা ওখানে ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে বসে আছে সব।

বসন্ত বলত, এই সমর, বাগানে যাবি ?

—বাগানে ?

ছোটবেলায় বাগানে যাওয়াও নিষেধ ছিল খোকাবাবুর। তেঁতুল গাছটার ডালপালা দেখলে কেমন ভয় করত রাত্তিরবেলা। দিনের বেলাতেও যেন গা ছম্‌ছম্‌ করত। মালীরা ঘাস কাটত, কুমড়োর মাচা বানাত। বাগানের উত্তর কোণে ছিল একটা বিলিতি আমড়ার গাছ। আমড়া গাছের ডালে একটা বুলবুলি পাখির বাসা ছিল। বিধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কতদিন হাঁ করে চেয়ে

দেখেছে। ন্যাজের তলার দিকটা কেমন টক্‌টকে লাল। লোকের পায়ের আওয়াজ পেলেই পাখিটা উড়ে পালাতো ফুড়ুৎ করে। আমড়া গাছটার পাশে ছিল একটা সজনে গাছ। গাছগুলো হঠাৎ একবার পাতাগুলো ঝরিয়ে একেবারে ন্যাড়া হয়ে যেত, আবার কখন কচিপাতা বুকে নিয়ে ফুলে-ফলে ভরে উঠত।

বিধুবদন মাঝে মাঝে সাবধান করে দিত।

বলত, ওদিকে যেয়ো না খোকাবাবু, সাপ আছে, জলঢোঁড়া সাপ।

জলঢোঁড়া সাপ ছিল পুকুরে। জলের ওপর মাথাটা একটু ভাসিয়ে সাঁতার দিয়ে বেড়াত এক-একটা সাপ। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও এক-একদিন ভয়ে আঁতকে উঠেছে সমর।

—সাপ, সাপ—সাপ !

পাশেই শুয়ে থাকত বিন্দু। বিন্দু-ঝি।

বলত, কী হল খোকাবাবু, কী হল ?

আবার পিঠটা চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত বিন্দু-ঝি। অঘোর অচেতন ঘুম। ঘুম ভাঙার পর সকাল বেলা আর রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে থাকত না। সকাল বেলা তখন রোজকার মত বিশ্বাস-বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেছে চারদিকে। একতলায় সরকার মশাইয়ের ঘরে লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। পেছনের বাড়িতে কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজতে শুরু করেছে ঠিকে ঝি-এর দল। অনন্ত মস্ত বড় একটা ন্যাতা নিয়ে ঘর মুছতে লেগেছে। রান্না-বাড়িতে ওদের ভাগের রান্না চড়েছে বড় বড় তামার হাঁড়িতে। বাজার এসে পড়েছে রান্না-বাড়ির দাওয়ায়। পটল, আলু, বেগুন, কপি গড়াগড়ি যাচ্ছে। পাশেই বাটনা বাটছে পদ্মপিসী।

পদ্মপিসী বলত, এই নাও খোকাবাবু—বাটনা নেবে তো নাও।

কেউ যখন কোথাও থাকত না, তখন খোকাবাবুকে বাটনা দিত পদ্মপিসী। আলুর মত গোল একতাল বাটনা। হলুদের বাটনা। তারপর বিন্দুকে দিয়ে পুকুরপাড় থেকে এঁটুলে মাটি নিয়ে এসে পুতুল গড়ত। সেই পুতুলের ওপর হলুদ-বাটা দিয়ে বাহার হত। তারপর সেই পুতুলের পূজো হত আবার। পূজোর নৈবিদ্য হত, প্রসাদ হত। রান্নাবাড়ি থেকে মূলোটা কলাটা নিয়ে এসে থরে থরে সাজানো হত।

খোকাবাবু বলত, প্রসাদ খাবি না ?

বিন্দু খেত। বিধুবদন খেত। আসলে খেত কি ফেলে দিত কে জানে।

সমর জিজ্ঞেস করত, মিষ্টি লাগছে ?

বিন্দু বলত, হ্যাঁ।

সমর বলত, বিধু তোর মিষ্টি লাগছে ?

তা নতুন বউএরই কপাল বলতে হবে। নতুন বউ। মোটরে করে ঢোকবার সময় ভাল করে দেখে নি চেয়ে। দেখবার সুযোগই হয় নি। ঘোমটা দেওয়া ছিল। গাড়িটা এসে থামল। থামতেই নহবৎ বেজে উঠেছে। উলুর শব্দ এসেছে, শাঁখের শব্দ এসেছে। আর কিছু টের পায় নি। বিয়েবাড়ির লোক-জন উৎসব-অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে কিছু আর ভাববার অবসরই হয় নি। ঘোমটা দিয়ে বেনারসীর আর গয়নার ভারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। এক-একজন এসেছে আর বউ সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। বউ-এর প্রশংসা করেছে।

কেউ বলেছে, বাঃ, আলো-করা বউ এসেছে খোকার।

কেউ বলেছে, তা মেয়ের বাপ নাই বা থাকল, দাদাও বেশ দিয়েছে গা।

কেউ বলেছে, ফুলশয্যার তত্ত্ব দিয়েছে দেখবার মত মাসীমা—ছ'সেট গয়না।

কারোর মুখ দেখা যায় না। শুধু কথাগুলো কানে এসেছিল।

—এই সমর, তুই যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস বড়, বউএর পাশে দাঁড়া, আমরা যুগল-মিলন দেখি।

ফুলশয্যার রাত্রে ক্রমে ক্রমে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। একটা টেবিল ল্যাম্প জলছিল টিমটিম করে। সমস্ত খাটটা ফুলে ফুলে ভরা। বউ বিছানার এক-কোণে জড়সড় হয়ে মাথা হেঁট করে বসে ছিল।

সমর কাছে সরে এল।

বললে, তুমি শুয়ে পড়।

নতুন বউ। বেনারসীর ঘোমটার আড়ালে মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। শুধু গলার আর কানের গয়নাগুলো পাতলা শাড়ির ভেতর থেকে ঝক্‌ঝক্ করছে। সমরের কথা যেন নতুন বউ শুনতে পেলে না।

সমর বললে, তোমার খুব পরিশ্রম গেছে আজ। ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি আলো নিবিয়ে দিচ্ছি।

ভেবেছিল হয়ত আলো নেবাবার কথায় বউ কথা বলবে। হয়ত নড়েচড়ে উঠবে। কিন্তু কিছুই করলে না কনকলতা।

সমর বললে, তোমার নাম কনকলতা ?

কনকলতা চুপ করে রইল।

সমর বললে, ডাকনাম নেই তোমার ?

কনকলতা এবার মাথা নাড়ল।

সমর আবার জিজ্ঞেস করলে তাহলে, আমি তোমায় কী বলে ডাকব ? অত বড় নামে কিন্তু ডাকতে পারব না তোমায়।

কনকলতার মাথাটা যেন একটু নড়ে উঠল। বোধ হয় হাসছে।

সমর তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা তুলতেই কনকলতা চোখ বুজিয়ে ফেলেছে। সমর দেখলে কনকলতা হাসছে না তো। তার চোখ দিয়ে তখন টপ টপ করে জল পড়ছে।

কোঁচার খুট দিয়ে সমর নতুন বউএর চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।

বললে, এ কি, কাঁদছ কেন তুমি কনক ? আজ কি কাঁদতে আছে ?

কনক চোখ দুটো বুজে সরে বসতে চেষ্টা করল।

সমর জোরে ধরে রইল কনকের মুখখানা।

বললে, ছি কাঁদছ কেন ? আমাদের ফুলশয্যার রাতে কান্না কি ভাল ?

তারপর কী যেন মনে হল সমরের। সমর মুখটা ছেড়ে দিয়ে পাশ থেকে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসল। যদি তাই-ই হয়! কনক লেখাপড়া শেখা মেয়ে, কাঁদবার বয়স তো তার চলে গেছে। দিদিদের বিয়ের সময় দেখেছে, দিদিরা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। দিদিদের অনেক কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল সব।

সমর বললে, কেন কাঁদছ সত্যি করে বল তো ?

কনক আরও কাঁদতে লাগল। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল।

—লক্ষ্মীটি, বল না কাঁদছ কেন ?

অনেক করে খোশামোদ করেছিল সমর সেদিন। অনেকদিন পরেও সমরের মনে ছিল সে-সব দিনের কথা, সেই ফুলশয্যার রাত্রের কথাগুলো। সে-জীবনের স্মরণীয় একটি রাত্রের স্মৃতি।

সমর জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে পছন্দ হয় নি তোমার, না ? সত্যি করে বল।

মিসেস দাশের সঙ্গে যখন পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সমরের, তিনিও জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওই একটা রাতই শুধু তোমার বউকে দেখেছিলে ?

সমর বলেছিল, হ্যাঁ।

মিসেস দাশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু কেন কাঁদছিল তার উত্তর পেয়েছিলে ?

সমর বলেছিল, ঠিক কারণটা আজও জানতে পারি নি।

মিসেস দাশ আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেই-ই কি তোমার কনকের সঙ্গে শেষ দেখা ?

মিসেস দাশ আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারপর কী হল ?

—তারপর আমি আবার কনকের পাশে গিয়ে বসলাম। কনকের একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিলাম। হাতটা যে কত নরম তা আজও আমার মনে আছে। অনেকদিন রাত্রে নিজের ডান হাতটাই আবার বাঁ হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখি। মনে হয় কনকের হাতটাই বুঝি টিপছি, ঠিক যেমন করে কনকের হাতটা টিপেছিলাম সেদিন। কিন্তু কত তফাৎ! সারা রাত আমার এক-একদিন ঘুম হয় না, আমি চোখ বুজে কাঁদি কেবল।

বলতে বলতে সমর হঠাৎ শিশুর মত কেঁদে ওঠে।

মিসেস দাশ সামনে ঝুঁকে পড়ে নিজের ক্রেপ সিল্কের শাড়ির আঁচলটা দিয়ে সমরের চোখ দু'টো মুছিয়ে দেন।

বলেন, না না, কাঁদতে নেই, ছি—তুমি কী থাবে বল, বড় উইক্ তুমি, বড সেন্টিমেণ্টাল তুমি।

আবার বলেন, একটু স্ট্রং করে এক কাপ চা দিতে বলব আবদুলকে ? আবদুল মিস্টার দাশের খানসামা।

সমর বলে ওঠে, না না মিসেস দাশ, আমি এখানে এসে কেবল আপনাকে বিরক্তই করি—আমি উঠি বরং।

মিসেস দাশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বলেন, না, না, উঠবে কেন ? বিরক্ত তো আমি মোটেই হই না। তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। তোমার কষ্টটা আমি সত্যিই খুব ফীল্ করতে পারি। আচ্ছা চা থাক, বরং এক কাপ কফি করতে বলি আবদুলকে।

বলে মিষ্টি গলায় ডাকেন, আবদুল!

সমর বললে, আপনার পায়ে পড়ি মিসেস দাশ, আপনি যেন এ সব কথা মিস্টার দাশকে বলবেন না।

—কেন, বললে কী হয়েছে ? মিস্টার দাশ আর আমি কি আলাদা ?

—আলাদা নন্ কিন্তু আপনাকে আমি মনের কথা যেমন করে বলতে পারি, আর কাউকে তেমন করে বলতে পারি না। আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝতেও পারবে না। সবাই হাসবে। আমি থাকি একটা থার্ড ক্লাস মেসে। মাধব সিকদার লেন-এর মেসের লোকেরা কেউ জানে না যে, আমি বরানগরের

বিশ্বাস-বাড়ির ছেলে। জানে না এককালে আমিই নিজের গাড়ি চালাতাম! এককালে আমাদের বাড়িতেই গভর্ণর আসত খানা খেতে। এক আপনাকে ছাড়া কাউকে আমি বলি নি সে-সব কথা। সে-সব দিনের কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন!

মিসেস দাশ সমরের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সত্যিই তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয় সমর—কফিতে চিনি হয়েছে ঠিক?

সমর কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে, হ্যাঁ।

মিসেস দাশ সান্ত্বনা মেশানো গলায় বললেন, তুমি বড় সেন্টিমেণ্টাল সমর। এত সেন্টিমেণ্টাল হলে চলে পৃথিবীতে?

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ের আগে কারো সঙ্গে লাভে পড়েছিলে? অর্থাৎ কাউকে ভালবেসেছিলে?

সমর চোখ তুলে চাইলে মিসেস দাশের দিকে।

মিসেস দাশ বললেন, না না, আমার সামনে লজ্জা কোর না তুমি। আমি তোমার ওয়েল-উইশার—আমি তোমার ভালই চাই। তোমার গাড়ি ছিল, বাড়ি ছিল, সময় ছিল—চেহারা ছিল, স্বাস্থ্য ছিল—কাউকে ভালবাসনি?

সমর বললে, আমি অনেককে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম কিন্তু ভালবাসা আপনি কাকে বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিসেস দাশ হাসলেন না। তেমনি মিষ্টি গলায়ই বললেন, ভালবাসা জান না?

সমর বললে, সত্যি বলছি মিসেস দাশ, আপনার সঙ্গে আলাপ হবার আগে ভালবাসা কাকে বলে জানতামই না।

মিসেস দাশ খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠেন।

বললেন, দূর বোকা ছেলে কোথাকার। আমার ভালবাসা কি সেই ভালবাসা নাকি? আমি এ ভালবাসার কথা বলছি না।

মিসেস দাশের বয়স হয়েছিল অনেক। অন্ততঃ সমরের চেয়ে সাত বছরের বড়। কিন্তু পাউডারে লিপস্টিকে রুজে আলতায় পোশাকে পরিচ্ছদে মিসেস দাশ যেন সব সময় ঝলমল্ করতেন।

মিসেস দাশ হাল্কা সুরে হেসে উঠলেন।

বললেন, আমি এ ভালবাসার কথা বলছি না। কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের মনের টান, তার কথা বলছি। বিয়ের আগে কারো সঙ্গে ভালবাসা হয় নি? কাউকে নিয়ে সিনেমায় যাও নি—কোনো মেয়ের সঙ্গে!

সময় মনে করে বললে, না।

মিসেস দাশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে চুমু খাও নি ?

মিসেস দাশ কথাটা সহজ সুরেই বললেন। কিন্তু সমরের চোখ মুখ যেন গরম হয়ে উঠল। কথাটা শুনে লজ্জায় যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল কান দুটো।

মিসেস দাশ বললেন, লজ্জা কী ! আমার কাছে বলতে লজ্জা কী ! আমি জিজ্ঞেস করছি অন্য কারণে।

সমর মুখ নিচু করে বললে, না।

—কাউকে না ?

সমর বললে, ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু···

মিসেস দাশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, কনককে ?

সমর বললে, কনককে চুমু খেয়েছিলাম—সেই ফুলশয্যার রাত্রে।

মিসেস দাশ বললেন, ঠিক করেছ, হাসব্যাণ্ডের কাজই করেছ। কিন্তু তার কান্না থেমে গিয়েছিল তোমার চুমু খাওয়ার পর ?

সমর বললে, হ্যাঁ, কান্না থেমে গিয়েছিল।

মিসেস দাশ বললেন, থেমে যাবেই তো।

সমর জিজ্ঞেস করলে, আপনি কী করে জানলেন ?

মিসেস দাশ বললেন, আমি জানি। আমি নিজে মেয়েমানুষ, আর জানব না ? যাক তারপর ?

তারপর ?

মিসেস দাশের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সমর তার জীবনের সমস্ত গোপন কথা খুলে বলত। এতদিন কাউকে কোনও দিন কিছু বলতে পারে নি। মাধব সিকদার লেন-এর মেসে আসবার পর থেকে যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল সে! সমস্ত মেস-বাড়িটা যেন বড় নোংরা লাগত তার কাছে। সারাদিন অফিসের বন্ধ-ঘরখানার মধ্যে কাটাবার পর এসপ্ল্যানেডের ফাঁকা হাওয়ায় এসে খানিকক্ষণ হাঁফ ছেড়ে দাঁড়াত। ওপাশে কার্জন পার্ক, তার ওপাশে ইডেন গার্ডেনস্, তার ওপাশে গঙ্গা। অনেকক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়াত সমর। পাশ দিয়ে একটা নতুন গাড়ি হর্ন দিয়ে সাবধান করতে করতে চলে যেত। সমর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখত সেদিকে। ড্রাইভিং জানে না লোকটা। নতুন ড্রাইভ করতে শিখেছে। মাঠে চিনেবাদাম কিনে খেতে খেতে যেত। যেন মেসটায় না ফিরলেই ভাল হয়। যেন ফিরতে মন চাইত না। আবার সেই মাধব সিকদার লেন। আবার সেই গোটানো বিছানাটা

টেনে চিত হয়ে পড়া। সিলিং-এর গায়ে ধোঁয়ার ঝুল, দেয়ালে মাকড়সার বাসা, সন্ধ্যেবেলা রান্নাঘরের ধোঁয়ায় দম আটকে আসা।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করত, বাবু, কাল ভাত খান নি?

সমর বলত, খিদে ছিল না, ওগুলো তুমি ভিখিরীদের দিয়ে দিয়ো।

ঠাকুর বুঝত সব। বলত, বাবু, আপনাদের কি আর এই খাওয়া রুচবে!

ঠাকুর বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। হাব-ভাব চালচলন বখশিশ দেওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছিল। নিশ্চয়ই বড় ঘরের ছেলে, অবস্থার ফেরে মেসে এসে বাস করছে।

পূজোর সময় দশ টাকার নোট বখশিশ পেয়ে ঠাকুর বললে, আপনাকে ভাঙিয়ে এনে দিচ্ছি টাকাটা।

সমর বলত, না ঠাকুর, ভাঙিয়ে আনতে হবে না, ও পুরোটাই তোমার পূজোর বখশিশ।

এক-একদিন দেরি হত অনেক। বাবুরা বেশির ভাগই শনিবার-শনিবার বাড়ি চলে যায়। রবিবার মেস ফাঁকা।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করত, আপনার দেশ কোথায় বাবু?

—দেশ?

সমর বলত, কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ঠাকুর?

ঠাকুর বলত, সবাই দেশে যায়, সবাই হপ্তা কাটায় বাড়িতে, আপনি তো কোথাও যান না?

সমর হঠাৎ বলত, এ কি ঠাকুর, আজ যে চারখানা মাছ—ব্যাপার কী?

—খান্ না বাবু, বাবুরা কেউ নেই, তাই আপনাকে দিলাম।

সমর জিজ্ঞেস করত, তোমাদের আছে তো?

অথচ বরানগরের বিশ্বাস-বাড়িতে বিন্দু সেধে সেধে খাইয়েছে। বিধু, বিধুবদন কত দিন ভয় দেখিয়ে দুধ খাওয়াত। দুধ এখন একফোঁটা চোখে দেখা যায় না। আর তখন বাড়ির গরু—সাতসের আটসের দুধ হত বাড়িতে। সেই দুধ খাওয়ার জন্যে বিধুবদনের সাধাসাধি। বাবা নিজে রোজ একসের দুধ খেতেন। তা ছাড়া ছিল ঘরে পাতা দই, ছানা, মিষ্টি, বাড়িতেই তৈরি হত পান্তুয়া রসগোল্লা মালপোয়া।

মা বলত, ও খোকা, খাবি নি, উঠলি কেন? মালপোয়া খেয়ে যা।

—আর খেতে পারব না মা, পেট ভরে গেছে।

—তাহলে বিকেলবেলা চায়ের সঙ্গে খাস, রেখে দিচ্ছি।

আর বিকেলবেলা! বিকেলবেলা বাড়ি এলে তো! কোথায় বরানগর, আর কোথায় বিদ্যাসাগর কলেজ। একেবারে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। কোথা দিয়ে চায়ের দোকানে, রেস্টুরেণ্টে, কমন-রুমে কেটে যেত দিন। তারপর সন্ধ্যে হত। 'মহৎ আশ্রমে'র গরম গরম চপ্ কাটলেট খেয়ে পেট ভরে যেত। আর বাড়ির কথা মনেও পড়ত না। দিন, রাত, মাস, বছরগুলো কেমন করে কেটে যেত টেরই পাওয়া যেত না। তারপর একদিন গাড়ি কেনা হলো।

অধর বিশ্বাস নিজে পছন্দ করে গাড়ি কিনলেন। কিন্তু চড়তে পেলেন না একদিনও। হার্ট বড় দুর্বল। ডাক্তার বারণ করলে গাড়ি চড়তে। মা-ও চড়তে রাজী নয়।

মা বললে, থাক, গাড়ি চড়লেই হবে, উনি ভাল হয়ে উঠুন।

সেই গাড়ি পড়ল তার হাতে। প্রথম প্রথম এক মাস ড্রাইভার ছিল। তারই পাশে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে ফাঁকা মাঠের এপর শিক্ষানবিশী চলল। শেষে দিন নেই, রাত নেই। আজ যশোর রোড ধরে সোজা যতদূর নজর যায় ততদূর। তার পরদিন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বরাবর সোজা।

গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াত একদিন এর বাড়ি, একদিন তার বাড়ি।

বরানগরের লোক হাঁ করে চেয়ে দেখত গাড়িখানার দিকে।

ভূষণের দোকানে পান কিনছে খদ্দেররা। এ বলে, আগে আমাকে দে ভূষণ। ও বলে, আগে আমাকে দে, আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ অধর বিশ্বাসের গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে।

নিতাই হালদার বললে, কে রে? কার গাড়ি?

তারপর নিজেই বুঝতে পেরে বলে, ও আমাদের বিশ্বাস-বাড়ির ছেলে! বাবা, অবস্থা খারাপ হলে কি হবে– মরা হাতি লাখ টাকা, আমি বলেছিলাম তোকে কেশব, তুই বলতিস্ এবার বাড়ি বিক্রী হবে ওদের—

কেশব বাঁড়ুজ্জে বলত, তুই না বলিস, পাড়ার সবাই সেই কথা বলত কিনা, আমি সেদিন অধর বিশ্বাসের চাকর ভূতোটাকে দেখলাম যে, এখনও রোজ দশ টাকার কাঁচা বাজার করে, বুঝলি—

ভূষণ বলত, এখনও রোজ দু'টাকার পান সাপ্লাই করি আমি, জানেন—নগদ—মাসে ষাট টাকা—

কিন্তু সেই বিশ্বাস-বাড়িরই যে এমন হবে কে জানত!

বিয়ে হলো, বরযাত্রী গেল। নহবৎ বসল বিশ্বাস-বাড়িরই বাগানে।

বাড়ি সারানো হল, কলি ফেরানো হলো। পুকুরের পানা সাফ করানো হলো। কর্তা অধর বিশ্বাস ঘাটের পৈঠের ওপর যেখানটায় বসতেন সেখানটা ভেঙেচুরে চুনসুরকি বেরিয়ে পড়েছিল, সেখানটা আবার মেরামত হলো। সদর গেটের একটা সিংহ চোখ খুবলে পড়েছিল, সেটাও সারিয়ে সাজানো হলো। গণ্যমান্য লোকের নেমন্তন্নও হলো। সাতখানা বাসভর্তি লোক বৃন্দাবন লেনে গিয়ে পেটভরে নেমন্তন্ন খেয়ে এল। কনের বাড়িতেও খাতির-যত্ন-আপ্যায়ন হলো কম নয়।

নিতাই হালদার খেলে, কেশব বাঁড়ুজ্যেও খেলে। খেয়েদেয়ে পান চিবোতে চিবোতে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে, ভাল খাইয়েছে মাইরি।

কেশব বাঁড়ুজ্যে বললে, পোনা মাছের কালিয়াটা বেড়ে করেছিল, না রে ?

নিতাই বললে, কেন, দই ? আসল মোল্লাচকের।

কেশব বললে, পানটাও বেশ মিষ্টি রে, মিঠে পান, ঝাল নেই।

ভূষণ বললে, বউভাতে আমি বিশ্বাস-বাড়িতে পাঁচহাজার খিলির বায়না পেয়েছি।

কন্যাকর্তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই মধুসূদন সেন। হাতজোড় করে সামনে এলেন। হাসিমুখ। ভারি খুশী হয়েছেন যেন।

বললেন, কেমন হয়েছে বলুন। আমি তো দেখতে পারলাম না সব দিকে। একলা মানুষ।

নিতাই হালদার বললে, তখনি আপনাকে বলেছিলাম সেন-মশাই। কুটুম হবে মনের মতন—কেমন বলেছিলাম কিনা বলুন।

মধুসূদনবাবু বললেন, না, বিশ্বাস-মশাই খাসা লোক, একটা পয়সা পণ নেন নি। বললেন, বিশ্বাস-বংশে পণ নেওয়া পাপ। বাবা তো টাকা রেখেছিলেন বোনের বিয়ের জন্যে, তাই সবটাই গয়না-গাঁটি দান-সামগ্রীতে দিয়ে দিলাম।

সত্যিই একটা পয়সাও নগদ নেন নি বিশ্বাস-মশাই। ছেলে বিক্রী করেছেন নাকি যে পণ নেবেন! সে নেবে ওরা—ওই যারা দুপুরুষে বনেদি বড়লোক হয়েছে।

কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই বিপদ ঘটল। বউভাতের উৎসবে অতিথি সজ্জনরা এসে গেছেন। সারা বাড়ি জমজমাট। নহবৎ বসেছে দেউড়িতে। এক এক ব্যাচ আসছে আর খেয়েদেয়ে চলে যাচ্ছে। অধর বিশ্বাসের বাড়ির ভেতর নতুন বউকে সিংহাসনের ওপর সাজিয়ে বসানো হয়েছে। আহা, সাজিয়েছে বেশ! বিশ্বাস-বাড়ির লক্ষ্মী এসেছেন। এবার বাড়ি মানাবে ভাল।

যাঁদের অবস্থা ভাল ছিল তাঁরা বাড়ি করেছেন। কবে আবার মরে গিয়েছেন। এবার বাকি ছিলেন অধর বিশ্বাস। টিমটিম করে জ্বলছিলেন। লোকে ভাবত, এঁরা পড়তি। এঁদের আর কোনও আশা নেই। এবার বাড়ি ভেঙে ভেঙে পড়বে। দফে দফে 'বিক্রী হয়ে যাবে সব। তারপর যেমন হয় সব ক্ষেত্রে তাই হবে।

কিন্তু প্রথম ভুল ভাঙল অধর বিশ্বাসের গাড়ি কেনার পর।

সরকার একবার জিজ্ঞেস করেছিল, এই সময়েই গাড়ি কিনবেন কর্তাবাবু ?

অধর বিশ্বাস বলেছিলেন, হ্যাঁ, এটা না কিনলে আর মান থাকে না।

—আজ্ঞে, গাড়ির দামটা তো দেখবেন !

অধর বিশ্বাস বলেছিলেন, সে তোমার ভাবতে হবে না। আমি তো এখনও বেঁচে আছি।

সমরও একদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল খবরটা শুনে। শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই যখন গাড়ি এল বাড়িতে, তখন দেখলে। নিস্তারিণী খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছিলেন। ছেলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, মা, গাড়ি এল যে !

নিস্তারিণী বললেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন, যাঁর গাড়ি তাঁকে বল্ ?

গাড়ি এল বটে। কিন্তু অধর বিশ্বাসকে আর চড়তে হলো না তাতে। সেই দিন থেকেই শরীর খারাপ হলো। একটু একটু করে শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। ডাক্তার এলেন। বললেন—না, গাড়ি চড়া চলবে না এখন। এখন হার্টের অবস্থা খারাপ—

নিস্তারিণী বলতেন, তোর গাড়ি চালাতে শখ হয়েছে তো কর্তাকে বল্ না গিয়ে ?

কিন্তু সাহস ছিল না ছেলের কর্তার সামনে গিয়ে কথা বলবার।

শেষে বললেন নিস্তারিণী। বললেন, গাড়িটা তো পড়েই রয়েছে—খোকা বলছিল—

অধর বিশ্বাস বিছানায় শুয়ে চোখ খুললেন। কিছু বললেন না মুখে। বোঝা গেল রাগ করেন নি তিনি। ছেলে যদি চালাতে চায় তো চালাক। তিনি আর ক'দিন।

সেই ছেলে একদিন গাড়ি বার করলে। তেল কেনবার টাকা দিলেন নিস্তারিণী।

সময় কাছে এসে একবার শুধু বললেই হলো।

নিস্তারিণী বুঝতে পারতেন। বলতেন, কী রে, তেল ফুরিয়ে গেছে বুঝি? বলে আঁচলের চাবি খুলে সিন্দুক থেকে টাকা বার করে দিতেন।

বলতেন, দেখিস্ খোকা, সাবধানে চালাবি, ধাক্কা-টাক্কা লাগাস্ নে যেন।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে সময় তখন যেতে ব্যস্ত।

বললে, না মা আমি খুব সাবধানে চালাই, আমি বেশি দূরে তো যাই না।

বেশি দূরে যায় না বললেই কি বেশি দূরে না গিয়ে থাকতে পারা যায়! বরানগর থেকে গাড়ি বেরিয়ে সোজা শ্যামবাজারে চলে আসে। সেখান থেকে কলেজ স্ট্রীট। কলেজ স্ট্রীট থেকে ভবানীপুর। ভবানীপুর থেকে বালিগঞ্জ। দলবল জুটিয়ে নিয়ে খোকা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে। পাল্লা দিয়েছে ট্রেনের সঙ্গে। একেবারে যশোর রোড ধরে সোজা যত দূরে দৃষ্টি যায়। আস্তে আস্তে গ্যারেজের টিনের দরজার চাবিটা খোলে। শব্দ না হয়। বাবার না ঘুম ভাঙে।

তারপর আবার একদিন নিস্তারিণীর সামনে গিয়ে হাজির হতে হয়।

বলেন, কী রে, গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেছে বুঝি?

খোকা বলে, না মা, আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে হবে।

—পঞ্চাশটা?

বলে আঁচলের চাবি খুলে টাকা বার করে দিতেন।

বন্ধুরা বলত, চল্ সময়, তোর গাড়িতে করে কাশ্মীর যাই।

নানান বন্ধু নানান পরামর্শ দিত। কোথা থেকে টাকা আসছে, কোথা থেকে টাকা আসবে সে-সব ভাবনার দরকার ছিল না। হাত পাতলেই সব দেন নিস্তারিণী। বড় বাধ্য ছেলে খোকা। একমাত্র ছেলে।

অধর বিশ্বাস যখন বালাপোশটা গায়ে দিয়ে পুকুরের ঘাটে এসে বসেন, হাওয়া খান, তখন একটু দ্বিধা হয়। কিন্তু টিপিটিপি পায়ে গাড়িটা বার করে নিয়েই বেরিয়ে যায় পাশ দিয়ে। একটা যান্ত্রিক শব্দ হয় শুধু। একটু ধোঁয়া ওড়ে। কিন্তু একবার কর্তার চোখের আড়াল হলেই আর ভাবনা নেই।

শব্দটা পেয়েই অধর বিশ্বাস একটু মাথাটা ঘোরান।

—কে?

কেউ সাড়া দেয় না। আশেপাশে কেউ থাকে না।

আবার বলেন, কে?

কে সাড়া দেবে? ততক্ষণ গাড়িটা অনেক দূরে চলে গেছে। বাগানের বাইরে বড় রাস্তায় একটু একটু ধুলো উড়ছে তখনও। সেই দিকে চেয়ে

নিঃশব্দে বসে থাকেন অধর বিশ্বাস। আর মনে মনে কী ভাবেন কেউ জানতে পারে না।

জানতে পারল সমরের ফুলশয্যার রাত্রে।

তখন অনেক রাত হয়েছে। নিমন্ত্রিত যাঁরা, তাঁরা সবাই চলে গেছেন। কলকাতার একদল বন্ধু-বান্ধব এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে, তারাও চলে গেছে। নহবৎও থেমে গেছে। শুধু বাড়ির বাগানে তখনও এঁটো কলাপাতা আর উচ্ছিষ্ট নিয়ে কুকুর আর ভিখারীদের ভিড় রয়েছে।

সমর বললে, আমি তোমায় কনক বলেই ডাকব, কেমন ?

নতুন বউ-এর চোখের জল ততক্ষণে বুঝি একটু শুকিয়ে এসেছে। কিছু কথা বললে না সে।

সমর বললে, আজ ফুলশয্যা, আজকে আমার সঙ্গে কথা বলতে হয়, তা জান তো ?

নতুন বউ বুঝি এতক্ষণে মুখ তুলল।

সমর বললে, বন্ধুরা বললে তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে, সবাই তোমার প্রশংসা করছিল।

নতুন বউ মুখ নিচু করে ফেললে। সমরের মনে হলো নতুন বউয়ের মুখে যেন একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

সমর বললে, এতদিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেই ঘুরে বেড়িয়েছি, এবার তোমাকে নিয়ে ঘুরব।

তারপর একটু থেমে বললে, চল, এবার গরমের সময়ে কাশ্মীর যাবে ?

নতুন বউ এতক্ষণে আর একবার বুঝি মুখ তুলে চেয়েছিল।

সমর বলেছিল, মা'কে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে বুঝি ?

নতুন বউ মাথা নেড়েছিল।

সমর বলেছিল, তবে আর কি। আমি থাকব সঙ্গে, দু'জনে আরাম করে যাব, আমার সঙ্গে যেতে ভয় করবে না তো ?

এবার সত্যি সত্যি স্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল কনকলতার মুখে।

সমর বলেছিল, বাঃ, হাসলে তো তোমাকে খুব ভাল দেখায়, আর একবার হাস না, লক্ষ্মীটি আর একবার হাস না।

ঘরের দরজা জানালা সব নিখুঁত করে বন্ধ করা ছিল। বাইরের শব্দ বেশি কানে আসার কথা নয়। তবু হঠাৎ সমরের যেন মনে হয়েছিল, বাইরে যেন

কিসের গোলমাল। যেন অনেক লোকে ওঠা-নামা করছে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে।

আর তারপরেই দরজায় কে যেন ঠক্‌ঠক্‌ করে ঘা দিয়েছিল।

—কে ?

বিরক্ত হবার কথাই। সমর তবু মেজাজটা ঠিক রেখে ভেতর থেকে হেঁকেছিল, কে ?

—আমি খোকাবাবু, বিধু, বিধুবদন !

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতেই দেখে বিধুর কাঁদোকাঁদো মুখ। সমরকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও সে কিছু কথা বলতে পারছে না।

সমর বললে, কী হয়েছে, বল্‌ না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কেন, বল্‌ ?

বিধু বললে, খোকাবাবু, বাবু কেমন করছেন !

—বাবা !

সমর যেন আকাশ থেকে পড়ল। অধর বিশ্বাস ঠিক সময়ই খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। তাঁর আলাদা ব্যবস্থা হয়েছিল, ঠিক সময় মত। তিনি বেশি নড়াচড়া করেন নি। বেশি নড়াচড়া করা ডাক্তারের বারণ ছিল। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন।

কাছে গিয়ে অনেকে বলেছিল, বেশ বউ হয়েছে বিশ্বাস-মশাই, বিশ্বাস-বাড়ির উপযুক্ত বউ-ই হয়েছে।

বিশ্বাস-মশাই বলেছিলেন, তোমাদের খাওয়াদাওয়া সব হয়েছে তো ?

সবাই বলেছিল, সে-সব আপনাকে ভাবতে হবে না, আয়োজনের ত্রুটি হয় নি কিছু, পেট ভরে খেলাম বিশ্বাস-বাড়িতে অনেক দিন পরে, কুটুমও ভাল হয়েছে আপনার।

অধর বিশ্বাস বলেছিলেন, বউমার বাপ নেই তো, যা কিছু ওই ভাই-ই করেছে, আমি শুধু মেয়েটির রূপ দেখে এনেছি, বংশও দেখি নি, বাপ-মাও দেখি নি।

তাঁরা বলেছিলেন, আপনার বউমার রূপের তুলনা নেই বিশ্বাস-মশাই, রূপের যেন প্রতিমা !

তারপর একে একে সবাই চলে গেলেন। নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে বিশ্বাস-বাড়ি। অধর বিশ্বাস আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। তখনও কিছু কষ্ট হয় নি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন টের পান নি। নিস্তারিণীও এসে এক সময়ে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পাশে।

হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দে নিস্তারিণীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন তিনি। আলো জলছিল পাশের বাথরুমের ভেতর। সেই আলোতে দেখলেন কর্তা যেন কেমন করছেন।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠেই আলো জ্বালালেন। দেখলেন, কর্তার চোখমুখ যেন নীল হয়ে এসেছে।

ডাকলেন একবার, ওগো, শুনছ!

কোনও উত্তর পেলেন না। কী করবেন বুঝতে পারলেন না। বড় ভয় হলো। এমন তো হয় নি কখনও। দরজার বাইরে গিয়ে ডাকলেন, বিন্দু, অ বিন্দু!

বিন্দু আসতেই বললেন, একবার বিধুকে ডাক তো, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনবে।

ডাক্তারবাবু একটু আগেই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। আবার এলেন। দেখলেন পরীক্ষা করে। কিন্তু পরীক্ষা করবার তখন আর কিছু ছিল না। তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

বিধুবদন গিয়ে তখন খোকাবাবুর ঘরের দরজায় কড়া নেড়েছিল।

আর কিছু বলবার কিন্তু দরকার হলো না। নিস্তারিণী তখন কর্তার খাটের পাশে মাথা নিচু করে বসেছিলেন। বিধুবদন ছিল, বিন্দু ছিল। আত্মীয়-স্বজন, বিয়ে উপলক্ষে যারা এসেছিল বাড়িতে, সবাই তখন সেই ঘরে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সমরও এসে দাঁড়িয়েছিল। আর নিঃশব্দে মা'র কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

মিসেস দাশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারপর?

তারপরের ঘটনাও সব সবিস্তারে বলেছিল সমর। না বলেও উপায় ছিল না। এত বছর পরে একজনকে সব বলতে পেরে সমর যেন নিজেকে হাল্কা বোধ করছিল। যখন একা-একা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে কোথাও শান্তি পেত না সমর, ঠিক সেই সময়ে মিসেস দাশের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা যেন আশীর্বাদের মতন মনে হয়েছিল।

মনে আছে সে-রাত্রে আর কনকের সঙ্গে দেখা হয় নি সমরের। তখন সমস্ত বিশ্বাস-বাড়িটা শোকাচ্ছন্ন। মুমূর্ষু বাড়িটা যেন সমস্ত আনন্দটাকে এক মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলেছিল। সমস্ত উৎসব যেন কোন্ মন্ত্রে একেবারে বিষাদে পরিণত

হয়েছিল। কোথায় নতুন বউ, কোথায় রইল ফুলশয্যা—হঠাৎ যেন সমস্ত রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল কার যাদুদণ্ডে !

সকালবেলাই খবর পেয়ে কনকলতার দাদা এসে হাজির।

সবাই তখন শ্মশানে। শ্মশান থেকে ফিরতে দেরিও হলো সেদিন। অধর বিশ্বাস বরানগরের বিশিষ্ট লোক। খবর পেয়ে সবাই এসেছিল আবার। আগের দিন রাত্রে যাঁরা ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছেন, তাঁরাই আবার সকালবেলা সহানুভূতি জানাতে এলেন। কেউ কেউ শ্মশানে গেলেন। কেউ কেউ বাগান পর্যন্ত এসে মুখটা দেখিয়ে গেলেন। তখনও ম্যারাপ বাঁধা রয়েছে। এঁটো কলাপাতা, মাটির খুরি ছড়ানো বাগানের কোণে। কাক চিলের উৎপাত চলছে তখন।

মধুসূদন সেন চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখলেন। সব শুনলেন। কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করলেন।

দুঃখের রাতও কাটে। কিন্তু নিস্তারিণী সেই যে দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত দেন নি সেদিন থেকে, তাঁকে আর হাজার সাধ্য-সাধনা করেও খাওয়ানো গেল না। বালিগঞ্জ থেকে ছোট জা এসে বড় জা'র মাথার কাছে বসলেন অনেকক্ষণ। অনেক সান্ত্বনা দিলেন। যেমন পাঁচজনে বলে তেমনি সব কথা বললেন।

নতুন বউএর দাদা এসে তাঁর কাছেই কথাটা প্রথমে পাড়লেন।

বললেন, আপনাকে বলতেও সাহস হচ্ছে না, বাড়িতে এই বিপদ—কিন্তু না বলেও পারছি না। কনককে যদি দু'একদিনের জন্যে নিয়ে যেতে অনুমতি দিতেন।

নিস্তারিণী রাম-গঙ্গা কিছুই বললেন না। হ্যাঁ বললেন না, না-ও বললেন না।

মধুসূদনবাবু আবার বলতে লাগলেন, আমার বোন বলে বলছি না, ওকে আমরা চিনি তো, ও মুখে কিছু বলবে না—তবে মা'র বড় কষ্ট হচ্ছে, মা বলছিলেন এই সময়ে যদি একবার আপনারা মায়ের কাছে পাঠাতেন।

সমরের তখন অশৌচ অবস্থা। একখানা থান পরে খালি গায়ে গলায় কাছা দিয়ে বেড়ায়। হাতে আসন নিয়েছে। অশৌচ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একঘরে শোয়া নিষেধ। অত বড় বাড়ির মধ্যে কোথায় বউ থাকে, কোথায় সমর থাকে টের পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কাজও প্রচুর। নানা আত্মীয়-স্বজন আসেন। কেউ সহানুভূতি দেখাতে, কেউ কাজের সূত্রে। অনেকের সঙ্গে অনেক রকম কথা বলতে হয়। শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে হবে খোকাকেই।

আর তো কেউ নেই। মাথার ওপর কাকারাও নেই। কেউ এসে দাঁড়াবে না তাকে সাহায্য করতে। নিমন্ত্রণ থেকে শুরু করে তর্পণ পর্যন্ত তারই করণীয়। নিস্তারিণী সেই যে শুয়েছেন তারপর থেকে আর ওঠেন নি। দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত দেন নি।

খোকা কাছে গিয়ে ডাকে, মা!

নিস্তারিণী মাথাটা তোলেন, চোখ দুটো খোলেন একবার। আবার চোখ বোজেন।

খোকা আবার ডাকে, মা!

নিস্তারিণীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে। খোকাকে দেখলে আর তিনি শান্ত থাকতে পারেন না। কত সাধ ছিল তাঁর। কত বাসনা ছিল। ছেলের বিয়ে দিলেন। ভেবেছিলেন বউ-এর মুখ দেখে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাবেন। কর্তাও হয়তো আবার ভাল হয়ে উঠবেন। আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার বিশ্বাস-বাড়ি নাতি-নাতনীর কলকণ্ঠে ভরে উঠবে।

কর্তা কোনদিন কিছু বলতেন না। চিরদিনই গম্ভীর মানুষ। বিশ্বাস-বাড়ির পুরুষরা সবাই গম্ভীর। শ্বশুরও গম্ভীর মানুষ ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুর মারা যাবার সময় কোনও কথা বলে যেতে পারেন নি। তারপর ক্রমে ক্রমে বাড়ি ফাঁকা হয়ে এল। এক-একদিন বাড়িটা খাঁ-খাঁ করত। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কিছুতেই আর সময় কাটতে চাইত না। কর্তা ঘুম থেকে উঠে খড়ম পায়ে খট্ খট্ শব্দ করে নীচে নামতেন। তারপর আবার সব চুপচাপ। শুধু একপাল পায়রার বক্-বকম্ শব্দে মুখর হয়ে থাকত বাড়িটা। আর কিছু নেই, আর কিছু কাজও নেই, আর কিছু কামাইও নেই। আর খোকা যে সারাদিন কোথায় থাকে, কী করে, সেই-ই জানে। ভেবেছিলেন খোকার বউ এলে আবার সব জোড়াতালি লাগবে, আবার সব ক্ষতি পূর্ণ হয়ে যাবে।

—মা, ও মা!

খোকার অশৌচের চেহারাটা দেখলে সমস্ত বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে যেন। তিনি চোখের জল ঢাকতে আবার বালিশে-কম্বলে মুখ গোঁজেন।

সেদিন কনকের ঘরে যাবার সময় হলো সমরের। নতুন বউ হয়তো ঠিক তখন ভাবতে পারে নি। সমরকে দেখেই ঘোমটা দিয়ে দিয়েছে। ময়লা-চিট্ কাপড় পরা নতুন বউএর শরীরে। শ্বশুরবাড়িতে এসেই অশৌচ পালন করতে

হয়েছে। সমর কী বলবে প্রথমে ভেবে পেলে না। ঘরে ঢুকেই কনকের চেহারা দেখে থমকে দাঁড়াল সমর।

খানিক থেমে বললে, দাদা এসেছিলেন, দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে?

কনক কিছু কথা বললে না।

সমর উত্তরের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে। এমন চেহারা দেখবে কনকের যেন সে আশা করে নি। ঘরের আলমারির আয়নাটায় তার নিজের চেহারাটাও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। কী বিশ্রী চেহারা হয়েছে তার। এতদিন নিজের চেহারার দিকেও তার তাকাবার অবসর ছিল না। আর কনক! ফুলশয্যার রাত্রে সেই এতটুকু সান্নিধ্য! সান্নিধ্য সবেমাত্র ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল। সেই অলঙ্কার, সেই বেনারসী, সেই সোনালী জরির ফিতে জড়ানো খোঁপা—সেই সবই সে আজ আশা করেছিল নাকি? সেদিন কনক ছিল এ বাড়িতে নতুন বউ। আর আজ যেন সে পুরোন হয়ে গেছে। এই এ কদিনেই সে বড় পুরোন হয়ে গেছে। কেন এমন হলো? কার জন্যে? কার দোষে? সমরের কী দোষ? সে তো কোনও অন্যায়, কোনও অবিচার করে নি?

দু'জনে অনেকক্ষণ দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল।

সমর বললে, দাদা বলছিলেন, এখানে তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে?

তারপর আর কী বলবে বুঝতে পারলে না সমর। সব যেন তার গোলমাল হয়ে তাল-গোল পাকিয়ে গেল। সারা শরীরে তার দর দর করে ঘাম ঝরছে।

হঠাৎ সমর আবার বললে, তুমি কি যাবে ওখানে? দাদার কাছে?

কনক এতক্ষণ কোনও কথা বলে নি।

এবার মুখ তুলল।

বললে, হ্যাঁ।

সমর যেন ঠিক শুনতে পায় নি। বললে, সত্যিই তোমার যেতে ইচ্ছে করছে?

কনক কিছু বললে না এ কথার উত্তরে।

সমর বললে, অবশ্য, আমার বাবা মারা গেছেন, তার জন্যে তুমিই বা মিছিমিছি ভুগতে যাবে কেন? তুমিই বা এত কষ্ট করতে যাবে কেন? কিন্তু কনক, একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়?

কনক সোজা করে মুখটা তুলল।

সমর বললে, মা'র অবশ্য মত নেওয়া উচিত, কিন্তু ক'দিন ধরে তিনিও কিছু খাচ্ছেন না দাচ্ছেন না—আর আমার কথা না-হয় ছেড়েই দাও।

সময় ভেবেছিল কনক এবার হয়তো কিছু বলবে এ কথার উত্তরে। কিন্তু কিছুই বললে না কনক।

সমর আবার বললে, আমার সত্যিই খুব কষ্ট হবে কনক। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমার কত কষ্ট হবে—অথচ তোমার সঙ্গে কতটুকুই বা মিশেছি।

তারপর হঠাৎ আরও কাছে সরে গেল সমর। গলাটা নিচু করে বললে, আচ্ছা, সত্যি বল তো, তোমারও কষ্ট হবে, না ?

কনক মাথাটা এবার নিচু করলে আবার।

সমর বললে, জান কনক, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, এই সাত দিন রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নি, দিনের বেলাতেও একটু বিশ্রাম পাই নি। শ্রাদ্ধের ফর্দ করতে হচ্ছে রোজ, কিন্তু যখন শুতে যাই, ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসে—সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখটা মনে পড়ে—আর সারা রাত জেগে কাটিয়ে দিই।

কথাগুলো বলে একটু হাসবার চেষ্টা করলে সমর।

তারপর হেসে বললে, আর তুমি ? তুমি বোধ হয় নাক ডাকিয়ে আরাম করে ঘুমোও. না ?

কনক কিছু বললে না। কিন্তু সমরের মনে হলো কনক যেন মাথাটা তার নাড়ল।

সমর বললে, তুমিও ঘুমোও না, না কনক ? তোমারও ঘুম আসে না, না ?

কনকের কান দু'টো যেন লাল হয়ে উঠল।

সমর বললে. কেন ঘুম আসে না বল তো, শুধু আমার কথা ভেবে ভেবে, না ?

কনক কিছু উত্তর দিলে না।

সমর বললে, বিয়ের আগে সত্যিই বড় ভাবনা হয়েছিল আমার, জান কনক। ভেবেছিলাম কী রকম বউ হবে কে জানে। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় যখন তোমাকে প্রথম দেখলাম, তখন যে কী ভালই লাগল!

তারপর একটু থেমে বললে, আচ্ছা, শুভদৃষ্টির সময়ে তুমিও আমাকে দেখে ছিলে, না ? তা আমাকে দেখে কী মনে হলো তোমার, বল না কনক, বল না!

সমর আরও সরে গেল কাছে।

সমর কাছে যেতেই কনক আরও দূরে সরে গেল।

সমর বললে, বল না, সত্যি আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে—বল না কনক!

এতক্ষণে কনক প্রথম কথা বললে।

বললে, ছুঁয়ো না আমাকে—জান না, ছুঁতে নেই!

সমর এক নিমেষে পিছিয়ে এল। সামলে নিলে নিজেকে।

বললে, জানি ছুঁতে নেই, কিন্তু সত্যি, কবে যে অশৌচ কাটবে, কবে যে তোমাকে ছুঁতে পারব!

তারপর একটু থেমে বললে, কিন্তু সত্যি তুমি যাবে? সত্যিই তুমি যেতে চাও? বুঝি, এখানে তোমার কষ্ট হচ্ছে। মা'র কাছে গেলে তবু তোমার একটু আরাম হবে। দাদাও তাই বলেছিলেন—কিন্তু তাহলে একটা কথা দাও—

কনক সোজা চোখ তুলে চাইলে সমরের দিকে।

সমর বললে, কথা দাও, একটা করে চিঠি আমাকে রোজ দেবে?

একটু থেমে সমর আবার বললে, তোমার চিঠি পেলে তবু হয়তো রাত্তিরে ঘুমটা আসবে, নইলে কোনও কাজেই আমার মন বসবে না কনক। এখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না বটে, কিন্তু তুমি তো বাড়ির মধ্যে ছিলে, এক ছাদের তলায়, এক বাড়ির ভেতরে—কিন্তু তখন! তখন তোমার চিঠি না পেলে আমি হাঁফিয়ে উঠব কনক, আমার বড় কষ্ট হবে—বল, চিঠি দেবে! বল তুমি?

কনক হাসল এবার।

বললে, দেব।

সমর বললে, ঠিক দেবে তো? দেখ, তোমার চিঠি না পেলে আমি তোমাদের বাড়ি দৌড়ে যাব কিন্তু, ঠিক দেখে নিয়ো—তখন কিন্তু তুমিই লজ্জায় পড়বে—আমায় আর দোষ দিতে পারবে না।

খবর দেওয়া হলো সেইদিনই মধুসূদন সেনকে। তিনি গাড়ি নিয়ে এলেন।

কনক নিস্তারিণীর ঘরে গিয়ে শাশুড়ীকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল।

শাশুড়ী পা সরিয়ে নিলেন।

বললেন, থাক বউমা, এখন পেন্নাম করতে নেই।

সমরের সঙ্গেও একবার দেখা করা উচিত। কনক সমরের ঘরে যেতেই সমর দুটো হাত বাড়িয়ে কনককে ধরতে যাচ্ছিল।

কনকের মুখে একটা কটাক্ষ ফুটে উঠল।

বললে, ছিঃ।

সমর যেন হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল। কনকের কাছে হঠাৎ যেন নিজেকে

বড় ছোট মনে হলো। এত ছোট সে! এইটুকু সংযম নেই তার! এইটুকু আত্মসংবরণ করতে পারে না সে!

কনক বললে, আসি—?

এক মুহূর্তে কনকের মুখের হাসিটা দেখেই সমর যেন সব ভুলে গেল।

বললে, তুমি আমায় কথা দিয়েছ, মনে আছে তো কনক?

কনক বললে, এখন ও-সব কথা বলতে নেই, জান না?

সমর বললে, জানি, কিন্তু তোমাকে যে দূরে ছেড়ে দিতে ভয় করে আমার।

কনক ফিরেই যাচ্ছিল দরজার দিকে।

সমর ডাকলে আবার।

বললে, শোন, আর একবারটি শোন কনক।

কনক কাছে এল। বললে, কী?

সমর বললে, তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো?

কনক হাসল। এক অদ্ভুত হাসি। যেন সমরকে পাগলই ভাবলে।

সমর বললে, সত্যিই আমি পাগল কনক—আমি পাগলই হয়ে গেছি—মনে হচ্ছে। তুমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছ।

কনক বললে, আমি তো আবার ফিরে আসব।

সমরের যেন তবু বিশ্বাস হলো না।

বললে, ঠিক ফিরে আসবে তো?

কনক বললে, তুমি অত ভেব না, আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

তারপর চলে যেতে যেতে পেছনে ফিরে বললে, প্রণাম করতে নেই তাই তোমাকে প্রণাম করলাম না—কিছু মনে কোর না।

তারপর আবার ফিরল। দেখলে সমর স্থাণুর মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা তার গম্ভীর। সেই দিকে চেয়ে কনক হাসবার চেষ্টা করলে।

বললে, আসি, কেমন?

বলে আর দাঁড়াল না। নিচে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দাদা। গলা পর্যন্ত ঘোমটাটা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠল কনক। গয়নার বাক্স, শাড়ির বাক্স। একটা সুটকেস আগেই উঠিয়ে দিয়েছিল বিধু। বিধুবদন গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটা স্টার্ট দিলে। তারপর পুকুরটার পাশ দিয়ে খোয়া-বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে গাড়িটা সোঁ সোঁ করে চলে গেল। একটা ধুলোর ঝড় উঠল পেছনে। তারপর কখন শব্দটাও মিলিয়ে গেল।

মিসেস দাশ বললেন, তারপর ?

মিসেস দাশের কাছে গিয়ে যেন বেঁচে গিয়েছিল সমর। অমন করে কে তার দুঃখে সহানুভূতি জানাবে, অমন করে কে তার ব্যথা বুঝবে ? অথচ মিসেস দাশের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক! কিছুই নয়। বরানগরের বিশ্বাস বাড়ির ছেলে বললে কে আর তাকে খাতির করবে আজ ? কে-ই বা জানে বিশ্বাস-বাড়ির নাম! জানে মাত্র কয়েকজন। সেকালের বুড়োমানুষরা। যারা দেখেছে বিশ্বাস-বাড়ির বোল্‌বোলা। শুধু পুরোন আমলের কথাই বা বলি কেন। অধর বিশ্বাস যখন বেঁচে ছিলেন, তখনও খোকাবাবুকে মোটর চালাতে দেখে লোকে বলত, মরা হাতি লাখ টাকা। তারপর সে-বাড়িও নেই। সে বরানগরই আর কখনও মাড়ায় নি সমর। শুনেছিল—সে বাড়ি নাকি ভেঙেচুরে ভাগ ভাগ হয়ে ভাড়াটে বসেছে। বসুক গে। যা হচ্ছে তাই হোক। ভেঙে মাঠ হয়ে যাক, তবু তা নিয়ে আর মাথাব্যথা নেই সমরের। একদিন নামতে নামতে যখন মাধব সিকদার লেন-এর মেসে এসে ঠেকেছিল সেদিনও সে পরিচয় দেয় নি তার বংশের। বলে নি যে সে বরানগরের বিশ্বাস-বাড়ির বংশধর। কলকাতায় যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছে সকলের সঙ্গেই সে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। কারো কাছে গিয়ে দাঁড়ায় নি সে, কারো কাছে হাত পাতে নি। কারো কাছে আশ্রয় ভিক্ষে করে নি।

মার একটা গয়না ছিল। শেষ পর্যন্ত সেইটে বিক্রী করে এক-জামা এক-কাপড়ে এসে উঠেছিল মাধব সিকদার লেন্-এর মেসে।

বনমালীবাবু শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার নাম কী ?

সে বলেছিল, সমরচন্দ্র বিশ্বাস।

বনমালীবাবু পঞ্চাশ বছর ধরে এই মেসে আছেন। মেসের ম্যানেজারী পোস্টটা তাঁর কায়েমী হয়ে উঠেছে এতদিনে।

নিজের মনেই বলেছিলেন, আমরা চেনা-শোনা লোক ছাড়া এ মেসে রাখি না, কারণ দিনকাল যা পড়েছে তাতে সকলকে তো বিশ্বাসও করা যায় না —কিন্তু আপনি বলছেন আপনার আশ্রয় নেই—তা থাকুন দিন-কতক, তারপর একটা আশ্রয় যোগাড় হলেই কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে জায়গা, এই আপনাকে বলে রাখলাম আগে থেকে।

কিন্তু নতুন করে আশ্রয় আর নেওয়া হয়নি, মেসটাও আর বদলানো

হয় নি। পরিচয়টা দিলে হয়তো সুবিধেই হত তার নিজের দিক থেকে। হয়তো সকলে একটু সহানুভূতি দেখাত। একটু 'আহা', 'উহু' করত।

কিন্তু বিশ্বাস-বাড়ির নাম উল্লেখ করে বংশ-পরিচয় দেওয়াটাও যেন হীনতা মনে হত সমরের। অথচ কতই বা দূর, এক দৌড়ে চলে যাওয়া যায় বরানগরে। আবার সেই বাড়িখানা দেখে আসা যায়। নাই বা থাকল সেই বাড়িটা, হলোই বা সেটা বিক্রী, জন্মস্থান তো সমরের! কত দিন, কত মাস, কত বছর যে কেটেছে তার সে বাড়িতে।

তখনও সরকারী চাকরি হয় নি সমরের। তখনও শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সার।

ভূধরবাবুই প্রথম, যিনি ডেকে বসালেন কাছে।

বললেন, বোস, বোস, তুমি বিশ্বাস-বাড়ির ছেলে? কী, হয়েছিল কী?

সমর বললে, বাবার অনেক দেনা ছিল—আমরা কেউই জানতাম না।

ভূধরবাবু বললেন, অধর বিশ্বাস-মশাই-এর ছেলের বিয়ে হলো, এই তো সেদিনের কথা—পাড়াসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হলো—তা ক'ভাই-বোন্ তোমরা?

সমর বললে, আমার ভাই-বোন নেই, আমি একলা।

—ও, তাও তো বটে, তুমিই তো একমাত্র ছেলে বিশ্বাস-মশাই-এর। শেষকালে তোমার কপালে চাকরি করতে হলো?

নাম-ধাম গোপন করবারই ইচ্ছে ছিল সমরের। কিন্তু দরখাস্তখানা দেখে সব চিনে ফেলেছেন ভূধরবাবু। মনে হচ্ছিল যেন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

ভূধরবাবু ছিলেন ক্যাশিয়ার। ভাগ্যও ভাল যে রিটায়ার করতে তখনও তাঁর চার পাঁচ মাস বাকি।

বললেন, আর দু'দিন দেরি করলে আর পেতে না আমাকে, তখন কে-ই বা তোমাকে চিনত, আর কে-ই বা তোমাকে চাকরি দিত—তা ছেলেপিলে নিয়ে তোমার তো খুব কষ্ট হচ্ছে!

সমর বললে, ছেলেমেয়ে কিছুই হয় নি আমার।

—ছেলেমেয়ে হয় নি? ক'বছর হলো বিয়ে হয়েছে তোমার?

ভূধরবাবু ভাল করে চেয়ে দেখছিলেন সমরের দিকে।

বললেন খুব বেঁচে গেছ যে ছেলেমেয়ে হয় নি এখনও—তা না হোক, দু'টো মানুষেরও তো খরচ আছে আজকাল! খেতে পরতেই কি কম খরচ? বাড়ি ভাড়াও তো আছে। বাড়ি ভাড়া করেছ তো?

সমর বললে, আজ্ঞে না, মেসে আছি এখন।

ভূধরবাবু বললেন, আর স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ বুঝি? ভালই করেছ, চাকরি পেলে স্ত্রীকে নিয়ে একেবারে বাসা ভাড়া করাই ভাল। তা বিশ্বাস-মশাই কি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি?

সমর বললে, না, রেখে গিয়েছিলেন।

ভূধরবাবু বললেন, কত টাকা রেখে গিয়েছিলেন?

সমর বললে, তের লাখ টাকা দেনা রেখে গিয়েছিলেন।

ভূধরবাবু চম্‌কে উঠলেন। সর্বনাশ! সেই দেনা সব ছেলেকে শোধ করতে হয়েছে নাকি?

সে-সব কথা বাইরের লোকের কাছে বলতে ইচ্ছে হয় না সমরের। তের লাখ টাকার দেনা? কেন যে তাহলে শেষ পর্যন্ত বাড়িতে অত চাকর-ঝি অত সরকার-গোমস্তা, অত খাওয়া-দাওয়া, আড়ম্বর-অনুষ্ঠান হত কে জানে! অত দেনার ওপর কেন যে আবার অত হাজার টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছিলেন! কেন একবারও জানালেন না কাউকে! কেন বলেন নি তাকে! তাহলে সে তো অমন করে টাকা নষ্ট করত না। ভূষণের দোকান থেকে পানই আসত দু'টাকা করে রোজ। খিলি পান। ভূতো বাজার থেকে আনত বড়-বড় মাছ। অথচ খেতে তো ক'টা লোক। তাহলে সে-ও তো বিয়ের সময় অনেক যৌতুক পেত। কত লোক কত টাকা নিয়ে এসে ঝুলোঝুলি। বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা নগদ যৌতুক দিতে প্রস্তুত ছিল কত লোকই। কিন্তু কেন যে তিনি পণ নেবার বিপক্ষে ছিলেন কে জানে! ছেলে তিনি বেচবেন না। বিশ্বাস-বাড়ি ছেলে-বেচা কারবার করে না বলতেন। মেয়ে সুন্দরী রূপসী—অপূর্ব রূপসী হওয়া চাই। ওই একটা মাত্র শর্ত ছিল তাঁর।

তা কনক সুন্দরীই ছিল বটে। কয়েক ঘণ্টার মাত্র পরিচয় কনকের সঙ্গে। কিন্তু তখন কী পাগলামিই না করেছে সমর।

যাবার সময় কনক বলেছিল, তুমি কিছু ভেব না—ঠিক আসব, দেখো—

সমর বলেছিল, আসবে তো ঠিক?

কনক বলেছিল, তুমি অত ভেব না, আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

তারপর ফিরে যেতে যেতে পেছন ফিরে বলেছিল, প্রণাম করলাম না, কিছু মনে কোর না যেন।

তারপর আবার ফিরে তাকিয়েছিল। সমর তখন ঘরের মধ্যে স্থাণুর মত

একভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখটা তার গম্ভীর-গম্ভীর। সেই দিকে চেয়ে কনক হাসবার চেষ্টা করেছিল।

বলেছিল, আসি, কেমন ?

তা কনক তার কথা রেখেছিল শেষ পর্যন্ত বলতে হবে। আচার্যি-মশাই বলেছিলেন, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে বধূমাতাকেও আসতে হবে। তাই শ্রাদ্ধের দিন দাদাই নিয়ে এসেছিলেন কনককে। তখন সারা-বাড়ি আবার উৎসব-মুখর হয়েছে। আবার ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। আবার ফর্দ মিলিয়ে যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—তাঁরা এসেছেন। বালিগঞ্জ থেকে ভাই, ভাইপো, ছোটকাকা, ছোটকাকীমা, মেজকাকারা সবাই এসেছে। বাড়ি আবার সরগরম। লুচি মিষ্টির গন্ধে আবার বরানগর ভুরভুর করছে।

মধুসূদন সেন, কনকের দাদাও এসেছিলেন। পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসেছিলেন তিনি।

পাশেই নিতাই হালদার।

বললে, চিনতে পারেন ?

—খুব চিনতে পারি। কেমন কুটুম করে দিয়েছিলাম দেখুন, জাঁক দেখছেন ?

কেশব বাঁড়ুজ্জে বললে, বোন আপনার কেমন ঘরে পড়েছে দেখুন—কত রকম আইটেম্ করেছে খাবারের—মিষ্টিটা খান—বরানগরের মিষ্টি খেলে আর ভুলতে পারবেন না মশাই।

খুব হাসি ঠাট্টা করেছিলেন। শেষে যখন সব লোকজন বিদায় হয়েছিল, মধুসূদন সেন তখনও বসে ছিলেন।

সমর একবার কাছে আসতেই দাদা বললেন, তোমাকে খুঁজছিলাম সমর, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কী কথা দাদা, বলুন।

মধুসূদনবাবু দ্বিধা করতে লাগলেন। এক মিনিটের দ্বিধা। তারপর বলেই ফেললেন।

বললেন, তোমার মা কেমন আছেন আজ ?

সমর বললে, সেই রকমই, এখনও ওঠেন নি বিছানা ছেড়ে।

মধুসূদনবাবু বললেন, আমার ওদিকে আবার একটা মুশকিল হয়েছে।

—কীসের মুশকিল ?

সমর ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মধুসূদনবাবু বললেন, মায়ের শরীর তো ভাল নয়, তোমার মা'র মতনই

অবস্থা, কাল একাদশী গেছে, সারাদিন জলগ্রহণ করেন নি। সেই অবস্থাতেই কলতলাতে গিয়ে হঠাৎ একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছেন।

সমর চমকে উঠল

বললে, সর্বনাশ, তাহলে ?

মধুসূদনবাবু বললেন, কপালে যা আছে তা আর কে খণ্ডাবে বল। সেই সকালবেলা তখন আপিস কামাই করে ডাক্তার আনি বদ্যি আনি, ওষুধ খাওয়াই, সেই অবস্থাতেই মা রয়েছেন—কিন্তু তবু কনককে নিয়ে এলাম, এখানেও তো তোমাদের কাজ।

সমর বললে, তা হলে তো আপনাদের খুবই বিপদ গেল।

মধুসূদনবাবু বললেন, বিপদ আর গেল কই, বিপদ তো রয়েছে এখনও, এখনও মা শুয়ে পড়ে আছেন, এখনও তো সেই আমিই মাকে খাওয়ানো শোয়ানো সব করছি নিজের হাতে—আমার আবার আপিসও কামাই হচ্ছে।

সমর বললে, সত্যিই তো খুবই অসুবিধে হচ্ছে আপনার।

—তা সমর, একটা কথা—

বলে মধুসূদনবাবু ঘাড়টা নিচু করে গলাটা নামিয়ে আনলেন।

বললেন, মা তোমাকে একটা কথা বলতে বললেন।

—কী কথা ?

মধুসূদনবাবু বললেন, কয়েক দিনের জন্যে কনককে একটু নিয়ে যেতাম।

সমর চমকে উঠল ভেতরে-ভেতরে। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করলে না।

মধুসূদনবাবু বললেন, তোমাদের বাড়ির এই রকম অবস্থায় বুঝতে পারি ওকে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়, কিন্তু বুড়ো মানুষ তো, কিছুতেই শুনবেন না—বললেন তুই বলে আয় সমরকে, সমর তো আমার অবুঝ জামাই নয়।

সমর কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে। কিন্তু কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। ভাল করে দেখাও হয় নি বিয়ের পর। একটা রাতও কাটে নি এক ঘরে। তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি গেল, এ ক'দিন হাজার কাজের মধ্যেও কনকের কথা ভুলতে পারে নি সমর। শ্রাদ্ধের দিন সকালবেলা এক-একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে আর সমর চমকে উঠেছে। ওই বুঝি চোরবাগান থেকে এল। কিন্তু না, কেউ না। শ্রাদ্ধের দিন নানা লোক আসছেন। নানা সহানুভূতির কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন। অধর বিশ্বাস মশাই কেমন মহানুভব লোক ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মন-রাখা কথা সব। হঠাৎ চোরবাগানের গাড়িটা আসতেই সমর উঠে দাঁড়িয়েছে।

বিধু কোত্থেকে দৌড়ে এল।

বললে, দাদাবাবু চোরবাগান থেকে বউমা এসেছে।

জানলা দিয়েই দেখেছিল সমর। গাড়িটা এসে গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়াল। সমর দেখলে কনক ঘোমটা দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। পেছনে মধুসূদনবাবু।

বিধু কনককে নিয়ে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

মধুসূদনবাবু এসে একেবারে কীর্তনের আসরে হাজির হলেন।

বললেন, কাজ-কর্ম সব সুষ্ঠুভাবে হয়েছে তো? আমি ভাবছিলাম মাঝে একবার আসব—তা আমাদের বাড়িতেও এ ক'দিন নানা ঝঞ্ঝাট আপদ গেল।

এমনি করেই প্রথম আপ্যায়নটা হলো। তারপর সেই দিন রাত্রেই যে কনক চলে যাবে তা তখন ভাবে নি সমর। তখনও জানত, রাত্রে দেখা হবে কনকের সঙ্গে। দেখা হবে অনেক দিন পর। দেখা হলে প্রথম কী কথা হবে তাই-ই সমস্ত দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবছিল। বার কয়েক ভেতরেও গিয়েছিল। কনক বসে ছিল মা'র ঘরে। সেখানে আরও অনেকে ছিল। কাকীমারা ছিল, মামীমারা ছিল। এক ঘর মহিলা। তবু তার মধ্যে কনককে চিনতে কষ্ট হয় নি সমরের।

নিস্তারিণী শুয়ে ছিলেন। খোকার দিকে যেন দেখেও দেখলেন না।

সমর একবার ডাকলে, মা!

নিস্তারিণী চাইলেন ছেলের দিকে।

সমর বললে, মা, চোরবাগান থেকে মধুসূদনবাবু বলছিলেন, আজকে তোমার বউমাকে নিয়ে যাবেন, ওঁর মা কলতলায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছেন।

নিস্তারিণী একবার কনকের দিকে চাইলেন। কনকও মাথা নিচু করলে।

নিস্তারিণী বললেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন বাবা?

—বা রে, তোমাকে জিজ্ঞেস করব না তো কাকে জিজ্ঞেস করব মা? তুমি না বললে কি ও যেতে পারে?

নিস্তারিণী বললেন, তা তোর কী মত খোকা?

সমর বললে, আমার আবার মত কি মা, তোমার বউমা, তুমি যা বলবে তাই হবে—তুমি ছাড়া আর কে আছে মা আমার।

কথাটা শুনেই নিস্তারিণীর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সত্যিই তো আর কে আছে খোকার? কে আর দেখবার আছে

খোকাকে ? খোকার ভালোমন্দ কে আর দেখবে তিনি ছাড়া। এতদিন তিনি ছিলেন, তিনিই সব দেখতেন। তিনি যা ভাল বুঝতেন করতেন। কারো পরামর্শও নিতেন না, কারো কাছে পরামর্শ চাইতেনও না। তিনি স্বর্গে গেছেন, এখন আছেন নিস্তারিণী। খোকাই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। একমাত্র ভরসা। এমন করে শুয়ে পড়ে থাকলে চলবে কেন ?

বললেন, না রে খোকা, আমি এবার উঠব বাবা, ভাল হয়ে উঠব বাবা।

সমর বলল, মা, তুমি একটু শিগগির শিগগির ভাল হয়ে ওঠো না—আমি যে ভরসা পাচ্ছি না—আমি যে একলা, আমার যে কেউ নেই মা।

খোকার কথাগুলো শুনলে নিস্তারিণীর কেমন যেন বুকের কাছে মোচড় দিয়ে উঠত।

বলতেন, খোকা—

সমর কাছে গিয়ে বলত, কী মা ?

নিস্তারিণী বলতেন, তিনি যদ্দিন ছিলেন, কিছু ভাবি নি, কিছু দেখি নি, এখন কোথায় যে কী আছে তোকেই যে সব দেখতে হবে বাবা।

কিন্তু সমরই কি কিছু দেখেছে ! কোথা থেকে আয় হয়, কীসে ব্যয় হয়, কী আদায়, কী খরচ—কিছুই কোনও দিন দেখে নি। এখন হঠাৎ দেখতে পারবেই বা কেন ? কেবল মোটর নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে আর টাকার দরকার হলেই মায়ের কাছে হাত পেতেছে। নিস্তারিণীও কখনও টাকা দিয়েছেন সিন্দুক খুলে, কখনও বা একটা গয়না দিয়েছেন।

সমর এক-একবার অবাক হয়ে যেত। চাইলে টাকা আর মা দিলে গয়না। বলত, কেন মা, গয়না কি হবে !

নিস্তারিণী বলতেন, টাকা এখন হাতে নেই, ওটা বেচে টাকা নিস্।

সমর তবু দ্বিধা করত।

বলত, কিন্তু গয়না বেচার কি দরকার মা—তুমি সিন্দুক থেকে টাকা দাও না।

নিস্তারিণী বলতেন টাকা তো নেই, কর্তার কাছে চেয়ে রাখব'খন এখন তুই ওইটে নিয়ে কাজ চালা।

এমনি করে কতদিন ধরে কত টাকা কত গয়না যে নিয়েছে তার সব ইতিহাস লেখা-জোখা নেই। শ্যামবাজারের মোড়ে একটা স্যাকরার দোকান ছিল। সময় সময় সোজা সেইখানে গিয়ে সোনাটা দিতেই, স্যাকরা সেটা ওজন করে নগদ টাকা দিয়ে দিত। কত গয়নাই যে ছিল মা'র। মা মারা যাওয়ার পর

সিন্দুকটা প্রথম খুলে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সমর। একটা তুটো কানের তুল কিংবা আংটি মাত্র পড়ে রয়েছে—আর দশ-বারোটা টাকা। আর কিছু সেখানে ছিল না।

মার মৃত্যুটাও বড় অস্বাভাবিক ভাবে হলো।

সেদিনও রাত হয়েছে বাড়ি ফিরতে। এমন রাত্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বাড়ি ফিরতে যেন ইচ্ছেই করত না সমরের। বাড়িতে কিসের আকর্ষণ! সোজা গাড়িটা নিয়ে রোজকার মত বেরিয়েছিল। একটা সিনেমা দেখে ভাবলে একবার চোরবাগানে যাবে। কিন্তু চোরবাগানেই বা কেন যাবে সে! তাকে তো কই যেতে লেখে নি কনক! একখানা চিঠি তো দিতে পারত!

সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল সমর।

কতটুকুর জন্যেই বা দেখা!

নিজের ঘরে কনক জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মা'র ঘর থেকে কনক নিজের ঘরে উঠে এসেছিল। ছেলে আর মা'তে কথা হচ্ছিল। আর কথাটা হচ্ছিল তারই প্রসঙ্গ নিয়ে, সুতরাং সেখানে তার থাকা উচিত নয় বলেই উঠে এসেছিল নিজের ঘরে। কনক জানত সমর শেষ পর্যন্ত আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে।

সমর জিজ্ঞেস করলে, তুমি বুঝি ঠিক করেই এসেছিলে আজ চলে যাবে?

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে কনক কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

কনক বললে, মা হঠাৎ কলতলায় পড়ে গেল কিনা।

সমর বললে, সে আমি তোমার দাদার কাছে সব শুনেছি।

কনক বললে, মা বুড়োমানুষ, একটুতেই বেশি কাতর হয়ে পড়েছে, নেহাত কাজের বাড়ি এখানে তাই আসতে হলো।

সমর বললে, কাজের বাড়ি বলেই বুঝি এলে? না হলে আসতে না?

কনক বললে, তুমি রাগ করলে?

সমর বললে, রাগ করব না? কথার খেলাপ করলে রাগের দোষ কী?

কনক বললে, আমি কী কথার খেলাপ করেছি?

সমর বললে, কথা ছিল না যে তুমি রোজ একটা করে চিঠি দেবে?

কনক মাথা নিচু করল। বলল, সত্যি আমার লজ্জা করত খুব—আমি চিঠি লিখব ভেবেছিলাম।

সমর বললে, আমাকে চিঠি লিখবে, তাও তোমার লজ্জা?

কনক বললে, সে তুমি ঠিক বুঝবে না।

সমর বললে, অথচ আমি রোজ সকাল-দুপুরে পিওনের পথের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। পিওনকে জিজ্ঞেস করতাম রোজ।

কনক বললে, তা তুমিও তো একবার গেলে পারতে!

সমর বললে, আমি কেন যাব, তোমরা যেতে বলেছ আমাকে? আর তাছাড়া ··

কনক বললে, তা না বললে কি যেতে নেই—একবার তো কেমন আছি দেখতেও ইচ্ছে হয় মানুষের।

সমর বললে, থাম। তুমি আজ চলে যাচ্ছ তাই, নইলে এর আমি জবাব দিতাম।

কনক বললে, দাদা নিচে দাঁড়িয়ে আছে, যাই আমি।

সমর বললে, আমি জানতাম তুমি চলে যাবে।

কনক বললে, কি করে জানলে?

—দেখলাম গাড়ি থেকে তুমি নামলে, সঙ্গে সুটকেস ট্রাঙ্ক কিছুই নেই—তখনই বুঝলাম তুমি থাকতে আস নি!

কনক বললে, এই তো তুমি আবার রাগ করছ, এখানে থাকব না তো কোথায় যাব? এখানেই তো আমাকে থাকতে হবে—বাপের বাড়িতে মেয়েরা প্রথম-প্রথমই যায়—তারপর তো তোমার কাছেই থাকব চিরকাল।

হঠাৎ যেন সমর একেবারে গলে গিয়েছিল। আরও কাছে গিয়ে সমর হয়তো একটা কাণ্ডই করে বসত সেদিন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে বিধুবদন ডেকে উঠেছে—দাদাবাবু!

—কে রে? বিধু!

সমর এক মুহূর্তে সামলে নিয়েছে।

বললে, কী বলছিস?

বিধু বললে, রাত হয়ে গেল, বউমার দাদা তাগাদা দিচ্ছেন, বলছেন বউমাকে নীচেয় যেতে।

এই শেষ। এই-ই শেষবার। এর পর আর দেখা হয় নি কনকের সঙ্গে। আর কখনও হয়তো দেখা হবে না জীবনে। তারপরেই দুর্যোগ ঘনিয়ে এল জীবনে। মা মারা গেলেন। আর মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়ল চারিদিক থেকে। এত টাকা দেনা নিয়ে যেন দিশেহারা হয়ে গেল সমর। এতদিন জানা ছিল না। এতদিন কোনও ধারণাই ছিল না তার। এক-এক করে চিঠি

আসতে লাগল তার নামে। মামলা হলো, মকর্দমা হলো। একেবারে জেরবার হয়ে গেল জীবন।

ভুবনেশ্বরবাবু পারিবারিক উকিল। তাঁরই শরণাপন্ন হতে হলো।

তাঁকে আগে অনেকবারই দেখেছে বাড়িতে। বাবা বেঁচে থাকতে।

তিনি বললেন, দেখছি, একশো মামলার ধাক্কা।

কাগজপত্র সব তাঁকে দেখানো হলো। তিন দিন তিন রাত ধরে দেখেও কিছু কূল-কিনারা করতে পারলেন না তিনি। বললেন, তাই শেষকালে আমাকে কিছু বলতেন না তিনি!

সমর বললে, আমাকেও কিছু বলতেন না বাবা, মা-ও কিছু জানে না।

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন, চা-বাগানের শেয়ার কিনেছিলেন দু'লাখ টাকার, বাড়ি বাঁধা রেখে, আমায় তো বলেন নি—এ-সব টাকাটাই জলে গেছে। তারপর সুদ নিয়ে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা—এ-সব শোধ হবে কেমন করে?

সমর বললে, থাকবার মধ্যে মা'র কিছু গয়না আছে আর গাড়িটা।

—কত টাকার গয়না হবে? কত ভরি সোনা আছে? সোনার আজকাল দাম চড়েছে।

তখন আবার কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে বসা হলো। দিনরাত উকিল আর কোর্ট-ঘর। গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করে দিলে সমর। আবার সেই হাঁটা আগেকার মত। আবার সেই পায়ে হেঁটে পুকুরটার পাশ দিয়ে, ভূষণের পানের দোকানের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরা।

নিস্তারিণী তখনও বেঁচে। বলতেন, খোকা!

মা'কে কিছু জানাতে যেন কষ্ট হত। মা'কে জানিয়ে লাভ কী! মা তো কোনও সুরাহা করতে পারবেন না। যেন কিছুই ঘটে নি। সব যেন ঠিক আগেকার মতন চলছে।

মা শুয়ে থাকতেন নিজের ঘরে। আর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতেন।

বলতেন, বিধু কোথায় রে খোকা, দেশে গেছে বুঝি?

বিধবা মানুষ। একবেলা খেতেন। তাও না খাওয়ারই সামিল।

নিস্তারিণী আবার বলতেন, বউমা কবে আসবে খোকা?

সমর বলত, আসবে বই কি মা, তুমি বললেই আসবে।

—তোর শাশুড়ী কেমন আছে, খবর পেয়েছিস?

সমর বলত, এখনও পা সারে নি তাঁর।

নিস্তারিণী বলতেন, একবার বউমাকে নিয়ে আয় বাবা—অনেকদিন

বউমাকে দেখি নি, বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়—বিধু কোথায় গেল, বিন্দু ভূতো সব কোথায় গেল।

সত্যিই সব ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল বিশ্বাস-বাড়ি। বরানগরে সবাই জেনে গিয়েছিল। ভূষণের পানের দোকানের আড্ডায় কথাটা উঠত।

নিতাই হালদার আপিস যাবার আগে পান কিনতে আসত। পানটা মুখে পুরে, হাতে চুনের বোঁটাটা নিয়ে বাসে ওঠা অভ্যেস।

এসেই বলত, পান দে ভূষণ।

পান সাজতে সাজতে ভূষণ বলত, শুনেছেন, নিতাইবাবু?

—কী শুনব?

—বিশ্বাস-বাড়ি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, পান কেনা বন্ধ হয়ে গেছে আমার দোকান থেকে।

নিতাই হালদার লাফিয়ে উঠত: বলিস কী রে, ইস্! বিক্রী হয়ে যাচ্ছে? তাহলে?

তাহলে যে কী তা আর কারো মাথায় আসে না। সকলেই মাথা ঘামায়। সব পুরোন কথা মনে পড়ে সকলের। কী বোল্‌বোলা ছিল সেকালে বিশ্বাস-বাড়ির। কী বাহার, কী নাম-ডাক। এ যেন সেদিন! বরানগরের পুরোন লোক যারা তারা জানত। তারা দেখেছে সে-সব দিনের চেহারা। অধর বিশ্বাস-মশাই সামনে পুকুরের পৈঁঠেটার ওপর বসতেন বিকেলবেলা আর সবাই গিয়ে বসত চারপাশে। আজে-বাজে গল্প হত।

তখন এই একখানা বাড়িই ছিল এ-পাড়ার সকলের কেন্দ্র। বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠান লেগেই ছিল বারোমাস। সেই বিশ্বাস-বাড়ি বিক্রী হবে—এ যেন ভাবাই যায় না।

কিন্তু যা হবার তাই-ই হলো।

যেদিন লোকজন এল, চেন-কম্পাস নিয়ে ইঞ্জিনীয়ার কনট্রাক্টার এল—সেদিন সত্যিই লোক জমে গেল বাড়ির সামনে। এবার আর সন্দেহ নেই। এবার সত্যিই বিক্রী হবে। পাড়ার বৃদ্ধ দু'চারজন লোক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। নীরব নির্বাক সাক্ষীর মত তাঁরা এসে দাঁড়ালেন আর উকিল ইঞ্জিনীয়ারের কাজ চলতে লাগল।

ভুবনেশ্বরবাবু দলিলপত্র হাতে নিয়ে কী যেন করছিলেন। সমরও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। খরিদ্দারের লোকও ছিল সঙ্গে। সবাই যেন খুব গম্ভীর গম্ভীর। মাপজোখ হতে লাগল। যেন ভীষণ এক বিপর্যয় হবার উপক্রম। সেদিন

বরানগরের লোকদের মুখে যেন অন্ন রুচল না। সবাই খেতে বসেও বিশ্বাস-বাড়ি নিয়েই আলোচনা করেছে। ভূষণ যে ভূষণ, সেও যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে রইল পান বেচতে বেচতে। পুরোন কোনও খদ্দের এসে দাঁড়ালে ভূষণ বললে, শুনেছেন ?

খদ্দের বলে, শুনেছি—আর, এই-ই তো নিয়ম হে, একজন উঠবে আর একজন পড়বে।

সবাই দার্শনিক হয়ে গেছে যেন। সবাই-ই যেন হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সবাই-ই যেন বড় চিন্তাগ্রস্ত। সবারই যেন পরম ক্ষতি হতে চলেছে।

দুপুর বারোটা পর্যন্ত মাপ-জোখ হলো। তারপর আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কিন্তু তবু যেন কারোর শান্তি নেই। সবাই দেখছে। সবাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বাড়ি মাপা হলো। পুকুর মাপা হলো। বাগান মাপা হলো। মাপের পর দলিল-পত্র দেখা হলো। তারপর কোর্টে গিয়ে রেজিস্ট্রী হবে। তারপর টাকা হাতে এলে দেনা শোধ হবে। বাপের তের লক্ষ টাকা দেনা শোধ হবে। তখন সমর ঋণমুক্ত।

কিন্তু তারপর ?

সমরের মনেও ওই এক প্রশ্ন—তারপর ?

অর্থাৎ নিস্তারিণী কোথায় যাবেন ? অধর বিশ্বাসের বিধবা স্ত্রী, তিনি তো শয্যাশায়ী। বহুদিন থেকেই শয্যাশায়ী, তাঁর কী হবে! এত দুঃখও কপালে থাকে! তাঁকে তো এই সব দুর্যোগ চোখ দিয়ে দেখতে হলো। তিনি তো সবই জানতে পারছেন। তাঁর গতি কী হবে ? তাঁকেও তো শ্বশুরের ভিটে ছাড়তে হবে শেষ পর্যন্ত ?

ভূষণ বললে, তাঁর কপালেই কষ্ট আর কী! তিনি তো সারাজীবন দুঃখের মুখ দেখেন নি!

—কিন্তু বাড়ি বিক্রী হলে ওরা থাকবে কোথায় ?

ছেলেটার না হয় শ্বশুরবাড়ি আছে, কিন্তু মা ? মা বুড়ো বয়সে যাবে কোথায় ? সে তো ছেলের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠতে পারে না ?

সেদিন বোধ হয় শেষদিন। মধুসূদনবাবু এলেন এ বাড়িতে।

বললেন, তুমি নাকি বাড়ি বিক্রী করে দিচ্ছ সমর ?

সমর একটু অন্যমনস্কই ছিল তখন। ক'দিন ধরে এই রকম চলছে। তার যেন কয়েক মাস ধরে কী চলেছে। এই সেদিন বাবা মারা গেলেন। তারপর

নতুন বিয়ে করে পর্যন্ত একদিনের জন্যেও কনককে কাছে পেলে না ভাল করে। তারপর মা'র অসুখ চলছে। তারপর হঠাৎ এত বড় দেনার ভার ঘাড়ে পড়েছে।

সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তার।

মধুসূদনবাবুকে দেখে একটু বিরক্তই হয়েছিল সমর।

মধুসূদনবাবু বললেন, কথাটা তাহলে সত্যি?

সমর বললে, কোন্ কথাটা?

—এই বাড়ি বিক্রীর খবর, এই তের লাখ টাকা দেনার খবর?

সমর বললে, সবই সত্যি, বাড়িটা বেচে সব দেনা শোধ করে দেব ভাবছি। ভুবনেশ্বরবাবু আমাদের উকিল, তিনিও সেই পরামর্শই দিলেন।

মধুসূদনবাবু কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বললেন, গাড়িটাও বেচে দিয়েছ শুনলাম?

সমর বললে, এখন এই অবস্থায় আর গাড়ি রাখা উচিত নয়।

মধুসূদনবাবু বললেন, কত টাকা পাবে বাড়ি বেচে?

সমর বললে, কোনও রকমে যদি দেনাটা শোধ করতে পারি তাহলেই আমার সৌভাগ্য মনে করব।

—তাহলে শেষ পর্যন্ত কী করবে ঠিক করেছ? কোথায় থাকবে? তোমার মা, তিনিই বা কোথায় থাকবেন?

সমর বললে, সেই কথাই ভাবছি এখন।

—ভেবে কিছু ঠিক করতে পেরেছ?

সমর বললে, না।

মধুসূদনবাবু চলে গেলেন। পাটের অপিসের বড়বাবু তিনি। অনেক টাকা রোজগার করেছেন। সৎ অসৎ দু'রকম উপায়েই। জীবনে যারা হেরে যায় তাদের ওপর তাঁর কোনও মায়া নেই। তিনি নিজে জিতে গেছেন, তাই যারা জীবনযুদ্ধে হেরে যায় তাদের ওপর তাঁর অত্যন্ত বিরাগ। মানুষ পুরুষকারের জোরে বড় হবে, দশজনের ওপর কর্তৃত্ব করবে, তবে না মানুষের মত মানুষ। তা না হলে সংসারে তার বেঁচে থাকাই যে অপরাধ। কিন্তু সমরের পরাজয় তিনি যেন নিজেরই পরাজয় মনে করলেন। এত খবরাখবর নিয়ে এত দেখে শুনে বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, শেষে যে এমন হবে তা কে জানত? শেষে গাড়ি তো থাকলই না, এমন কি বাড়িটাও পর্যন্ত চলে যাবে! তাহলে গাছ কি পাথরের সঙ্গে বিয়ে দিলেই হত!

শেষে সেই অনিবার্য দিন এসে হাজির হলো। সেই অবধারিত দিন।

সেদিন সকালেও সমরের কোনও ঠিক-ঠিকানা ঠিক হয় নি। হয়তো বলে-কয়ে আর কিছুদিন এ বাড়িতে থাকবার অনুমতিটা চেয়ে নেবে ভেবেছিল। অন্ততঃ মা যে-কটা দিন বাঁচেন।

ভদ্রলোক নতুন বড়লোক। বাড়িটা কিনে নিয়ে অদল-বদল করে ফ্ল্যাট্ বাড়ি করবার মতলব ছিল তাঁর।

সমর বললে, আমার মা বেশিদিন বাঁচবেন না অবশ্য, একমাস কি দুমাস যদি থাকতে দেন।

ভদ্রলোকের সত্যিই দয়া-মায়ার শরীর। রাজী হলেন এক কথায়।

তিনি বললেন, আমি তো এখনই হাত দিচ্ছি না বাড়িতে, পূজোর আগে পর্যন্ত আপনারা থাকুন, তারপরে কিন্তু আমায় ছেড়ে দিতে হবে।

সমর বলেছিল, নিশ্চয়ই, ততদিন যদি মা বেঁচে থাকেন তো আমি তার আগে একটা ব্যবস্থা করে নেবই, আর তা ছাড়া আমার স্ত্রীকেও তো এখানে নিয়ে আসতে হবে। বাড়ি আমাকে একটা যোগাড় করতেই হবে।

কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না শেষ পর্যন্ত।

সেই দিনই শেষ রাত্রের দিকে নিস্তারিণী চলে গেলেন।

খবর একটা পাঠিয়েছিল কনকের কাছে। কিন্তু শ্মশানে যাবার আগে পর্যন্ত কোনও খবর আসে নি সেখান থেকে।

যখন সবাই তৈরী, শ্মশানে যাবার খাটিয়া এসে গেছে, নতুন থানধুতি, কোনও জিনিসের কোথাও ত্রুটি নেই, বরানগরের দু'পাঁচজন ভদ্রলোকও শেষবারের মত দাঁড়িয়েছেন এসে, তখনও সমর বিধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁরে তোর বউদি এসেছে ?

বিধুবদন বলেছিল, না দাদাবাবু।

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল।

এসেই সমর প্রথম কথা জিজ্ঞেস করেছিল বিধুকে, হ্যাঁরে তোর বউদি এসেছে নাকি ?

বিধু তখনও বলেছিল, না তো দাদাবাবু।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। পরের দিন সকালে উঠেও সমর ভেবেছিল হয়তো কনক এসে গেছে। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও একবার এল না কনক। এ কেমন করে হলো ? কেমন করে এ হতে পারে ?

মিসেস দাশ বললেন, তারপর ?

বলতে বলতে সমরের চোখ দিয়ে জল পড়ত।

মিসেস দাশ নিজের জর্জেট শাড়িটা দিয়ে সমরের চোখ দু'টো মুছিয়ে দিতেন।

বলতেন, আর এক কাপ কফি দিতে বলি তোমায় সমর ?

সমর বলত, না।

মিসেস দাশ বলতেন, তা হলে অন্ততঃ চা এক কাপ ?

সমর বলত, না মিসেস দাশ, আপনি যে আমার দুঃখ এত মন দিয়ে শোনেন তাতেই আমি ধন্য, অথচ আপনার তুলনায় আমি কী ? আমি তো নগণ্য একটা মানুষ বই তো নয়।

সত্যিই মিসেস দাশের তুলনায় সমর কী ? সমর কতটুকু, কত সামান্য, কত নগণ্য ! ভূধরবাবু অধর বিশ্বাসকে চিনতেন, তাই একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন তাঁর আপিসে। সরকারী আপিস। ভূধরবাবু ছিলেন হেড-ক্যাশিয়ার। বন্ধুর ছেলে সমরকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই দয়া করে। তারপর বরানগরের ভৈরব মল্লিক লেনের কত পুরুষের বাস ছেড়ে এসে উঠেছিল মেসে। মাধব সিকদার লেনের মেসে। আস্তে আস্তে সব ভুলতেই চেষ্টা করেছিল সমর। সেই সব ঐশ্বর্যময় দিনগুলোর কথা মনে রাখবার চেষ্টাও করে নি সে, মনে ছিলও না। সকাল ন'টার সময় খেয়ে-দেয়ে আপিস চলে যেত, আর আপিস থেকে বেরোত বিকেল সাড়ে চারটের সময়। তখন একমাত্র বিলাস রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। কখনও ময়দানে, কখনও কার্জন পার্কে, কখনও আউটরাম ঘাটের গঙ্গার ধারে ধারে।

মিসেস দাশ জিজ্ঞেস করলেন, আর কনক ?

সমর বললে, সে আর আমার কাছে আসে নি মিসেস দাশ। আমি গরীব, আমার বাড়ি নেই, আমার গাড়ি নেই, কেন সে আর আসতে যাবে আমার কাছে ? আমি তার কে ?

সমর বার বার সেই কথাই ভাবত, কনক তার কে ? কেউ-ই না।

শেষবারের কথা তখনও মনে ছিল সমরের।

চোরবাগানের বাড়িতে একবার গিয়েছিল সমর।

বাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এসেছিলেন মধুসূদনবাবু।

বলেছিলেন, কে ?

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে তখন বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে। পাড়ার রাস্তায় লোকজন বেড়েছে। গ্যাসের ক্ষীণ আলোয় মধুসূদনবাবুর মুখখানা কেমন যেন

কঠোর মনে হলো সমরের। নাকি ভুল দেখছে সমর? এ মধুসূদনবাবু নয়। কিম্বা কোনও বিপদ আপদ হয়েছে নাকি?

সমর বললে, আমি।

আমি কে?

মুখ নিচু করে ভাল করে চেয়ে দেখলেন মধুসূদনবাবু।

সমর বললে, আমি সমর।

মধুসূদনবাবু বললেন, ও, তা কী মনে করে হঠাৎ?

এ বাড়ির জামাই সে, সে আবার কী মনে করে আসতে যাবে? অন্য কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার?

তবু সমর বললে, অনেকদিন দেখা হয় নি তাই···

মধুসূদনবাবু কথাটা সম্পূর্ণ করে দিলেন।

বললেন, তাই দেখা করতে এলে? তা আছ এখন কোথায়?

সমর বললে, আপাততঃ মাধব সিকদার লেনের একটা মেসে উঠেছি।

—তারপরে কী করবে ভেবেছ?

মধুসূদনবাবুর গলাটা যেন এবার তীক্ষ্ণ শোনাল।

সমর বললে, তারপরে একটা চাকরির চেষ্টা করছি, তখন একটা বাড়ি ভাড়া করব।

—তারপরে?

সমর বললে, তারপর—কনককে তো আর চিরকাল এখানে রাখা চলবে না, বাড়ি ভাড়া করেই ওকে নিয়ে যাব ভাবছি।

মধুসূদনবাবু যেন হঠাৎ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

বললেন, তোমার ভাবনা তুমিই ভাব, কনককে আর ওর মধ্যে জড়িয়ো না।

সমর বললে, না তা জড়াব না অবশ্য, তবু ওর কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে, আমি ছাড়া আর···

মধুসূদনবাবু বললেন, না, তোমাকে আর ভাবতে হবে না, ওর ভাবনা ভাববার লোক আছে।

—তার মানে?

সমরের মুখ দিয়ে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেল। সমরের স্ত্রী কনক, সমর ছাড়া কনকের কথা কে ভাববে আবার! বিয়ে হবার পর স্বামী ছাড়া স্ত্রীর কথা আর কে ভাববে? কনক তার স্ত্রী, কনকের কথা সমর ছাড়া আর কে ভাববে?

মধুসূদনবাবু বললেন, আমি আপিস থেকে এখুনি এলাম, এখন তোমার

সঙ্গে কথা বলবার সময় হচ্ছে না, মানে তোমাকে বুঝিয়ে দেব পরে। পরে একদিন এস।

—কিন্তু।

বোধ হয় দরজাটা বন্ধই করতে যাচ্ছিলেন মধুসূদনবাবু।

সমর সামনে সিঁড়ির আর এক ধাপ উঠে বললে, কিন্তু আমি একবার দেখা করতে চাই কনকের সঙ্গে।

—দেখা তো এখন হবে না।

সমর অবাক হয়ে গেছে। বললে, কেন?

মধুসূদনবাবু কথাটার উত্তর হঠাৎ দিতে পারলেন না।

বললেন, কনকের সঙ্গে একদিন তোমার বিয়ে হয়েছিল একথা তুমি ভুলে যাও, কনককেও ভুলে যেতে বলেছি। কনকও সে-বিয়ের কথা ভুলে গেছে।

—সে কি? আপনি বলছেন কী?

—আমি ঠিকই বলছি, আমার বোনের আমি আবার বিয়ে দেব, তোমার মতন অপদার্থের সঙ্গে জীবন কাটাতে সে পারবে না।

সমর একটু ভেবে নিয়ে বললে, আমি একবার তার সঙ্গে শুধু দেখা করতে চাই, তার মুখ থেকে আমি কথাটা শুনে যেতে চাই শুধু।

মধুসূদনবাবু হঠাৎ দরজাটা বন্ধ করে দিলেন সমরের মুখের ওপর।

বন্ধ করবার আগে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা বলাও পাপ মনে করে সে।

সেই অন্ধকার গলির ভেতর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সমর কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। তারপর আবার সোজা চলে এসেছিল নিজের মেসে।

তারপর কতদিন কী ভাবে দিন কেটেছে, কতদিন ভেবেছে আবার যাবে। কিন্তু যেতে আর ভরসা হয় নি। শেষ পর্যন্ত চোরবাগানের ঠিকানায় চিঠিও দিয়েছে অনেকগুলো।

লিখেছে :

কনক,

তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকে জড়াবার জন্যে নয়, তোমাকে কাছে নিয়ে এসে সব দুর্ভাগ্যই ভুলতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হয় নি। আমি নিরুপায়। তুমি না এলে আমি কী করে জীবন কাটাব তা তুমি আমাকে নিজে জানিয়ে দিয়ো।

ইতি তোমার

সমর

এমনি অনেক চিঠি লিখেছে সমর। একটার পর একটা। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেছে কত দিন, কত মাস। সে উত্তর আসে নি কখনও। শেষে একটা চিঠি এসেছিল মধুসূদনবাবুর।

তিনি লিখেছিলেন:

কনককে বার বার চিঠি লিখে বিরক্ত কোর না তুমি। তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি কনক তোমার কেউ নয়। কনক মনে করে যে কারোর সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি। সে নিজেকে কুমারী বলে মনে করে। তুমি চিঠি না দিলে সে খুশী হবে।

ইতি

মধুসূদন সেন

এর পর চিঠি দেওয়া বা দেখা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এর পর থেকে সমর চিঠি দেওয়া ছেড়েই দিয়েছে। শুধু চিঠি দেওয়া নয়, যাওয়ার কথাও ভুলে গিয়েছে। কনকের সঙ্গে দেখা করার কথাও আর ওঠে নি। আপিসের কাজের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দিয়েছে সমর। আপিসকেই নিজের অবলম্বন বলে ধরে নিয়েছে। ভূধরবাবু সমরের কাঁধে ভার তুলে দিয়ে একদিন রিটায়ার করেছেন। সমর আপিসের কর্তা হয়েছে। দায়িত্ব যেমন পেয়েছে, দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে ভোলাবার তেমনি অবকাশও পেয়েছে। কাজের মধ্যে দিয়ে নিজের সব অতীতকে নিঃশেষে হজম করে নিয়েছে। কোথা দিয়ে দিন আসে, কোথা দিয়ে দিন যায়, কোথা দিয়ে বর্ষচক্রের আবর্তনে স্বাস্থ্য-আয়ু ক্ষয় হয়ে যায় তিলে তিলে, তারও হিসেব রাখবার প্রয়োজন হয় নি।

এমনি করেই দিন কাটছিল। এমনি করেই মাধব সিকদার লেনের মেসের ভেতর হয়তো সমস্ত জীবনটাই কেটে যেত। এমনি করে হয়তো ভুলে যেত কনকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, একদিন বরানগরের ভৈরব মল্লিক লেনের বিরাট পৈতৃক বাড়িটার মধ্যে তার জন্ম হয়েছিল। এমনি করেই সব অপমান গলাধঃকরণ করে হয়তো আর একজন নীলকণ্ঠ হয়ে উঠত, কিন্তু তা হলো না।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিচয় হয়ে গেল মিসেস দাশের সঙ্গে।

মিসেস দাশের বাড়িতে আসবার পর আবার সব মনে পড়ল। আবার মনে পড়ল তারও ভাল করে বাঁচবার অধিকার আছে। আবার মনে পড়ল ঠিক এমন জীবনটি তারও হতে পারত।

কী একটা চ্যারিটি শো হবে। কোথায় কোন্ দুঃস্থদের সাহায্যের জন্যে।

এই সূত্রেই এখানে ওখানে অনেকগুলো টিকিটের বই বিক্রীর জন্যে দেওয়া হয়েছিল।

একদিন একটি ছেলে এসে বললে, আপনার কাছে মিসেস দাশ আমাকে পাঠিয়েছেন।

—কে মিসেস দাশ?

সমর তখন আপিসের ঘরে কাজে ব্যতিব্যস্ত। কাজের গোলকধাঁধায় চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

ভাল করে ছেলেটির চেহারার দিকে একবার চেয়ে দেখলে সমর। বেশ চোস্ত, স্মার্ট চেহারা। অবস্থাপন্ন লোক।

ছেলেটি বললে, মিসেস দাশ হলেন আমাদের সেক্রেটারী, তিনিই অর্গ্যানাইজ করছেন চ্যারিটিটা।

মিসেস দাশ। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলে না, কে এই মিসেস দাশ। মিসেস দাশ বলে কোনও মহিলাকেই চেনে না সমর। একমাত্র কনককেই একটু চিনেছিল। তাও সামান্য কয়েক দিন। তা ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের দিকে ভাল করে চেয়েও দেখে নি সমর।

ছেলেটি বললে, মিসেস দাশ বলেছেন আপনাকে এই হাজার টাকার টিকিট বিক্রী করে দিতে হবে।

—হাজার টাকার টিকিট?

আশ্চর্য হয়ে গেল সমর। হাজার টাকার টিকিট কেমন করে সে বেচবে? কাকে সে চেনে? কে তার কথা শুনবে? কারো সঙ্গে যে তার পরিচয় নেই।

ছেলেটি বললে, মিসেস দাশ বার বার আপনাকে বলতে বলেছেন।

—আমাকে? আমাকে তিনি চিনলেন কী করে?

—তিনি সকলকেই চেনেন। সবাই-ই তাঁকে চেনে। তিনি নিজের বলতে কিছুই চান না। তিনি নিজে বিক্রী করেছেন দশ হাজার টাকার টিকিট, আর আপনারা যদি সামান্য ক'টা টাকার টিকিট বিক্রি করে না দেন তো কেমন করে চলবে। উদ্বাস্তুরা খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না···

ছেলেটি অনেক কথা বলে গেল। মিসেস দাশের অনেক গুণপনা শুনিয়ে গেল গড় গড় করে। তিনি নিজের স্বাস্থ্য, সময় আর অর্থ অপব্যয় করে দেশের জন্যে যা করেছেন, সে আর কতটুকু। সবাই মিলে চেষ্টা করলে তবেই তো কিছু করা হবে। নইলে দেশের এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঘরছাড়া লক্ষ্মী-ছাড়াদের কে দেখবে? মিসেস দাশের একলার চেষ্টায় কত হবে?

ছেলেটি টিকিট বইটা দিয়ে সেদিন চলে গিয়েছিল।

তারপর কী করে যে হাজার টাকার টিকিট-বইটা পাঁচদিনের মধ্যে বিক্রী করে ফেললে সমর তা সে নিজেও বুঝতে পারে নি। অদ্ভুত তখন অবস্থা দেশের। আর বিশেষ করে সমরের অনুরোধ। সমর কারো সঙ্গেই মেশে না, কোনও কথাতেই থাকে না। তার বেশি কথা বলতেই হলো না। সামনে টিকিট বইটা ধরতেই কিনে নিলে সবাই এক-একটা করে।

ছেলেটি আবার একদিন এল।

সমর তার সামনে টিকিট-বইটা আর টাকাগুলো দিয়ে বললে, এই নিন, মিসেস দাশকে বলবেন আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব করলাম।

পরের দিন টেলিফোন এল। ছেলেটির গলা।

বললে, মিসেস দাশ আপনার সঙ্গে একবার কথা বলবেন।

সমর টেলিফোনে কান পেতে রইল।

ওপাশ থেকে মেয়েলি গলার শব্দ এল।

মিসেস দাশ বললেন, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ সমর।

সমর বললে, না না, ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, আমাকে বিশেষ কষ্ট করতে হয় নি।

মিসেস দাশ এবার একটু থেমে বললেন, তা হোক, তবু তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমার হয়ে তুমি যারা টিকিট কেটেছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ দিও।

সমর হাসল। বললে, তা দিতে পারি।

মিসেস দাশ বললেন, শো'র দিন তুমি আসছ তো ?

সমর বললে, আমার তো ক্যাশের কাজ, আমি আসতে চেষ্টা করব।

—না শুধু চেষ্টা করলে চলবে না, আসতেই হবে তোমাকে।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল সমরকে। বিরাট প্যাণ্ডেলের মধ্যে সমর গিয়ে সব দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। এতদিন সমস্ত উৎসব আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমর নিজের অস্তিত্বটাই যেন ভুলে গিয়েছিল।

গান হলো, নাচ হলো, ম্যাজিক হলো, অভিনয় হলো। প্যাণ্ডেল ভর্তি লোক। আলোয় আলোময় কলকাতা শহরের একটি অঞ্চল। কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে মিসেস দাশই যেন সব কিছুর শীর্ষ-মণি। যেন তাঁকে ঘিরেই সব। তাঁকে কেন্দ্র করেই যেন সব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কী চমৎকার চেহারা। কোথাও যেন মিসেস দাশের বাহুল্য নেই। না আচরণে, না নিষ্ঠায়। সব সময় কত লোক তাঁকে ঘিরে রয়েছে। পুলিস কমিশনার থেকে শুরু করে মেয়র।

মেয়র থেকে শুরু করে মিনিস্টার ডেপুটি মিনিস্টার। কত শ্রদ্ধা, কত ত্যাগ, কত নিষ্ঠা। সেই নিষ্ঠা, সেই ত্যাগ, সেই শ্রদ্ধার কাছাকাছি আসতে পেরে সমরের যেন নিজেকে ধন্য মনে হলো।

সেই ছেলেটি হঠাৎ কাছে এসেছে।

বললে, সে কি, আপনি এখানে এক-কোণে চুপ করে লুকিয়ে বসে আছেন! চলুন, ভেতরে চলুন।

সমর বললে, না আমি এখানে বেশ আছি।

ছেলেটি বললে, না না, মিসেস দাশ যে আপনাকে খুঁজছেন।

শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো।

কত বড় বড় লোক, কত বিখ্যাত-বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভিড় সরিয়ে দিয়ে সমরকে মিসেস দাশের সামনে হাজির করা হলো।

মিসেস দাশ চমকে উঠলেন যেন।

—ও তুমিই সমর; ছি ছি এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলে, তোমাকেই তো খুঁজছিলাম আমি।

তারপর পাশের একটা মারোয়াড়ীকে দেখে বললেন, এই যে মিস্টার আগারওয়ালা, কেমন লাগছে আপনার আমাদের ফাংশান বলুন?

মিস্টার আগারওয়ালা মিসেস দাশের সামনে দাঁড়িয়ে যেন বিগলিত হয়ে গেল।

তারপর সমরের দিকে ফিরে আবার মিসেস দাশ বললেন, তা তুমি কবে আমার বাড়িতে আসছ বল, মিস্টার দাশের সঙ্গে তোমার তো আলাপ হলো না।

সমর বললে, যাব'খন একদিন সময় করে।

মিসেস দাশ বললেন, না বুধবার এস, বুধবারে তোমাকে আমি আশা করব, আমার ওখানে খাবে তুমি।

মিসেস দাশের অনেক কাজ। হাজার জন হাজার রকম অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে আসছে। কে খায় নি, কার কাছে গাড়ি পাঠাতে হবে, কাকে বাড়ি পাঠাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে; সব কাজে মিসেস দাশের পরামর্শ দরকার। হাজারটা কাজের মধ্যেও কিন্তু মিসেস দাশ সমরকে আটকে রাখলেন কাছে।

বললেন, তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা হলো না তো সমর, তুমি তাহলে বুধবার আসছ, আসছ তো ঠিক? আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব কিন্তু।

তারপর একদিন সমর সত্যি-সত্যিই হাজির হয়েছিল মিসেস দাশের বাড়িতে।

কিন্তু বাড়িতে হাজির হয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত ভাল, এত ভদ্র, এত অমায়িক! মিসেস দাশের তুলনায় সমর কী? সমর কতটুকু? তখন পাঁচশো টাকা মাত্র মাইনে। সেই মাইনের ওপর ভরসা করে মেসের খরচ নিজের খরচ বাবার দেনা সব চালাতে হচ্ছে। কষ্টেসৃষ্টে দিন চলছে তখন সমরের। অথচ মিসেস দাশ তাকেই যেন আপন করে নিলেন।

মিসেস দাশ তখন বাথরুমে। খানসামা একটা ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল। ঘরখানার চেহারা দেখে সমর আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন না হলে ঘর! কত সহজ, কত সরল। ছোট একটা টিপয়ের ওপর একটা মোরাদাবাদী ভাসের ভেতর একটা ক্যাক্‌টাস্। দেওয়ালে একটা জাপানী ছবি—একটা বাঁশের পাতা। পাতাটা ঝরে পড়ছে। আর নীল একটা আলো সিলিংএর আড়ালে। সাদা পপলিন দিয়ে ঢাকা কৌচ তিনটে। মেঝেতে সাদা কার্পেট ভেলভেটের মতন বিছানো।

মিসেস দাশ ঝল্‌মল্ করতে করতে এলেন।

বললেন, সমর, তুমি এসেছ তাহলে শেষ পর্যন্ত!

সমর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আপনার হয়তো কাজের ক্ষতি হল।

মিসেস দাশ বললেন, কাজ আর আমার কী। এই তো এতক্ষণ মিস্টার সোনপারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেই নিয়ে, মিস্টার সোনপারকে চেন নিশ্চয়ই?

সমর চিনতে পারলে না। বললে, না তো?

মিসেস দাশ বললেন, সে কি, অ্যাল্‌বিয়ন্ জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার, কাল অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, তাই যাবার আগে দেখা করতে এসেছিল, ভারি ভদ্রলোক, ফিরে এলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

তারপর হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে গেছে এই ভাবে বলে উঠলেন, ওই দেখ, ভুলে গিয়েছিলাম, কী খাবে তুমি বল তো?

সমর বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু ব্যস্ত হলেন মিসেস দাশ। ডাকলেন, আবদুল!

মিসেস দাশ বললেন, কফি খাবে না চা, না কোল্ড ড্রিঙ্ক, কোন্‌টা খাবে বল?

সমর সবিনয়ে বললে, আমি কিছু খাব না মিসেস দাশ, আপনি সত্যিই ব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু সেদিন খেতে হয়েছিল সমরকে। কোল্ড ড্রিঙ্ক একটা। মিসেস দাশ সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিলেন। গল্প করতে করতে হঠাৎ পাশেই টেলিফোন বেজে উঠল।

মিসেস দাশ উঠলেন। বললেন, এক্সকিউজ মি সমর, হ্যালো, হ্যাঁ, মিসেস দাশ কথা বলছি।

তারপর সমর শুনতে লাগল মিসেস দাশের টেলিফোনের কথাগুলো। কত লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে মিসেস দাশের, কত জাতের লোক। কত বিরাট বিরাট লোক। যাদের ছবি ছাপা হয় খবরের কাগজে। এমনি সব লোক টেলিফোনে কথা বলে মিসেস দাশের সঙ্গে। সকলের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সকলে মিলে মিসেস দাশকে কত খাতির করে। কেমন যেন নিজেকে ধন্য মনে হলো সমরের। সে-ও যেন তাদের সঙ্গে এক সারিতে উঠে গেছে। তারা সবাই এক।

মিসেস দাশ তখন কথা বলছেন, না না, এখন তো যেতে পারব না, আমার বাড়িতে গেস্ট রয়েছে, আমি বড় ব্যস্ত মিস্টার ব্যানার্জি, কাল বরং দেখা করতে পারি, কাল বিকেল তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত ফ্রি আছি।

বলে খানিকক্ষণ পরেই টেলিফোন রেখে আবার কাছে এসে বসলেন।

বললেন, কী ঝঞ্ঝাট, একটু যে নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কথা বলব তার উপায় নেই।

সমর জিজ্ঞেস করলে, আমি এসে হয়তো আপনার অসুবিধে করে দিলাম মিসেস দাশ।

মিসেস দাশ বললেন, অসুবিধে? অসুবিধে আবার কী! আমার তো সুবিধেই হলো, নইলে এখন মিস্টার ব্যানার্জির পাল্লায় পড়ে অস্থির হয়ে যেতাম।

সমর জিজ্ঞেস করলে, মিস্টার ব্যানার্জি কে?

মিসেস দাশ তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, ও হলো বীরেন ব্যানার্জি, আমাদের মেয়র।

হঠাৎ মিস্টার দাশ ঘরে ঢুকলেন।

বললেন, খুকু, মিস্টার মেটা এসেছেন, টাকাটা দাও।

মিসেস দাশ বললেন, কত দিতে হবে জিজ্ঞেস করেছ?

—হ্যাঁ, সাত হাজার টাকা চাই বলছেন।

মিসেস দাশ বললেন, তা দিয়ে দাও, চেক-বই তো তোমার কাছেই আছে,

বল এখন আমি দেখা করতে পারব না, একটু ব্যস্ত আছি। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এ হচ্ছে সমর, সমর বিশ্বাস।

মিস্টার দাশ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, খুব খুশী হলাম।

সমরও হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটু হাসল।

মিস্টার দাশ বললেন, পরে একদিন ভাল করে আলাপ করব আপনার সঙ্গে, কী বলেন?

মিস্টার দাশ চলে গেলেন।

অদ্ভুত লাগল মিসেস দাশকে, অদ্ভুত লাগল মিস্টার দাশকে। সেদিন সেই প্রথম দিন সেই নীল আলোর তলায় মিসেস দাশের পাশে বসে সমরের মনে হয়েছিল পৃথিবীতে যদি কোথাও কোনওখানে শান্তি বলে কিছু থাকে তো সে একমাত্র ওই সংসারটির মধ্যেই। ওখানে কোনও অভাব নেই, যেন তাই কোনও অভিযোগও নেই। কথায় কথায় ওখানে টেলিফোন আসে বড়-বড় লোকদের কাছ থেকে। যাদের নাম হামেশা খবরের কাগজে ছাপা হয় তাঁরা ওখানকার নিত্যসঙ্গী। সারা পৃথিবীতে যখন তার জন্যে অবহেলা আর অবজ্ঞা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তখন ওখানে তার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ। কত ভাল লেগেছিল সেদিন সমরের। মনে হয়েছিল সামান্য হাজার টাকার টিকিট বিক্রী করার বিনিময়ে এ যেন তার ভাগ্যে রাজসুখ জুটে গিয়েছে একেবারে।

আসবার সময় মিসেস দাশ বললেন, আবার কবে আসছ তাহলে সমর?

সমর বললে, আসব আর একদিন আপনাকে বিরক্ত করতে।

মিস্টার দাশও এসেছিলেন ঘরে। বলেছিলেন, শিগগিরই একদিন আসতে চেষ্টা করবেন।

কিন্তু মিসেস দাশ কথা না নিয়ে ছাড়লেন না।

বললেন, কবে আসছ বলে যাও।

কথা দিতে হল শেষ পর্যন্ত।

সমর বললে, আসব শনিবার দিন।

তা তাই-ই হলো। পরের শনিবার দিনই গিয়ে হাজির হলো সমর।

সেদিন কিন্তু নিরিবিলি নয়। ড্রয়িং-রুমে আরও অনেক লোক ছিল। চেহারাতেই তাদের গণ্যমান্যতার পরিচয় সুস্পষ্ট। ঢুকবে কি ঢুকবে না করছে, এমন সময় নজরে পড়ল মিসেস দাশের। সোজা বাইরের পোর্টিকোতে বেরিয়ে এলেন। এসেই হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

বললেন, কী লাজুক রে বাবা তুমি, পালিয়ে যাচ্ছিলে নাকি ?

সমর বললে, ভাবছিলাম আপনি খুব ব্যস্ত আছেন।

মিসেস দাশ বললেন, ব্যস্ত থাকলেই চলে যেতে হবে নাকি ? এস, বোস, পরিচয় করিয়ে দিই।

সকলের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস দাশ। সে এক আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকার ব্যাপার। কিন্তু মিসেস দাশ বোধ হয় যাদু জানেন। এমন করে অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে জানেন তিনি যে সমরের মনে হলো সে যেন আর পর নয় ওখানে। সে-ও যেন ওঁদেরই একজন।

সমরের জন্যেও চা এল। সমরের দিকেও মিসেস দাশের সমান নজর।

মিসেস দাশ বললেন, এত লজ্জা কেন তোমার সমর, আমার বাড়িটা নিজের বাড়িই মনে করবে তুমি এবার থেকে।

মিস্টার আগারওয়ালা বললেন, আমরা তো এখানে সবাই আপনাকে আপনজন বলে মনে করি মিসেস দাশ।

মিস্টার মেটা, মিস্টার রতনলাল, মিস্টার ব্যানার্জি সবাই-ই সেই একই কথা বললেন।

সিগারেট চলতে লাগল। পান চলতে লাগল। কোকো, কফি, কোল্ড ড্রিঙ্ক চলতে লাগল। যার যা অভিরুচি। মিসেস দাশের ড্রয়িং-রুমে সব আয়োজন নিখুঁত। আবদুল এসে সকলের তদ্বির-তদারক করে গেল। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, রাত দশটা বেজে গেল, টের পেলে না সমর। অথচ অন্যদিন সন্ধ্যেটা যেন আর কাটতেই চাইত না সমরের।

সমর বললে, আজ উঠি মিসেস দাশ, রাত অনেক হয়ে গেল।

মিসেস দাশ কিন্তু ছাড়লেন না। হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন।

বললেন, তোমার এত তাড়াতাড়ি কি শুনি, একটু না হয় দেরিই হলো।

সমর বললে, আমি আপনার কথা ভেবেই বলছিলাম।

মিসেস দাশ বললেন, আমার এখানে এ-রকম রাত রোজই হয়, দু' চারদিন এলেই বুঝতে পারবে তুমি সমর।

তারপর একে একে সবাই উঠে গেলেন। সমর যতবারই ওঠবার চেষ্টা করেছে ততবারই মিসেস দাশ বাধা দিয়েছেন। ততবারই মিসেস দাশ বলেছেন, তুমি অত যাই-যাই করছ কেন বল তো ?

সমর বলেছে, আপনারও তো রাত হয়ে যাচ্ছে মিসেস দাশ।

মিসেস দাশ বলেছেন, আমার কথা অত নাই-বা ভাবলে।

সমর বলেছে, আপনার চাকর-বাকরদেরও তো রাত হচ্ছে ?

মিসেস দাশ বলেছেন, তা হোক, তোমার অত ভাবতে হবে না, বাড়িতে তোমার কে আছে শুনি ? কার জন্যে এত তাড়া ?

সমর বললে, তাড়া আমার কারোর জন্যেই নেই মিসেস দাশ, আমার জন্যে কেউ-ই ভাববার নেই।

তখন সবাই চলে গেছেন।

সেই স্বল্পালোকিত ঘরে মিসেস দাশ আর সমর শুধু। বাইরের বাগানটা পেরিয়ে রাস্তায়ও বোধ হয় তখন লোক-চলাচল কমে এল।

সমর বললে, এবার যাই মিসেস দাশ, বোধ হয় এর পরে ট্রাম বাস কিছুই পাওয়া যাবে না।

মিসেস দাশ বললেন, তুমি তো আর জলে পড়ে নেই, আর আমারও গাড়ি রয়েছে, তোমাকে না হয় চরণ সিং পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে—

এমনি করেই প্রতিদিন সমর মিসেস দাশের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে, আর প্রতিদিন মিসেস দাশের ড্রাইভার তাকে মেসে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম দিককার সে-আড়ষ্টতা আর নেই। আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এসেছে সব। তখন মনের সব কথাই বলা যায় মিসেস দাশের কাছে। আর একটা-না-একটা উপলক্ষ্য লেগেই থাকে কলকাতা শহরে। আজ উদ্বাস্তু, কাল বন্যা, পরশু যক্ষ্মা-হাসপাতাল, তারপরদিন দুঃস্থ-ছাত্রছাত্রী। মিসেস দাশ নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে চ্যারিটি শো করেন।

বলেন, ওদের কথা একবার ভাব তো সমর, যারা দেশ-ঘর-বাড়ি হারিয়ে একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে উঠেছে এখানে! তাদের কথা একবার ভাব তো!

টিকিট বিক্রী হয় হাজার হাজার টাকার। প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়। কোনও কোনও মিনিস্টার আসেন উদ্বোধন করতে। খবরের কাগজে সে-খবর ছাপা হয় ছবি সমেত। মিসেস দাশের স্বার্থত্যাগে সমস্ত দেশবাসী অবাক হয়ে যায়। এক বাক্যে সবাই স্বীকার করে দেশের জন্য এমন দরদ বড় দুর্লভ।

সমর বলে, আপনার মত সবাই যদি হত মিসেস দাশ ?

মিসেস দাশ বলেন, আমি আর কতটুকু করতে পারি, কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা ?

সমর বলত, তবু যেটুকু আপনি করেন, তাই-ই বা ক'জন করে ?

মিসেস দাশ বলেন, আমার যে অঢেল সময় তাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই।

সমর বলে, সত্যি আপনার যে কত টাকা খরচ হয়ে যায় এর জন্যে, সেটা কেউ জানতেও পারে না।

মিসেস দাশ বলেন, আমি তো তা জানাতে চাই না সমর, তা জানিয়ে গরীব-দুঃখীদের কী লাভ হবে বল ?

বলে মিসেস দাশ তাঁর সিল্কের শাড়িটা লুটিয়ে দিতেন সোফার ওপর। দামী দামী শাড়ি ব্লাউজ পরতেন মিসেস দাশ, কিন্তু কোনও আকর্ষণ ছিল না বিলাস-ব্যসনের ওপর।

বলতেন, নিজে বিলাসিতা করতে গেলেই যে দেশের লোকদের কথা কেবল মনে পড়ে যায় সমর। ভেবে দেখ তো আমাদের দেশে কত পার্সেণ্ট লোক একখানা কাপড়ে বছর কাটায়, এক বেলা খেয়ে দিন কাটায়!

মিস্টার দাশের সঙ্গে বেশি দেখা হতো না সমরের। সত্যিই তো, তাঁর অনেক রকম কাজ। এই গাড়ি, এই বাড়ি, চাকর, দারোয়ান, বাবুর্চি, খানসামা, বয়—সব চালাতেও তো খরচ আছে। সেদিকটাও দেখতে হবে। নইলে চলবে কী করে ? মিসেস দাশের মত দেশসেবা করলেই তো চলবে না। বাগানের মালী প্রত্যেক দিন ফ্লাওয়ার-ভাসে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে যায় ঘর। গাড়ি ঘুরছে কলকাতার পথেঘাটে নানা কাজে, টেলিফোন চলছে দিনরাত। দিনরাতই রিং বেজে উঠছে টেলিফোনে—তারও খরচ আছে। তারপর আছে কোল্ড ড্রিঙ্ক, চা, কফি, কেক, বিস্কুট, স্যাণ্ডুয়িচ সব। তারও একটা মোটা খরচ আছে।

কথা বলতে বলতে রোজই রাত হয়ে যায়।

মিসেস দাশ বলেন, আর কতদিন এভাবে কাটাবে তুমি ?

সমর বলে, আমার জীবনে সব ফুরিয়ে গেছে মিসেস দাশ, যার নিজের স্ত্রী কাছে থাকে না তার মত অভাগা আর কে আছে ?

মিসেস দাশ বলেন, তুমি যদি বল তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—আপনি চেষ্টা করবেন ? করবেন আপনি চেষ্টা ?

সমর আনন্দে আশ্বাসে অধীর হয়ে ওঠে।

বলে, আমি শুধু কনকের সঙ্গে একবার দেখা করে দু'টো কথা জিজ্ঞেস করতে চাই মিসেস দাশ।

মিসেস দাশ বলেন, কী জিজ্ঞেস করবে ?

সমর বলে, জিজ্ঞেস করব, আমি নিজে তাঁর কাছে কী অপরাধ করেছি ?

বলতে বলতে সমরের চোখ দু'টো ভিজে আসত। মিসেস দাশ নিজের শাড়ির আঁচলটা দিয়ে সমরের চোখ দু'টো মুছিয়ে দিতেন।

বলতেন, কেঁদ না সমর, দেখি আমি তোমার কী সাহায্য করতে পারি।

এক-একদিন বলতেন, কনকের ঠিকানাটা তুমি আমার ডায়েরিতে লিখে দাও, দেখি তাকে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারি কিনা।

এতদিন পরে সমর যেন একটা সত্যিকারের আশ্বাস পেলে। মিসেস দাশ যদি একবার চেষ্টা করেন তাহলে নিশ্চয়ই একটা সুরাহা হবে। এত লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁর। এত জানাশোনা।

এক-একদিন সবাই চলে যাবার পর সমর জিজ্ঞেস করে, খোঁজ পেলেন মিসেস দাশ ?

মিসেস দাশ বলেন, এখনও দেখা হয় নি, তবে শুনলাম খুব কষ্টের মধ্যে আছে তোমার কনক!

—কষ্ট ? কীসের কষ্ট ?

সমর উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

বলে, কিসের কষ্ট মিসেস দাশ ? অসুখ-বিসুখ হয়েছিল নাকি কিছু ?

মিসেস দাশ বলেন, না, এখন কোনও অসুখ নেই, তবে অসুখ হয়েছিল একটা, খুব রোগা হয়ে গেছে শুনেছি।

—আর কী কী শুনেছেন ?

মিসেস দাশ বলেন, এখন কিছু বলব না এর বেশি—আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক।

এর পর থেকে প্রত্যেক দিন মিসেস দাশের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে সমর। লোকজনের সামনে কিছু বলতে পারে না প্রকাশ করে।

মিসেস দাশই একসময়ে চুপি চুপি বলেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে সমর, চলে যেয়ো না যেন।

তারপর যখন সবাই চলে গেল, সমর মিসেস দাশের কাছে সরে গেল।

বললে, আপনি বলেছিলেন খবর আছে—?

মিসেস দাশ বলেন, তোমার কনককে দেখলাম।

—দেখলেন ?

মিসেস দাশ বলেন, হ্যাঁ দেখলাম, অনেক কথাও হলো। সত্যি তোমারই তো দোষ। তোমার নিজের স্ত্রী, তুমি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা তো দাও নি।

সমর বললে, কনক বললে নাকি সেই কথা ?

মিসেস দাশ বললেন, বলবেই তো। তার যে কী কষ্ট সে তুমি বুঝবে না। সত্যিই তোমার ওপর খুব রাগ করেছে সে। কেন, তুমি জোর করতে পারতে না তোমার স্ত্রীর ওপর? তুমি স্বামী, তোমার কোনও জোর নেই?

সমর বললে, আমি কী জোর খাটাব? তার দাদাই তো আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে না—সে তো জানেন।

মিসেস দাশ বললেন, কনক তো সেই কথাই বললে। বললে, আমার দাদার কথাই সে বিশ্বাস করলে, কেন আমি কেউ নই, আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারলে না সে?

সমর বললে, কনক বললে এই কথা?

মিসেস দাশ বললেন, কনকের তো অন্যায় নেই সমর, আমিও ভেবে দেখলাম কনক ঠিক কথাই বলেছে।

সমর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বললে, আপনি দেখা পেলেন তার কী করে? আপনি কি গিয়েছিলেন চোরবাগানে?

মিসেস দাশ বললেন, আমি যাই নি, আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এখানে। এই তুমি যে-চেয়ারে বসে আছ, এই চেয়ারটাতেই সে এসে বসেছিল, ওইখানে বসেই সে আমাকে সব বললে, বলতে বলতে কেঁদে ফেললে।

—কেঁদে ফেললে?

মিসেস দাশ বললেন, কাঁদবেই তো। স্বামীকে ছেড়ে কোনও স্ত্রী বেশি দিন দূরে থাকতে পারে নাকি?

সমর বললে, তা আরও কিছুক্ষণ রাখলেন না কেন, আমি এসে মুখোমুখি সব বোঝাপড়া করতাম।

মিসেস দাশ বললেন, সেটা ঠিক হতো না, মেয়েদের মন অত সহজে জোড়া লাগে না, দেখলাম মনটা তার একেবারে ভেঙে গেছে কিনা।

সমর বললে, তা আপনি বুঝিয়ে বলেছেন তো সব?

মিসেস দাশ বললেন, সে যা বলবার আমি বলেছি, তোমাকে আর বলে দিতে হবে না।

সমর বললে, তাহলে কী হবে মিসেস দাশ? কনকের সঙ্গে আমার দেখা হবে না—সে আসবে না আর?

মিসেস দাশ বললেন, হঠাৎ একটা মুশকিল হয়েছে খুব।

—কী মুশকিল?

মিসেস দাশ বললেন, সেই কথাটা বলবার জন্যেই তোমাকে থাকতে বলেছি, সেই কথাটাই তোমাকে বলব এখন। কনকের দাদা খুব বিপদে পড়েছে।

—কী রকম বিপদ?

মিসেস দাশ বললেন, ওর দাদার অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে, দেনাটা হয়েছে সংসারের জন্যেই বটে, কিন্তু বিয়ের পরও কনক এতদিন দাদার বাড়িতে রয়েছে, ওরও কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে সেই জন্যে।

—তা কী করতে চায় কনক?

মিসেস দাশ বললেন, কথা শুনে মনে হলো কিছু টাকা পেলেই সব গোলমাল মিটে যায়, কনকও তখন তোমার কাছে চলে আসতে পারে।

সমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলে, কত টাকা?

মিসেস দাশ জিজ্ঞেস করলেন, টাকা কি তুমি দিতে পারবে?

সমর বললে, কনকের জন্যে আমি সব করতে পারি মিসেস দাশ, কত টাকা দরকার তা কিছু বলেছে কনক?

মিসেস দাশ বললেন, মনে হলো যেন অনেক টাকার দরকার, অত টাকা কি তুমি দিতে পারবে?

সমর বললে, আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, দরকার হলে কনকের জন্যে আমি হাজার দশেক টাকা পর্যন্ত যোগাড় করতে পারি।

মিসেস দাশ বললেন, দাঁড়াও, আগে আমি জিজ্ঞেস করব ওকে, কত টাকা হলে ওর চলবে—তারপর তোমাকে বলব।

—কবে আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে আপনার?

মিসেস দাশ বললেন, ঠিক নেই।

—কাল হয় না?

মিসেস দাশ বললেন, কালকের মধ্যে তুমি টাকাগুলো যোগাড় করতে পারবে কি?

সমর বললে, সে যেমন করে পারি আমি যোগাড় করবই, আপনি তার জন্যে ভাববেন না।

মিসেস দাশ বললেন, দেখি আমি কী করতে পারি।

রাত হয়ে যাচ্ছিল। দু'বার করে কফি এল।

মিসেস দাশ বললেন, আর একবার কফি দিতে বলব নাকি আবদুলকে?

সমর বললে, না, আজকে রাত্তিরে আর ঘুম আসবে না আমার।

মিসেস দাশ জিজ্ঞেস করলেন, কেন? বেশি কফি খেয়েছ বলে?

সমর বললে, না, কনকের কথা আজ বেশি করে মনে পড়ছে বলে—

সেদিন বড় অস্বস্তিতে কাটল সমরের। সারাদিন আপিসের কাজের ভিড়ের মধ্যেও বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সোজা মেসের বাড়িতে চলে এসেছে। এসেই তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলে নিয়ে মিসেস দাশের বাড়ি চলে এসেছে।

আবদুল দরজা খুলে দিয়ে বললে, মেমসাহেব তো নেই হুজুর।

সমর বললে, আমি একটু বসব ভেতরে।

ভেতরে বসেও যেন মুহূর্তগুলো বড় ভারি মনে হতে লাগল সমরের। যেন সময় আর কাটে না। দেওয়ালের জাপানী ছবিটা যেন বড় কুৎসিত মনে হতে লাগল। সমস্ত যেন বিস্বাদ ঠেকল। অথচ এই পরিবেশই একদিন কি সুন্দর মনে হয়েছে তার কাছে। কেন এমন হলো? এমন তো হবার কথা নয়!

আবদুলকে জিজ্ঞেস করলে সমর, কার সঙ্গে বেরিয়েছে মেমসাহেব? সঙ্গে আর কেউ ছিল?

আবদুল বলল, জী হাঁ, একজন জেনানা ছিল সঙ্গে।

আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হলো সমরের। কেমন দেখতে, কত বয়স, সে-সব কথা আবদুলকে জিজ্ঞেস করা যায় না তা বলে। কী ভাববে হয়তো।

হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন মিসেস দাশ। গাড়িটা পোর্টিকোয় এসে থামল।

বললেন, এই কনককে পৌঁছিয়ে দিয়েই আসছি সমর, তুমি কতক্ষণ?

—কনক এসেছিল?

মিসেস দাশ বললেন, আমি তাকে ডেকে আনিয়েছিলাম, এতক্ষণ ওই তোমার চেয়ারে বসেই গল্প হচ্ছিল।

সমর বললে, আর একটু আটকে রাখতে পারলেন না?

মিসেস দাশ পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে আবার বসলেন।

বললেন, আমি আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কনক কিছুতেই থাকতে চাইলে না। বললে, তোমাকে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে তার।

সমর বললে, কেন লজ্জা হবে কেন? কি এমন অন্যায় করেছে সে?

মিসেস দাশ বললেন, আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করলাম, কী এমন

অন্যায় করেছ তুমি যে নিজের স্বামীর কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে তোমার ? তা কি বললে জান ?

সমর জিজ্ঞেস করলে, কী বললে ?

মিসেস দাশ হাসলেন।

বললেন, কনক বললে টাকার কথাটার জন্যে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে তার।

—কেন, ছোট মনে হবার কি আছে ? হঠাৎ বিপদ-আপদ হলে টাকা তো সকলেরই দরকার হয়, আর আমার তো টাকাটা রয়েইছে।

মিসেস দাশ বললেন, আমি সে-কথা বুঝিয়ে বললাম। বললাম যে, সমর তোমার জন্যে টাকা রেডি করে রেখেছে।

সমর বললে, হ্যাঁ, আমি ওরই জন্যে তো টাকাটা আলাদা করে রেখেছিলাম, খরচ করি নি। অনেক অসুবিধের মধ্যে থেকেও ও-টাকাটা ওরই জন্যে আলাদা করে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম কনক যখন আসবে তখন ওকেই দেব টাকাটা। ও টাকাটা নিয়ে যা খুশী করুক, গয়না গড়াক বা যেভাবে খুশী খরচ করবে। বিয়ের পর আমি তো ওকে কিছুই দিতে পারি নি।

মিসেস দাশ বললেন, আমি যা বলবার সবই বুঝিয়ে বলেছি, তুমি কিছু ভেব না সমর, দেখছ না, একদিন আমার সব কাজ ফেলে রেখে তোমাদের ব্যাপারটা নিয়েই সারাদিন খাটছি, তোমাদের দু'জনের একটা মিলন ঘটিয়ে দিতে পারলে আমার একটা ভাবনা চোকে। তা-যা হোক, আজকে অনেক দূর এগিয়েছি।

সমর বললে, কতদূর এগোল ?

মিসেস দাশ বললেন, তা তুমি চা খেয়েছ তো ? চা দিয়েছে তোমাকে আবদুল ?

সমর বললে, চায়ের কথা থাক, আপনি কনকের কথা বলুন।

মিসেস দাশ বললেন, তুমি কনকের কথা নিয়ে আর ভেব না, মনে করে নাও কনক আবার তোমারই হয়ে গেছে।

সমর বললে, কিন্তু আমি যে এখনও ভরসা পাচ্ছি না মিসেস দাশ।

মিসেস দাশ বললেন, আমি যখন আছি তখন আর তোমার কিছু ভাবনা করবার দরকার নেই সমর, আমি ভরসা দিচ্ছি কনককে তোমার হাতে তুলে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

সমর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কবে ? আমার যে আর দেরি সইছে না মিসেস

দাশ। আপনি জানেন না যে কিভাবে আমার দিনরাত কাটছে। ক'দিন ধরে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, খেতে পারছি না কিছু।

মিসেস দাশ বললেন, কিছু ভয় নেই, আর ক'টা দিন সবুর কর।

সমর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু সেই টাকার ব্যাপারটা? টাকার ব্যাপারটা কিছু বলে নি আজ?

মিসেস দাশ বললেন, বলেছে। বলছিল দাদার বাড়িটা নাকি বাঁধা পড়ে গেছে, তার জন্যেই টাকার দরকার।

সমর জিজ্ঞেস করলে, কত টাকা?

মিসেস দাশ বললেন, টাকাটা একটু বেশি, সেই হয়েছে মুশকিল, আগে বলেছিল দশ হাজার টাকা, এখন বললে…

—কত বললে?

মিসেস দাশ বললেন, সেই জন্যেই তো ভাবছি। এত টাকা তোমার পক্ষে হয়তো দেওয়া সম্ভব হবে না!

সমর আবার জিজ্ঞেস করলে, কত টাকা বলুন না, আমি যেখান থেকে পারি, যেমন করে পারি দিয়ে দেব।

মিসেস দাশ টাকার অঙ্কটা বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাশের টেবিলে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মিসেস দাশ বললেন, এক্সকিউজ মি, এক মিনিট, হ্যালো, কে? মিস্টার মেটা?

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন, আমাকে আবার কেন জড়াচ্ছেন ওর মধ্যে? আমি গরীব লোক, আমি অত টাকা পাব কোথায়?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, কী যে বলেন মিস্টার মেটা, আমি বড় জোর এক লাখ দিতে পারি, আমাকে কেটে ফেললেও এক লাখের বেশি বেরোবে না। এই সাতদিন আগে আমি পাঁচশো আয়রন কিনেছি, আমরা ছাপোষা মানুষ, আমাদের—

একটু থামলেন। শেষে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন মিস্টার দাশকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি, তাহলে ওই কথাই রইল, গুড নাইট।

তারপর রিসিভারটা রেখে সমরের কাছে এসে বসলেন আবার।

বললেন, আর পারি না, বুঝলে সমর, যখন সামর্থ্য ছিল আমার তখন অনেক দিয়েছি, এখন দিনকাল কিঁ রকম পড়েছে দেখছ তো, কোথায় পাব,

মিস্টার দাশ একলা সারাদিন খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপায় করছেন, সব তো দেখছি।

এ-সব কথায় সমরের বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

বললে, কনক তারপর কি বললে মিসেস দাশ ?

এতক্ষণে যেন মিসেস দাশের মনে পড়ল।

বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কনক বলছিল, তুমি যদি পনের হাজার টাকা যোগাড় করে দিতে পার তো ওর দাদার দেনাটা শোধ হয়ে যায়, আর তা ছাড়া কনকের বিয়ের জন্যেও তো দাদার কিছু টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল কিনা, টাকার জন্যে ওর ভারি লজ্জা হচ্ছে।

সমর বললে, পনের হাজার টাকা ?

মিসেস দাশ বললেন, হ্যাঁ, পনের হাজার টাকা। আমি বললাম কনককে যে, টাকাটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। দশ হাজার হলে সমর এখুনি দিতে পারত। পনের হাজার ও বেচারী কোত্থেকে দেবে বল। তা কী বললে জান ?

সমর জিজ্ঞেস করলে, কি বললে ?

মিসেস দাশ বললেন, শুনে কনক বললে যে নেহাৎ দরকার না থাকলে কেউ এমন করে চায়, বিশেষ করে স্বামীর কাছে ? সত্যি সমর, আমিও বুঝলাম যে টাকার জন্যে হয়তো ওদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পথে বসতে হবে।

সমর যেন কী ভাবলে খানিকক্ষণ।

তারপর বললে, আপনি কনককে বলে দেবেন মিসেস দাশ, যে আমি দেব পনের হাজার টাকা। আমার কাছে দশ হাজার টাকা আছে আর বাকি পাঁচ হাজার না-হয় ধার করব।

—ধার করবে ?

সমর বললে, হ্যাঁ, চড়া সুদে ধারই করব, কনকের জন্যে আমি সব করতে পারি মিসেস দাশ।

মিসেস দাশ বললেন, তা হলে সেই কথাই বলে দেব কনককে।

—কবে বলবেন ?

মিসেস দাশ বললেন, কালই বলে দেব, কিন্তু টাকাটা তুমি কবের মধ্যে যোগাড় করতে পারবে ?

সমর বললে, আমি কালই যোগাড় করব তা হলে।

মিসেস দাশ বললেন, কিন্তু চেক দিলে তো চলবে না।

সমর বললে, তা ক্যাশই দেব, আপনার হাতে নগদ টাকাই এনে দেব কাল।

মিসেস দাশ বললেন, বেশ, সেই কথাই রইল, তুমি কখন আসবে ?

সময় বললে, যখন আসতে বলবেন।

মিসেস দাশ বললেন, তা হলে এক কাজ কর, পরশুদিন বিকেলে তুমি আমার এখানে এস, আমি কনককেও সেই সময়ে আসতে বলব এখানে। দেখা যাক্। তোমাদের মিলটা করে দিতে পারলে বুঝব একটা কাজের মত কাজ করলাম জীবনে।

সময় উঠছিল।

মিসেস দাশ বললেন, আর এক কাপ কফি খাবে নাকি সময় ?

সময়ের বোধ হয় খানিকটা ভাবনা ঢুকেছিল।

বললে, দিন, আজ আর এক কাপ খেতে আপত্তি নেই।

মিসেস দাশ বললেন, শেষে কনককে পেয়ে তুমি দেখছি মিসেস দাশকে ভুলেই যাবে একেবারে সময়।

সময় বললে, আপনাকে ভুলব না মিসেস দাশ, আপনার কথা আমরা চিরকাল মনে রাখব দু'জনে, দেখবেন।

মিসেস দাশ বললেন, আর আমিও কথা দিচ্ছি তোমার সঙ্গে কনকের মিল করিয়ে আমি দেবই।

পরের দিন বোধ হয় সকালটা আর কাটে না। নিজের হাত-ঘড়ি, আংটি, বিয়ের আংটিটাও বেচে দিলে সময়। রাধাবাজারে একটা স্যাকরার দোকান ছিল। পুরোন লোক, জানাশোনা।

নিধিবাবু বললেন, আহা, এইগুলো কেন বেচতে যাচ্ছ সময় ? এ না বেচলেই কি নয় ?

সময় বললে, বিশেষ দরকার তাই বেচছি, নইলে সবই তো আমার বিয়ের জিনিস এগুলো।

—কি এমন দায় পড়ল তোমার যে একেবারে বেচে দিতে হবে ?

সময় বললে, সে আপনি বুঝবেন না ঠিক।

গুনে গুনে টাকাগুলো পকেটে পুরে নিলে সময়। তারপর কিছু ধারের চেষ্টায় গেল বৌবাজারে। লোকটা সুদের কারবার করে। বহু আগে বরানগরে আসা যাওয়া করত তাদের বাড়িতে। অনেকবার ভাল সুদে বাবার কাছে ধার করেছে। সেই টাকা বাজারের ব্যাপারীদের কাছে টাকায় টাকা সুদে ধার দিয়েছে।

বেচারামবাবু চিনতে পারলেন সমরকে ?

বললেন, আপনি যে, কী ব্যাপার ?

সমর বললে, হাজার তিনেক টাকা আমার এখুনি দরকার ছিল, যদি দিতেন। যা স্থদ চাইবেন দেব।

বেচারামবাবু কারবারী লোক। বাজারের লোকদের কাছ থেকে টাকায় টাকা স্থদ নেন। তাতে দু'পক্ষের কারোরই লোকসান নেই।

তিনি বললেন, আপনি তো ভাল চাকরি করেন শুনেছিলাম।

সমর বললে, ভাল হোক মন্দ হোক চাকরি আমি করি, শ পাঁচেক টাকা মাইনেও পাই, কিন্তু বিপদ-আপদ তো আছে মানুষের, আর বিপদে না পড়লে আপনার কাছে আসব কেন ?

—তা তো বটেই, তা তো বটেই।

বলে তিনি তিন হাজার টাকা বার করে দিলেন। একটা কাগজে লিখিয়ে নিলেন, চার হাজার টাকা। চার হাজার টাকার রসিদেই সই করে দিতে হল।

আর বাকি রইল দেড় হাজার টাকা।

আপিসের ক্যাশে সেদিন বেশি টাকা আমদানি হয় নি। তবু জীবনে যা কখনও করে নি, তাই-ই করলে সমর। পনের শো টাকা সেখান থেকে নিয়ে নিজের পকেটে রাখলে। খাতায় টাকাটা আর তোলবার দরকার নেই। পরে আস্তে আস্তে শোধ করলেই হবে। সমস্ত মনটা তখন যেন উন্মুখ হয়ে আছে। কেমন করে আবার কনককে দেখতে পাবে। মিসেস দাশ কথা দিয়েছেন।

তারপর সমস্ত টাকাটা পোর্টফোলিওর মধ্যে পুরে বিকেল বেলা আপিস থেকে বেরোল।

অ্যাসিস্টেণ্ট তারাপদ একবার শুধু পেছনে ডাকলে।

বললে, স্যার।

সমর বললে, কিছু বলবে নাকি ?

তারাপদ বললে, ওই পনের শো টাকা এন্ট্রি করতে বারণ করলেন, ওটা তা কোন্ অ্যাকাউণ্টে পোস্ট করব ?

সমর বললে, ওটা পোস্ট করার করকার নেই, পরশু আমি এসে যা করতে হবে বলে দেব।

তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বাকি টাকাটা তুলে নিয়ে সোজা মিসেস দাশের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

মিসেস দাশ তৈরীই ছিলেন।

বললেন, তোমার জন্তেই বসে ছিলাম সমর, ভাবছিলাম এত দেরি হচ্ছে কেন? এনেছ?

সমর তখনও যেন হাঁফাচ্ছে।

বললে, এনেছি।

মিসেস দাশ টাকাটা হাতে নিয়ে গুনতে গুনতে বললেন, কনক তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, জান।

সমর বললে, কেন?

মিসেস দাশ বললেন, কনক বলছিল তুমি টাকা দেবে না।

সমর বললে, কি করে বলতে পারলে কনক ও-কথা? আপনিও তাই বিশ্বাস করেছিলেন নাকি?

মিসেস দাশ বললেন, না, আমি কেন বিশ্বাস করতে যাব, তোমাকে আমি চিনি না ভাবছ?

সমর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বললে, কনক কখন এসেছিল?

মিসেস দাশ বললেন, আজ খুব সকাল-সকাল এসেছিল, আমি এখনি গিয়ে তাকে টাকাটা দিয়ে আসব, তারপর কাল এখানে আসতে বলব তাকে।

—কাল কখন কনক আসবে?

মিসেস দাশ বললেন, আগে তুমি বল কখন আসবে?

সমর বললে, কাল আমি আপিসে যাব না, আপনি বলুন কখন এলে ভাল হয়?

মিসেস দাশ বললেন, তুমি ঠিক কাল বিকেল তিনটের সময় এস, কনককেও ঠিক ওই সময়ে আসতে বলব—তারপর তোমাদের দু'জনকে আমার পার্লারে বসিয়ে দিয়ে আমি ড্রয়িংরুমে চলে আসব, তোমরা তখন নিরিবিলিতে দু'জনে বোঝাপড়া করতে পারবে।

সমর বললে, সেই কথাই ঠিক রইল, আপনি তাহলে টাকাটা দিয়ে আসুন।

মিসেস দাশ বললেন, আমি এখুনি যাচ্ছি, নিজের হাতে টাকাটা দিয়ে আসব তাকে।

সমর বেরিয়েই আসছিল।

মিসেস দাশ আবার ডাকলেন, সমর শোন, একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে।

—বলুন ?

মিসেস দাশ বললেন, কনক বলছিল অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, একটু ভয়-ভয় করছে তার, তা তুমি যেন ওকে বেশি বোক না, বড় ভাল মেয়ে কনক, আমি তো আজ ক'দিন ধরে দেখছি, নেহাৎ দাদার ভয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে পারে নি, এখন দাদার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তাই একটু বেরোতে পারছে—তা তুমি কথা দাও ওকে কিছু বকবে না ?

সমর বললে, আপনি কি বলছেন মিসেস দাশ, আমি বকব কনককে ? কনক যে আমার কতখানি তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না—আর এই টাকা যে কি ভাবে, কত কষ্টে যোগাড় করেছি, তা একদিন আপনাকে বলব, তখন আপনি বুঝতে পারবেন কনকের জন্যে আমি কী না করেছি।

বিকেল তিনটে তখনও বাজে নি। কিন্তু সমরের মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি বিকেল তিনটে আর বাজবে না।

সময় যেন আর কাটতে চায় না সকাল থেকে। ভাল করে দাড়ি কামিয়ে, খেয়েদেয়ে বার বার করে ঘড়ি দেখতে হয়। মাধব সিকদার লেনের মেসের বাড়িতে যেন সূর্য আর ডুববে না সেদিন। যেন দুপুর আর হবে না, বিকেল হবে না, সন্ধ্যেও হবে না। যেন সূর্য উঠেই আকাশে স্থির হয়ে রইল। আর নড়ে না।

কিন্তু ঠিক সময়েই কলের জল এসেছে, ঠিক সময়েই ঠাকুর ভাত দিয়েছে। আপিস যাবার ব্যস্ততা নেই। আজ ছুটি। ছুটি, তবু মনে হলো যেন অনেক কাজ তার হাতে। এত কাজ সেরে কি করে বেলা তিনটের মধ্যে হাজির হবে মিসেস দাশের বাড়িতে! এখনও যে অনেক কাজ বাকী! কত কাজ! অনেকদিন পরে কনকের সঙ্গে দেখা হবে, অনেকদিন পরে। এমন করে এই পোশাকে কি ভাবে দেখা করবে কনকের সঙ্গে। কনকও হয়তো বদলে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে চোরবাগানে। কনকের মা মারা গেছেন। কনকের দাদার বয়স হয়েছে। দেনা হয়েছে। একদিন ওই দাদাই তাকে বাড়ির দরজা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আবার সেই দাদার দেনাই সে ঘড়ি আঙটি বেচে শোধ দিলে! মানুষের কত পরিবর্তন হয়। অহঙ্কার করবার কিছুই নেই সংসারে। কিসের অহঙ্কার! কিছুই থাকে না চিরকাল। এই সমরই কি ভাবতে পেরেছিল আবার একদিন দেখা হবে কনকের সঙ্গে! এই সমরই কি ভাবতে পেরেছিল বরানগরের সেই বাড়ি

একদিন বিক্রী হয়ে যাবে! সেই বাড়ি বিক্রী করে মেসের বাড়ির একটা ঘরে দিন কাটাতে হবে! কিন্তু কোথায় কি সূত্রে একদিন দেখা হয়ে গেল মিসেস দাশের সঙ্গে। কোথায় ছিলেন মিসেস দাশ, তার সঙ্গে পরিচয় হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না—তারপর সব ঘটনা কেমন করে ঘটতে লাগল। মিসেস দাশ তার জীবনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনলেন একদিন, আর কি যে দয়া হলো তাঁর মনে। তিনিই সব ঠিক করলেন। তিনিই কনকের সঙ্গে তার দেখা করবার ব্যবস্থা করলেন।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সমর বললে, ঠাকুর আমি বেরোচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ঠাকুর এসে জিজ্ঞেস করলে, কখন ফিরবেন আজ বাবু?

সমর থমকে দাঁড়াল। এই মেসেই তাকে ফিরতে হবে নাকি আবার? কনককে নিয়ে এই মেসেই ফিরবে। এই মেসের মধ্যে কনক থাকবে? কিন্তু এখানে কি করে থাকবে কনক? আর এখানে যদি না থাকে তো কোথায়? আর বাড়ি পাবে সে কোথায়? আগে থেকে একটা বাড়ি ঠিক করলেই হত।

হঠাৎ সমর বললে, আজ দু'জনের জন্যে ভাত রেখো ঠাকুর।

ঠাকুর বললে, দু'জন?

সমর বললে, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আর একজন খাবে এখানে।

বলেই সমর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। হাত-ঘড়িটা বিক্রী হয়ে গেছে। সময় দেখবার উপায় নেই। পাশের একটা দোকানের ঘড়িতে দেড়টা বেজে গেছে। মিসেস দাশের বাড়িতে যেতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবার কথা নয়। তারপর হাতে রইল আরও এক ঘণ্টা। সেই এক ঘণ্টা কি করে কোথায় কাটাবে? ট্রাম থেকে নেমে একটা পার্কের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। পার্ক দুপুরবেলা ফাঁকাই থাকে। কয়েকজন চাকর-ঠাকুর জটলা করছে একটা কোণের দিকে বসে। সমর নিজেও একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। চাকরিতে ঢুকে পর্যন্ত এমন দুপুরের দৃশ্য দেখা আর কপালে জোটে নি। যখন বরানগরে নিজেদের বাড়ি ছিল, যখন চাকরি করার স্বপ্নও দেখে নি, তখন এক-একদিন দুপুরের এই দৃশ্য দেখেছে। কিন্তু তখন যেন অন্য রকম ছিল সব। পৃথিবীটার চেহারাটাই অন্য রকম ছিল। এতদিন পরে এই পৃথিবীকে দেখে যেন আগেকার পৃথিবীটাকে আর চেনাই যায় না।

হঠাৎ পাশে কাদের বাড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

সমর লাফিয়ে উঠল।

আর মাত্র এক ঘণ্টা!

একটা ঘণ্টা যেন আর কাটতে চাইছে না।

সমর পার্ক থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলল মিসেস দাশের বাড়ির দিকে। একটুখানি রাস্তা। তাড়াতাড়ি হাঁটলে পনেরো মিনিটে পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু ঠিক তিনটের সময় পৌঁছনো উচিত। তার আগে গেলে মিসেস দাশ হয়তো ব্যস্ত থাকবেন। মিসেস দাশ বিলিতি-কেতার মানুষ। সব কাজ তাঁর ঘড়ি-ধরা। ঠিক সময়ে চা, ঠিক সময়ে লাঞ্চ, ঠিক সময়ে কফি, ঠিক সময়ে ডিনার। একটু এদিক-ওদিক হয় না।

কিন্তু মুহূর্তগুলো যেন চোখের সামনে অচল অনড় হয়ে গেছে। আর চলবে না।

সমর গিয়ে দাঁড়াল মিসেস দাশের বাড়ির সামনে। একটু আগে আসা হয়ে গেছে। হয়তো তিনটে বাজে নি এখনও। তা হোক, আর যেন দেরি সহ্য হচ্ছে না। সমর গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। অন্যদিন দরজা বন্ধ থাকে, কলিং-বেল টিপতে হয়। আবদুল এসে দরজা খুলে দেয়।

আজ সদর-দরজাটা খোলা।

সামনের ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসল সমর। জাপানী ছবিটা তেমনি দেয়ালে ঝুলছে। মোরাদাবাদী ভাসের ওপর ক্যাক্‌টাস্‌টা তেমনি সতেজ।

হঠাৎ আবদুল ঘরে ঢুকল।

সমর বললে, মেমসাহেব আছেন আবদুল?

আবদুল হাউ-মাউ করে উঠল।

বললে, মেমসাহেব চলে গেছেন হুজুর।

—কোথায় চলে গেছেন? কখন আসবেন?

আবদুল বললে, তা জানি নে হুজুর, আর আসবেন না মেমসাহেব।

—কেন? আসবেন না তো যাবেন কোথায়? মিস্টার দাশ আছেন?

আবদুল বললে, মিস্টার দাশ ভি চলে গেছেন। কেউ নেই বাড়িতে, সব ফাঁকা।

—কখন গেছেন?

আবদুল বললে, কাল রাত মে হুজুর, সারারাত আসেন নি, আজ এতক্ষণ হয়ে গেল, এখনও আসেন নি।

সমর চমকে উঠল। কোথায় গেলেন দু'জনে? কিছু বলে গেলেন না

কেন ? কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি কনক না আসে! যদি কনকও কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায় ?

সমর জিজ্ঞেস করলে আবার, গাড়ি নিয়ে গেছেন নাকি ?

আবদুল বললে, হুজুর, গাড়ি তো বিক্রী হয়ে গেছে, চরণ সিং মাইনে নিয়ে কাল ছুটি পেয়ে গেছে।

তাহলে ? গাড়ি কেন বিক্রী করে দিলেন মিসেস দাশ ? তবে কি নতুন গাড়ি কিনবেন! হয়তো গাড়িটা পুরোন হয়ে গিয়েছিল, নতুন মডেলের গাড়ি কিনবেন একটা।

সমর জিজ্ঞেস করলে, তাহলে আর একটু বসি আবদুল, হয়তো আসতে পারেন পরে।

আবদুল বললে, তা বসুন।

তারপর বললে, আজ সকাল থেকে খুব টেলিফোন আসছে হুজুর, হরদম টেলিফোন আসছে—মেমসাহেবকে সবাই খোঁজ করছে।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে হাজির।

বললেন, মেমসাহেব আছে ?

আবদুল বললে, না হুজুর, মেমসাহেব নেই, দাশ সাহেব ভি নেই।

ভদ্রলোক বললেন, কি রকম হলো, আমার ছ'মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়ে আছে যে, আজকে দেবার কথা ছিল।

আবদুল বললে, আমরাও আজ দু'মাস মাইনে পাই নি হুজুর—আজ দেবার কথা ছিল।

ভদ্রলোক উঠলেন।

বললেন, বুঝতে পেরেছি, যাই।

বলে তিনি চলে গেলেন।

সমরও যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। পনের হাজার টাকা নগদ সে এখানে এসে দিয়ে গেছে। সে টাকা কি তবে কনকের হাতে পৌছয় নি! দেখতে দেখতে আরও টেলিফোন আসতে লাগল। আরও লোকজন এসে পৌছল। মিস্টার আগরওয়ালা এলেন, মিস্টার মেটা এলেন। মিস্টার সোনঁপার, মিস্টার ব্যানার্জি—সবাই এসে গেলেন। সবাই-ই খবরটা শুনে মাথায় হাত দিলেন।

হঠাৎ সমর দেখলে বাইরে যেন কে আসছে। ঘোমটা দেওয়া মেয়ে একটি।

সমর উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

কনক !

কাছে যেতেই কনকও তাকে দেখছে।

সমর বললে, কনক ?

কনক মুখ তুলে বললে, তুমি এখানে ?

সমর জিজ্ঞেস করলে, টাকাটা তুমি তাহলে পেয়েছ ?

কনক অবাক হয়ে গেল। বললে, কীসের টাকা ?

—কেন, পনেরো হাজার টাকা যে তোমার দরকার ছিল, মিসেস দাশকে তুমি বলেছিলে। পাও নি তুমি সে-টাকা ?

কনক হতবাকের মত চেয়ে রইল সমরের দিকে।

বললে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সমর জিজ্ঞেস করলে, তাহলে তুমি এখানে কি করতে এসেছ ?

কনক যেন দ্বিধা করতে লাগল। তারপর বললে, মিসেস দাশ যে আমায় আসতে বলেছিলেন।

—কেন ? মিসেস দাশের সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কি করে ?

কনক বললে, আমরা যে মহিলা সমিতিতে সেলাই শিখি। মিসেস দাশ সেখানকার লেডি-প্রেসিডেণ্ট।

—তা এখানে কি করতে এসেছ ?

কনক বললে, উনি বলেছিলেন তোমার নাকি খুব টাকার অভাব, আপিসের ক্যাশ থেকে টাকা নিয়েছ বলে তোমার জেল হবার মত অবস্থা, তাই তোমাকে দেবার জন্যে আমার বিয়ের সব গয়না ওঁকে দিয়েছিলাম।

সমর বললে, সব গয়না ?

কনক বললে, হ্যাঁ সব গয়না, যা কিছু বিয়েতে পেয়েছিলাম।

সমর বললে, সে কি ! সে যে অনেক গয়না, প্রায় তের হাজার টাকা দাম তার।

কনক বললে, কিন্তু তোমার যে তের হাজার টাকার দরকার ছিল, তুমি যে বিপদে পড়েছিলে খুব, মিসেস দাশ বললেন।

সেইখানেই সেই পোর্টিকোর তলাতেই মাটির ওপর বসে পড়তে ইচ্ছে হল সমরের।

কনক বললে, কী হলো ? অমন করছ কেন ? তোমার কি আরও টাকার দরকার ?

সমর বললে, আমি একটা টাকাও পাই নি কনক, আমিই বরং তোমাকে দেবার জন্যে পনের হাজার টাকা দিয়ে গেছি কাল মিসেস দাশের হাতে।

—কিন্তু আমার তো টাকার দরকার ছিল না।

সমর বললে, কিন্তু মিসেস দাশ যে বললেন তোমাদের বাড়ি বিক্রী হয়ে যাবার অবস্থা, তোমার দাদার অনেক দেনা হয়ে গেছে—না দিলে তোমরা পথে বসবে।

—সে কি ?

কনক চমকে উঠল।

বললে, এ রকম কোন কথা তো আমি বলি নি। আমি শুধু জানতে এসেছিলাম টাকাটা তুমি পেয়েছ কিনা, আর তা ছাড়া আমার দাদা তো মারা গেছেন।

—কবে ?

কনক বললে, অনেক দিন! তারপর থেকে আমিই তো ইস্কুল-মাস্টারি করে সংসার চালাচ্ছি, তা মিসেস দাশ কোথায় ?

সমর বললে, তিনি নেই, তিনি পালিয়েছেন।

তারপর কি যেন ভেবে হেসে উঠল।

বললে, তা হোক, তিনি হয়তো আমাকেও ঠকিয়েছেন তোমাকেও ঠকিয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁকে এখান থেকেই নমস্কার করি, তিনি এমন করে না ঠকালে কি আজ তোমার সঙ্গে এমন করে দেখাই হত।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু একটা কথা, তোমার দাদার মৃত্যুর পর তুমি একবারও আমার খোঁজ নিলে না কেন ?

কনকের চোখ সজল হয়ে উঠল।

বললে, কেন নেব ? তুমি বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছ, আমি তার মধ্যে এসে কেন তোমায় জ্বালাব ?

সমর হতবাক হয়ে গেছে।

বললে, আমি বিয়ে করেছি ? এ-কথা কে বললে তোমায় ? কার কাছে শুনলে, কে বলেছে বল তো ?

কনক মুখ নীচু করে বললে, মিসেস দাশ, মিসেস দাশ আমায় সব বলেছেন।

মনে আছে আমারই ওপর এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের ভার পড়েছিল। সামান্য কয়েক বছর মাত্র ঘুষ ধরার চাকরিতে ছিলাম। অনেক রকমেরই অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার সেই চাকরিতে। আরও অনেক রকম। তার মধ্যে

এই সমর আর কনকের ঘটনাটাও একটা। আপনাদের যদি ভাল লাগে এ গল্পটা, তো এ-রকম আরও গল্প করে শোনাব। আজও কলকাতা শহরের একটা ফ্ল্যাট্‌-বাড়িতে সমর আর কনক রয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে। বেশ সুখেই তাদের দিন কাটছে। আমি শুধু তাদের নাম-ধামটা বদলে দিয়েছি। নইলে আর সব ঠিক আছে।

আর মিসেস দাশ? মিসেস দাশের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নি। তিনি হয়তো অন্য কোনও শহরে গিয়ে এখনও এই ব্যবসায় চালাচ্ছেন।